সূচীপত্র

কার্ত্তিক সংখ্যা

১ম বর্ষ
১ম সংখ্যা]

দর্শন

[কার্ত্তিক, ১৩৪৮ সাল

দর্শনের স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ, পি-এচ্ ডি।

দর্শনশাস্ত্রকে আমরা সংক্ষেপে দর্শন বলি। দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতেছে চাক্ষুষজ্ঞান বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গ্রহণ করিলে চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন শাস্ত্রকেই দর্শনশাস্ত্র বলিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট দর্শনের এরূপ অর্থ একান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ই চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন হইতে পারে, শাস্ত্র কিরূপে চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন হইবে? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে চক্ষুরিন্দ্রিয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাধন হইলেও যে শাস্ত্র আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন অর্থাৎ যাহার দ্বারা আত্মার বা অধ্যাত্মতত্ত্বের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের ন্যায় সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তাহাকেও দর্শন বলা হয়। প্রত্যক্ষের স্বরূপগত লক্ষণ হইতেছে সাক্ষাৎ প্রতীতি। যে কোনরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানকেই আমরা প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য বা শ্রবণেন্দ্রিয়জন্য হউক অথবা কোন ইন্দ্রিয়জন্যই না হউক তাহাতে প্রত্যক্ষের স্বরূপের বৈলক্ষণ্য হয় না। যোগজ ধর্মদ্বারা অতীন্দ্রিয়, ভূত, ভবিষ্যৎ ও অতিসূক্ষ্ম বস্তুর যে সাক্ষাৎজ্ঞান হয় তাহাকেও প্রত্যক্ষ বলা হয়, অবশ্য এরূপ প্রত্যক্ষ লৌকিক নহে, ইহা অলৌকিক। এমন কি রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে জ্ঞানটি যদি সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, তবে আমরা তাহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি, যদিচ ইহাকে আমরা ভ্রম প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করি। অতএব দর্শনশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ ধরিয়া আমরা দর্শন বলিতে আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন শাস্ত্র বুঝিতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ দর্শশনাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতে দর্শন একটি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, এবং ইহার দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থকে। জীব বলিতে তাঁহারা দেহবশিষ্ট আত্মাকে বুঝিতেন। জীব পঞ্চভূতের পরিণাম দেহ বা ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টিমাত্র নহে। জীব বলিতে দেহাতিরিক্ত অথচ দেহমনবিশিষ্ট দেহী বা আত্মাকেই বুঝায়। এই আত্মা জ্ঞানময় বা জ্ঞানগুণসম্পন্ন এবং অজর ও অমর। জীবের জন্ম বলিতে কোন আত্মার দেহবিশেষের সহিত সংযোগ বুঝায় এবং মৃত্যু বলিতে তাহার অধিকৃত দেহের বিনাশ বুঝায়। জীব তাহার কর্মানুসারে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে এবং নিজ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আমরা এখন যে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি তাহা আমাদের পূর্বকৃত নিজ কর্মের ফল। জীব সংসারে নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া নিজ দুঃখ নিবৃত্তির বা মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অতত্ত্বজ্ঞানের অভাব। অতএব দুঃখের চরম নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যে জ্ঞান দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব তাহা প্রত্যক্ষ অথবা অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই। আত্মা বা তত্ত্ববিষয়ে সাধারণ বা পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হয় না। অতএব আত্মসাক্ষাৎকার বা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মুক্তির উপায়। দর্শন এইরূপ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন এবং জীবের মুক্তিপ্রয়োজন সিদ্ধির উপায়। এতএব দেখা যাইতেছে যে দর্শন বলিতে ভারতীয় দর্শনাচার্যগণ আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শাস্ত্রকেই বুঝিতেন। আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের সাধন শাস্ত্রই দর্শন, অন্য বিষয়ে জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উঠিতে পারে। প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে দর্শন তত্ত্বজ্ঞানের সাধন হইলেও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উপায় হইতে পারে না। দর্শনে বিচার বা যুক্তিদ্বারা আমরা সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করি। কিন্তু কেবল বিচার দ্বারা কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ তাহার পক্ষে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে আলোকের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকগণ এই আপত্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতেও কেবল বিচার বা মনন দ্বারা আত্মা বা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় না। এই জন্যই তাঁহারা শাস্ত্রার্থ বিচারের পর আত্মা ও অধ্যাত্মবিষয়ে নিদিধ্যাসন বা যোগসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আত্মা ও তত্ত্ববিষয়ে দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি ন্যায়ানুগত বিচারদ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং সেগুলি বিচারসহ ও ন্যায়ানুমোদিত হইলে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পর আত্মা ও তত্ত্ববিষয়ে নিরন্তর ধ্যানযোগে তন্ময় হইতে পারিলে সেগুলির সম্যক্ উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার হইবে। অবশ্য এই উপলব্ধি কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ নহে, কারণ তাহা ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়জন্য না হইলেও ইহা সাক্ষাৎ প্রতীতি বলিয়া ইহাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষের স্বরূপলক্ষণ সাক্ষাৎ প্রতীতি, ইন্দ্রিয়জন্যত্ব নহে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এতএব ভারতীয় দার্শনিকগণ যোগসাধন দ্বারা নিষ্পন্ন আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিলে তাহাতে আপত্তি করিবার কোন হেতু নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি হইতে পারে যে যদি দর্শন বলিতে আত্মা বা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সাধন শাস্ত্র বুঝি এবং মুক্তিই যদি দর্শনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে দর্শনে অধ্যাত্মবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের অবতারণা ও বিচারের অবসর থাকে না। কিন্তু প্রায় সকল দর্শনেই আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েরও অবতারণা করা হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির বিশদ আলোচনা আছে, বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ প্রভৃতির সূক্ষ্ম বিচার করা হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে কার্যকারণ সম্বন্ধ ও প্রকৃতির পরিণামের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় এবং মীমাংসা দর্শনে বৈদিককর্মের অতিসূক্ষ্ম ও অতি বিস্তৃত পর্যালোচনা আছে। অন্যান্য ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য, সেখানেও অধ্যাত্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য বহু বিষয় আলোচিত ও নির্ণীত হইয়াছে। অতএব বলিতে হয় যে দর্শনশাস্ত্র কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে এবং মুক্তিই তাহার একমাত্র প্রয়োজন নহে। যদি তাহাই হয় তবে দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণ দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞান দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মুক্তিই তাহার মুখ্য প্রয়োজন হইলেও এই মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির উপায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য জ্ঞানের স্বরূপ, প্রমাণ ও প্রমেয় প্রভৃতির বিচার একান্ত আবশ্যক। সেইরূপ অধ্যাত্মবিদ্যার অঙ্গ-রূপে পরমাণুবাদ, প্রকৃতিপরিণামবাদ প্রভৃতি বিষয়ও দর্শনশাস্ত্রের গৌণ বা অপ্রধান বিষয়। পরমাণুবাদ প্রভৃতির বিচার করিয়া দেখা যায় যে আত্মা বা আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার না করিলে শুধু পরমাণু বা প্রাকৃতিক

শক্তির সাহায্যে আমরা সৃষ্টিরহস্য বুঝিতে পারি না। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় গৌণ প্রয়োজনরূপে দর্শনে স্থান পাইয়াছে। এইরূপে আমরা দ্বিতীয় আপত্তিটীর সমাধান করিতে পারি।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর আপত্তি হইতে পারে। কোন কোন দর্শনে আত্মা বা আধ্যাত্মতত্ত্ব একেবারে স্বীকৃত হয় নাই। এ সব দর্শনের আলোচ্য বিষয় পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগৎ বা মানবসমাজের কল্যাণের উপায়। নাস্তিক-চূড়ামণি চার্বাক, পাশ্চাত্য জড়বাদী দার্শনিক এবং অগস্ত্ কোম্তের মত দৃষ্টবাদীরা (Positivists) তাঁহাদের দর্শনে আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ইহলোক, ভৌতিক জগৎ এবং মানবের ব্যক্তি-গত বা সমষ্টিগত সুখসমৃদ্ধির আলোচনাতেই তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক ধর্মমতের মধ্যে বহু আধ্যাত্মিক বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদেও (Mysticism) আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে অনেক দার্শনিক মত দর্শনশাস্ত্রের বহির্ভূত হইয়া পড়ে এবং ধর্মতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদকে দর্শনের শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে দর্শনের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অব্যাপ্তি ও অতিব্যপ্তি দোষ হইয়া পড়ে, কারণ ঐ লক্ষণ কোন কোন দর্শনে প্রযোজ্য হয় না, আবার যাহা দর্শন হইতে ভিন্ন বিষয় তাহাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এই আপত্তির সমাধান করিবার পূর্বে আমরা দর্শনের লক্ষণান্তরগুলির অল্পবিস্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কারণ তাহাতে আপত্তিটীর সমাধানের সুবিধা হইবে।

দর্শনের ইংরেজী নাম 'ফিলজফি'। এই সংজ্ঞাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে জ্ঞানানুরাগ। কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে দর্শন বা ফিলজফির বৈশিষ্ট্য বুঝা যায় না। যদি দর্শন বলিতে জ্ঞানানুরাগমাত্র বুঝিতে হয়, তবে বিজ্ঞানকেও দর্শন বলিতে হয়। কারণ বিজ্ঞানেও বিষয়বিশেষে জ্ঞানানুরাগের যথেষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কোন বৈজ্ঞানিক যে কোন দার্শনিকের মতই জ্ঞানের অনুরাগী ও জ্ঞানলাভের প্রয়াসী। তবে বিজ্ঞান হইতে দর্শনের প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান, কিন্তু দর্শন পূর্ণজ্ঞান। বিভিন্ন বিজ্ঞান বিশ্বের বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত। অতএব একটী বিজ্ঞান হইতে আমরা একটী বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারি। পদার্থবিদ্যা (Physics) জড়প্রকৃতির মূলতত্ত্বগুলির জ্ঞান

প্রদান করিতে পারে, রসায়ন (Chemistry) বিভিন্ন দ্রব্যের সংযুতি (Composition) ও রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিচয় দেয়, অপরাপর জড়-বিজ্ঞানও প্রাকৃতিক বিষয়বিশেষের জ্ঞানানুসন্ধান করে। কিন্তু কোন বিজ্ঞানেই জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞানলাভ করা যায় না। এজন্য বিজ্ঞানকে খণ্ডজ্ঞান বা অসম্পূর্ণ সত্য বলা হয়। দর্শনে সমস্ত বিজ্ঞানের সত্য বা মূলতত্ত্বগুলির সমন্বয় করিয়া আমরা নিখিল বিশ্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারি। অতএব দর্শনকে বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয়শাস্ত্র (synthesis) বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বা সত্য-গুলি বিভিন্ন এবং কখন কখন তাহারা পরস্পরবিরোধী হইতে পারে। যেমন কোন বিজ্ঞানে একমাত্র জড়পরমাণুকেই মূলতত্ত্ব বলা হইয়াছে, আবার কোন বিজ্ঞানে মূলতত্ত্ব হিসাবে বিভিন্নগুণযুক্ত বহু পদার্থকে স্বীকার করা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সমাবেশ করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমরা জীব ও জগৎ সম্বন্ধে একটী সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হইতে পারি। দর্শন বলিতে এইরূপ বিজ্ঞানসমন্বয় (Synthesis of the Sciences) বা পরাবিজ্ঞান (Super Science) বুঝিতে হইবে।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষনটী সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। দর্শন যদি বিজ্ঞানের সমষ্টিমাত্র হয় তবে দর্শনকে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলা যায় না। বিভিন্ন বিজ্ঞানে যে সব সত্য নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সমাবেশ করিলে আমরা এক অখণ্ড পূর্ণ সত্যে উপনীত হইতে পারি না, পরন্তু কতকগুলি খণ্ডসত্যের যোগফল পাইতে পারি। আবার এই সত্যগুলি যদি পরস্পরবিরুদ্ধ হয় তবে কেবল তাহাদের সমষ্টিদ্বারা সে বিরোধের অবসান হয় না। অপর পক্ষে যদি দর্শনকে বিজ্ঞানের সমন্বয়শাস্ত্র বলা যায় তাহা হইলেও দর্শনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় না। প্রথমতঃ সর্ববিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, যে সব বিজ্ঞান অতীতকালে প্রচলিত ছিল বা বর্তমানে প্রচলিত আছে সেগুলির জ্ঞানলাভ করা কোন মনীষীর পক্ষে সম্ভব হইলেও ভবিষ্যতে যে সব বিজ্ঞানের উদ্ভব হইবে তাহাদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তর্কের অনুরোধে যদি ধরিয়া লওয়াও যায় যে কোন অদ্ভুতকর্মা পণ্ডিত সর্ববিজ্ঞানের সারসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তথাপি তাহাদের সমন্বয়ে তিনি যথার্থ দার্শনিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। দর্শনের তত্ত্বগুলি নিত্য ও সর্বত্র সত্য (necessary and universal), সেগুলি সব সময়ে, সব দেশে ও সর্বলোকের পক্ষে সত্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি স্থায়ী নহে, তাহাদের পরিবর্তন হইতেছে ও

পরেও হইতে পারে। এরূপ স্থলে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে দর্শনের সৃষ্টি হইবে তাহাও পরিবর্তনশীল হইবে এবং তাহাকে আমরা দর্শনই বলিতে পারিব না। শেষ কথা, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের বাহ্য রূপের (phenomena) জ্ঞানলাভ করিতে পারি, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ সত্তা (noumenal reality) জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ (observation) দ্বারা যে সব বিষয় জানা যায় তাহাদের সম্বন্ধে যান্ত্রিক পরীক্ষা (experiment) করিয়া যে সুসম্বদ্ধ (systematic) জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাকেই বিান বলে। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করি তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও প্রকৃতি সাপেক্ষ। আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বাহ্য বিষয়ে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব করি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অবস্থান্তর ঘটে, বা কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া যায় তবে আমরা বস্তুর ভিন্ন গুণ উপলব্ধি করি বা কোন গুণ একেবারে উপলব্ধি করিতে পারি না। এমন কি, প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ আলোক প্রভৃতির অভাবে দ্রব্যের গুণেরও অবস্থান্তর ঘটিতে দেখা যায়। কোন অন্ধকার ঘরের মধ্যস্থ দ্রব্যের কোন রূপ বা বর্ণ থাকে না, অন্ততঃ তাহা আমরা দেখিতে পাই না এবং বুঝিতেও পারি না। আবার পাণ্ডুরোগে শঙ্খেরও পীতবর্ণ দেখা যায়। এই সব কথা ভাবিলে বুঝা যায় যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি না হইয়া তাহার ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজন্য গুণের প্রত্যক্ষ হয়। আর একটি কথা, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা ভৌতিক পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, যাহা অভৌতিক তাহার রূপ ও মহত্ব (magnitude) প্রভৃতি গুণ থাকিতে পারে না, কিন্তু এ সব গুণ ব্যতিরেকে কোন বস্তুর ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হয় না। এখন দর্শন যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের সমষ্টি বা সমন্বয়শাস্ত্র হয় তবে তাহাও ভৌতিক বিষয়ের ।নের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না এবং বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তর্নিহিত সত্তার কোন পরিচয় দিতে পারে না। কিন্তু এরূপ দর্শন বিজ্ঞানেরই নামান্তর, তাহা দর্শনপদবাচ্য নহে।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণ দোষদুষ্ট দেখিয়া নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদী (Neo-realist) কোন কোন দার্শনিক তাহার অন্যরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দর্শন বিজ্ঞানসমুদয়ের সমষ্টি নহে, কিন্তু বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-গুলির (fundamental categories) বিচারমূলক (critical) জ্ঞান। বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা যায় যে তাহাদের সকলেরই মূলে কতকগুলি তত্ত্ব নিহিত আছে এবং সেগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই তত্ত্বগুলি সর্বগত

(universal) এবং জাগতিক সকল বস্তুরই সাধারণ ও সর্বব্যাপী ধর্ম (pervasive character)—দেশ, কাল, কার্য্যকারণসম্বন্ধ, দ্রব্যত্ব, একত্ব প্রভৃতি এইরূপ সর্বব্যাপী বস্তুধর্ম। যে কোন বস্তুর কথা বলা যাক্ না কেন তাহা দেশে ও কালে অবস্থিত এবং তাহা একটী দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ বস্তু এবং তাহার সহিত অন্য বস্তুর কার্যকারণসম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞান এই তত্ত্বগুলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এগুলিকে স্বীকার না করিলে বিজ্ঞান সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞানে যে সব বস্তুর আলোচনা করা হয় সেগুলিকে দেশকালে সীমাবদ্ধ ও কার্যকারণসম্বন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়। দেশ, কাল ও কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত কোন অবিশেষ বস্তুর বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলে না, কারণ এরূপ বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে এবং যান্ত্রিক পরীক্ষাধীনও নহে। অতএব বিজ্ঞানমাত্রেই দেশ, কাল প্রভৃতিকে তাহার মূলতত্ত্ব বা ভিত্তিরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য। বিজ্ঞানে এই তত্ত্বগুলি স্বীকৃত হইলেও তাহাদের যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচার করা হয় না। দর্শনশাস্ত্রই এ সব তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত। দর্শন হইতে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহা বিজ্ঞানলব্ধজ্ঞান হইতে কোনরূপে ভিন্ন নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ে আমাদিগকে একই জগতের বিষয়ে জ্ঞানপ্রদান করে। বিজ্ঞান হইতে দর্শনের প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানের মূলে যে তত্ত্বগুলি নিহিত আছে দর্শনশাস্ত্রে সেগুলির ন্যায়সঙ্গত বিচার (criticism) করা হয়। দেশ, কাল প্রভৃতি তত্ত্বগুলি স্বরূপতঃ কি—তাহা সাধারণ লোকে বিচার করিয়া দেখে না। বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলির বাহ্যরূপ ও বৃত্তিবিশেষের (specific function) আলোচনা করিলেও তাহাদের স্বরূপ (ultimate nature) সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। দর্শনশাস্ত্রেই আমরা বিচার করিয়া দেখি যে দেশ, কাল প্রভৃতির কোন বিষয়গত সত্তা (objective reality) আছে, না তাহারা কেবল জ্ঞানগত (subjective) ভাব (idea) মাত্র। যুক্তি, তর্ক ও বিচার দ্বারা এসব তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করাই দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণটিও দোষমুক্ত বলিয়া মনে হয় না। দর্শন বলিতে যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির বিচারমাত্র বুঝায় তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদ থাকে না, এবং দর্শনকে একটী পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করার আবশ্যকতাও থাকে না। বিজ্ঞান মাত্রেই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করে। ন্যায়সঙ্গত বিচারপ্রণালীর সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক সত্য বা তত্ত্বগুলি সমর্থিত হয়। বিজ্ঞানের দুইটী দিক আছে। একদিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক দ্রব্যনিচয়ের জ্ঞানলাভ করিতে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। এটিকে

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক বলা যাইতে পারে। অপরদিকে বিজ্ঞান তাহার তত্ত্বগুলি সমর্থনযোগ্য কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখে। অবশ্য এই বিচার ন্যায়সঙ্গত প্রণালীতেই করিতে হয়। এইটিকে বিজ্ঞানের প্রামাণ্যের (logical) দিক বলা যাইতে পারে। এখন বিজ্ঞান যদি প্রামাণ্যের দিক দিয়া তাহার অপর তত্ত্বগুলির ন্যায় মূলতত্ত্বগুলিও বিচার-দ্বারা সমর্থন করে তবে আর দর্শনের প্রয়োজন কি ? এই জন্যই বোধ হয় কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক অধুনা দর্শন নাম পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়-সাপেক্ষ দৃষ্টবাদের (Logical Positivism) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে দর্শন বলিয়া কোন শাস্ত্র থাকিবে না এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছেন। অপর পক্ষে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য যদি দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞানের অপর তত্ত্ব-গুলিও দর্শনশাস্ত্রদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে এবং বিজ্ঞানের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করার পক্ষে কোন হেতু থাকে না। ফলকথা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করা বা যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা বিজ্ঞানেরই কাজ, সে জন্য দর্শন নামে পৃথক্ শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করি তাহার তত্ত্বগুলি নিরূপণ করাই বিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞান যে প্রণালীতে তাহার অপ্রধান বা সাধারণ তত্ত্বগুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় সেই প্রণালীদ্বারা তাহার প্রধান বা মূল তত্ত্বগুলি কেন নির্ণয় করিতে পারিবে না তাহা বুঝা যায় না। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত না হইলে দর্শনশাস্ত্র তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে তাহাও সহজবোধ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসম্বন্ধে দার্শনিক মতামত বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল। অন্য-ক্ষেত্রে দার্শনিক মত গ্রহণযোগ্য হইলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মত গ্রহণ করা দার্শনিকের পক্ষেও সমীচীন ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। অতএব দর্শনকে বিজ্ঞানের বিচারশাস্ত্র (Logic of Science) বলিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিক দর্শনের আর একটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই লক্ষণ পূর্বোক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের পরিগৃহীত লক্ষণ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং কতকাংশে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের সম্মত লক্ষণের অনুরূপ। প্লেটো, আরিষ্টটল্, হেগেল্, ব্র্যাড্‌লে প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ দর্শন বলিতে বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয়, অথবা বিজ্ঞানের বিচারশাস্ত্র বুঝেন না তাঁহাদের মতে দর্শন বলিতে জড়জগতের বিজ্ঞান না বুঝিয়া তত্ত্বজ্ঞান

(Metaphysics) বা পারমার্থিক তত্ত্ব (Ultimate Reality) বিষয়ে জ্ঞান বুঝিতে হইবে। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো দর্শনশাস্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তাঁহার মতে দর্শন পারমার্থিক তত্ত্বের (Reality) বা শুদ্ধসত্তার (Being as such) জ্ঞান এবং দর্শন অধ্যয়ন করিলে যাহা নিত্য, নির্বিকার ও সর্বব্যাপী তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হয়। মহামতি আরিষ্টটল্ দর্শনের দুইটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। একটী লক্ষণ অনুসারে দর্শন বলিতে পারমার্থিক বা শুদ্ধসত্তার (Pure Being) জ্ঞান বুঝায়, অপর লক্ষণ অনুসারে দর্শন বলিতে মৌলিক তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান (Science of First Principles) বুঝায়। সুপ্রসিদ্ধ জার্মাণ দার্শনিক হেগেল স্পষ্ট ভাবায় বলিয়াছেন যে দর্শন ইহজগতের বা জড়প্রকৃতির জ্ঞান নহে, ইহা লোকাতীত ও নিত্য পরমতত্ত্বের (Absolute Idea) অর্থাৎ পরমাত্মার (God) জ্ঞান। আধুনিক ইংরাজ দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ব্র্যাড্লেও দর্শনের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের বাহ্যরূপের (appearance) অতিরিক্ত পারমার্থিক তত্ত্বের (Reality) জ্ঞানই দর্শন, অথবা দর্শন বলিতে মৌলিক তত্ত্বগুলির বা পরম সত্যনিচয়ের (ultimate truths) জ্ঞান বুঝায়, অথবা নিখিল বিশ্বকে খণ্ডরূপে না জানিয়া এক অখণ্ড সত্তারূপে জানিবার চেষ্টাকেও দর্শন বলা যায়। এস্থলে উল্লিখিত দর্শনের লক্ষণগুলি অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে তাহাদের ভাষা ভিন্ন হইলেও তাৎপর্য একই। দর্শন যে প্রাকৃত বিজ্ঞান নহে, এবং দর্শন যে স্বরূপতঃ ও কার্যতঃ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন তাহা উল্লিখিত যে কোন লক্ষণ হইতে বুঝা যায়। দর্শন বলিতে এখানে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তার জ্ঞান না বুঝাইয়া পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানই বুঝাইতেছে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রে আমরা পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞান কি প্রকারে লাভ করিতে পারি? উপরোক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা পারমার্থিক তত্ত্ব Reality) জানা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর বাহ্যরূপ জানিতে পারি, তাহার স্বরূপ জানিতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন দ্রব্যের সন্নিকর্ষ হইলে ইন্দ্রিয়গত গুণ ও শক্তি অনুসারে আমরা দ্রব্যের গুণ প্রত্যক্ষ করি। অতএব পারমার্থিক তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া প্রজ্ঞার (reason) সাহায্য লইতে হইবে। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও আরিষ্টট্ল্ উভয়েই প্রজ্ঞাকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রজ্ঞার আলোকে বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তরালে অবস্থিত সর্বব্যাপী সত্তাগুলি (Universal ideas or forms) সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং আমরা তাহাদের সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করিতে

পারি। দার্শনিকপ্রবর হেগেলের মতেও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ করা যায় না। বিচারবুদ্ধি তদধীন পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে কতকগুলি অসংলগ্ন অবয়বে বিভক্ত করে। উহা তাহাদের মধ্যে যে অনুগত ঐক্যসূত্র (unity) আছে তাহা হারাইয়া ফেলে। যেমন কোন দেহ সম্বন্ধে বিচার করিলে তাহা বিভিন্ন অবয়বের সমষ্টিমাত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অবয়বী ব্যতীত অবয়বসমষ্টি বুঝা যায় না। অতএব অবয়ব অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করিতে হয়। এই অবয়বী বিভিন্ন অবয়বের ঐক্যসূত্র। ভেদের মধ্যে ঐক্যই (unity-in-difference) জীব ও জগতের পরম তত্ত্ব। এই তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে বিচারবুদ্ধি ছাড়িয়া ভাবনাত্মক প্রজ্ঞার (speculative reason) আশ্রয় লইতে হইবে। এই প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের (phenomenal world) অন্তর্নিহিত পরম তত্ত্বের (Absolute Idea) বা পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। ইংরাজ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লে এবিষয়ে হেগেল প্রভৃতির সহিত একমত নহেন। তাঁহার মতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হয় না। কারণ, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা চিন্তার (thought) সীমা অতিক্রম করিতে পারে না এবং চিন্তার রাজ্যে চিন্তা ও সত্তার (Reality) মধ্যে একটী অভেদ্য আবরণ থাকিবেই। চিন্তা ও চিন্তার বিষয় দুইটী পৃথক্ পদার্থ এবং যতক্ষণ চিন্তা চলে ততক্ষণ তাহার বিষয়টি তদতিরিক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং চিন্তা তাহার বিষয়ের স্বারূপ্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু পরমতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান পাইতে হইলে আমাদিগকে তদ্‌গতচিত্ত হইতে হইবে। চিন্তা ও সত্তার অভেদ অনুভূতিদ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়। কিন্তু চিন্তা সত্তার সহিত অভিন্ন হইলে চিন্তারই অবসান হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে চিন্তাত্মক বুদ্ধি বা প্রজ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হয় না। ব্র্যাড্‌লের মতে শুদ্ধ বা সাক্ষাৎ প্রতীতি (mere feeling or immediate presentation) হইতে আমরা পরম তত্ত্বের কিছু আভাস পাইতে পারি, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে স্থির ও নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু হেগেল বা ব্র্যাড্‌লে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের কোন সম্যক্ পন্থা নির্দ্ধারণ করেন নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে যোগসাধনই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায়। জগতের পরিদৃশ্যমান বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন আত্মা বা অধ্যাত্মসত্তাই তাহার পরম তত্ত্ব। প্রাকৃতিক জগতের অন্তরালে যে আধ্যাত্মিক সত্য লুক্কায়িত আছে তাহার সাক্ষাৎজ্ঞান ধ্যানযোগে হইতে পারে। দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য

উদ্দেশ্য আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎজ্ঞান। অতএব দর্শন ও দার্শনিকদের পক্ষে ধ্যানযোগের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। যোগসাধন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ও চিত্তের বিক্ষেপকারী বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং অন্যান্য বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। যখন সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় তখন আত্মা শুদ্ধ ও চিন্ময় সত্তারূপে প্রকাশিত হন। এই শুদ্ধ চিৎসত্তাই দর্শনপ্রতিপাদ্য পারমার্থিক তত্ত্ব। অতএব দর্শন বলিতে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তাতিরিক্ত পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞান বুঝিলে এই জ্ঞানলাভের উপায়রূপে যোগসাধনাকে দর্শনশাস্ত্রের একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যোগসাধন দর্শনের অঙ্গভূত হইলেও যোগ বা তদনুরূপ সাধনলব্ধ পারপারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানমাত্রকেই দর্শন বলা যায় না। যদি তাহাই হয় তবে দর্শন ও ধর্ম বা অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। মানুষ তাহার ধর্মজীবনের মধ্য দিয়াও আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং এরূপ জ্ঞান সাক্ষাৎজ্ঞান বলিয়াই অভিহিত হয়। সেইরূপ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেও (mystic experience) অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। অতএব দর্শন যদি কেবলমাত্র পারমার্থিক তত্ত্বের সাক্ষাৎজ্ঞান হয় তবে ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদকেও একপ্রকার দর্শন বলিতে হয়। আমরা পূর্বে এই আপত্তিটীর উল্লেখ করিয়াছি। এই আপত্তি খণ্ডন করিতে হইলে দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে আর একটু পুনরালোচনা করিতে হইবে। দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞান একথা সত্য, কিন্তু দর্শন পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানমাত্র নহে। যুক্তিতর্ক দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই দর্শনের প্রধান কার্য। যে শাস্ত্রে যুক্তির দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান সমর্থিত হয় তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে। ধর্ম বা অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদে পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইলেও সে স্থলে কোন বিচারপ্রণালী বা যুক্তিদ্বারা ঐ জ্ঞানকে সমর্থন করার চেষ্টা দেখা যায় না। ধর্মে অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণন বা ব্যাখ্যা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিচারবুদ্ধিদ্বারা ঐ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার কোন প্রয়াস করা হয় না। সাধারণতঃ ধার্মিকব্যক্তি এসব বিষয়ে পূর্ণবিশ্বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন এবং কোন যুক্তিতর্কের সাহায্য লন না, বরং পাছে তাঁহার ধর্ম বিশ্বাস নষ্ট হয় এই ভয়ে যুক্তিতর্ক পরিহার করেন। অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদীরাও কোন অলৌকিক সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা আধ্যাত্মিকতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। পরন্তু তাঁহারা বলেন যে যুক্তিদ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ব বুঝাও যায় না, বুঝানও যায় না। সে যাহা হউক প্রকৃতস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের

বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং ন্যায়সঙ্গত যুক্তিদ্বারা তাহার সমর্থনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি বা অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদী এরূপ কোন চেষ্টা করেন না। এই জন্যই দর্শন ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ হইতে স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণ সম্বন্ধে অরও একটী আপত্তি হইতে পারে। আমরা পূর্বে তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। দর্শনকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনশাস্ত্র বলিলে জড়বাদ বা দৃষ্টবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদকে দর্শন-পদবাচ্য বলা যায় না, কিন্তু এগুলিকে একপ্রকার দর্শন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। এই আপত্তিটীর সমাধানকল্পে আমাদিগকে জড়বাদ ও দৃষ্টবাদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে হইবে। জড়বাদীরা বলেন যে জড়পদার্থই জগতের মূল কারণ, এবং তাহা হইতেই জীবজগতের সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতেই তাহারা বিলীন হয়। আত্মা বা ঈশ্বর—এরূপ কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা নাই, কারণ তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যাহা প্রত্যক্ষের অবিষয় তাহা অসৎ ও অসত্য। অতএব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-গোচর জড়পদার্থই জীবজগতের পরম সত্তা ও মূল কারণ। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক কোম্‌তের দর্শন দৃষ্টবাদ নামেই পরিচিত। দৃষ্টবাদের মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে যে যাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় তাহাই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য এবং দর্শন এরূপ সত্যনিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্ব দর্শনের বিষয় নহে, কারণ তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। দর্শন বলিতে কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞানবিশেষ বুঝায় না। দর্শন বিজ্ঞান সকলের শ্রেণীবিভাগ (classification) করে মাত্র। বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া বিজ্ঞান সকলের পরস্পর সম্বন্ধ এবং সাধারণ পদ্ধতি নিরূপণ করাই দর্শনের কার্য। এখন বিচার করিয়া দেখা যাক্ জড়বাদ ও দৃষ্টবাদ কি হিসাবে দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। জড়বাদীর মতে জড়পদার্থই (matter) পারমার্থিক তত্ত্ব। কিন্তু জড়পদার্থ বলিতে যদি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতকে বুঝায়, তবে জড়বিজ্ঞান হইতেই আমরা তৎসম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারি, সে জন্য কোন দর্শনের অপেক্ষা করিতে হয় না। ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানই গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে জড়বাদীর জড়পদার্থ যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক পদার্থ না হইয়া কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা হয়, তাহা আধ্যাত্মতত্ত্বেরই সামিল হইয়া পড়ে এবং তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান হইতে কোন জ্ঞানলাভ করা যায় না। যাহা অতীন্দ্রিয় তাহাকে জড়পদার্থ বলার সার্থকতা নাই, কারণ জড়মাত্রেই ভৌতিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য।

এরূপস্থলে বিজ্ঞানের সাহায্যেও আমরা তথাকথিত জড়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না এবং সেজন্য দর্শনের আবশ্যকতা আছে। এই হিসাবে জড়বাদেকে একপ্রকার দর্শন বলা যাইতে পারে। কোম্‌তে দৃষ্টবাদের যে ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দর্শনকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমাবেশ বা সমন্বয়মাত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে দর্শনকে বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয় শাস্ত্র বলা যায় না। অবশ্য এক হিসাবে জড়বাদ, দৃষ্টবাদ প্রভৃতিকে দর্শন বলা যাইতে পারে। যে শাস্ত্রে যুক্তি-দ্বারা বক্তব্য বিষয় সমর্থিত হয়, সচরাচর তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলা হয়। জড়বাদ ও দৃষ্টবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে সাধারণ হিসাবে দর্শন বলা যায়। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কেবল যুক্তিতর্কই দর্শনের লক্ষণ নহে। ন্যায়শাস্ত্রে যুক্তিতর্কের অন্ত নাই, তাই বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রকে দর্শনশাস্ত্র বলা যায় না। বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও যুক্তিদ্বারা সমর্থিত, কিন্তু সে জন্য বিজ্ঞানকে কেহ দর্শন বলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, জড়বাদ, দৃষ্টবাদ প্রভৃতিকে সাধারণভাবে দর্শন বলিলেও দর্শনের স্বরূপের বৈলক্ষণ্য হয় না। দর্শন ন্যায়সঙ্গত যুক্তিদ্বারা সমর্থিত জ্ঞান বটে, কিন্তু যে কোন যুক্তিযুক্ত জ্ঞানকে দর্শন বলা যায় না। যুক্তিদ্বারা সমর্থিত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত দর্শন। ভৌতিক বাহ্য সত্তার (physical phenomena) অতিরিক্ত কোন অভৌতিক বা আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করিলে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত দর্শনশাস্ত্রের উপ-যেগিতা বুঝিতে পারা যায়। ভৌতিক জড়জগতের সত্তাতিরিক্ত কোন সত্তা না থাকিলে বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিতাম এবং দর্শন নামে বোধহয় একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের প্রয়োজন হইত না। অধিকরূপে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বা সূত্রগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য একটা ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন হইত। আমরা জীবনে পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে কোন অদৃশ্য অধ্যাত্মতত্ত্বের কোনরূপ সন্ধান পাই বলিয়াই বোধহয় আমাদের বিচারবুদ্ধিদ্বারা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি এবং এই প্রচেষ্টা হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে বিচার সাপেক্ষ জ্ঞান দর্শন শব্দের মুখ্য অর্থ এবং তাহাই দর্শনের স্বরূপ।

নির্গুণ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, এম, এ, বিদ্যারত্ন।

যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-স্বরূপ, তিনি বিশ্ব-বিকাশে আপনাকে সবিশেষ জ্ঞাতা রূপে—আদি পুরুষরূপে—প্রকাশিত করেন। তিনি সমগ্র জগতের নাম-রূপের (সমষ্টি-ভাবে) 'জ্ঞাতা' হইয়া পড়েন, এবং নামরূপাত্মক জগৎ তাঁহার 'জ্ঞেয়' হইয়া উঠে। নির্গুণ ব্রহ্মই জগতের সম্পর্কে সগুণ পরমেশ্বর রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। ব্রহ্ম হইতে ঈশ্বর কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। যে শক্তিবলে আপনারই মধ্যে জগৎ অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই শক্তি বা আত্ম-সামর্থ্যের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃই ব্রহ্মের 'ঈশ্বর'-সংজ্ঞা। ছান্দোগ্য উপনিষদে জগদ্বিকাশের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়—

"তদসৎশব্দবাচ্যং—প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিত মনিস্পন্দমসদিব—সৎ-কার্য্যাভিমুখং ঈষদুপজাতপ্রবৃত্তি ("এতেন বীজস্য উচ্ছূনতাবৎ কারণস্য সিসৃক্ষাবস্থাং দর্শয়তি"—আঃ গিঃ) সদাসীৎ। ততোঽপি লব্ধপরিস্পন্দং তৎ সমভবৎ......অঙ্কুরীভূতমিব বীজম্। ততোঽপি ক্রমেণ স্থূলীভবৎ" (ছাঃ ভাঃ, ৩।১৯।১)।

অর্থাৎ, জগৎ-উৎপত্তির প্রাক্কালে, যাহাকে স্পন্দ-রহিত ও স্তিমিত-ভাবাপন্ন থাকায় 'অসতের' ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় 'অসৎ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহাই সৎ-কার্য্যের উন্মুখ হইয়া, উহাতে ঈষৎ ক্রিয়া-প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠিল ("বীজ যেমন অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বে, কিঞ্চিৎ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠে—উহার যেমন উচ্ছূন-ভাব হয়"—আনন্দগিরি এস্থলের এই অর্থ করিয়াছেন)। এ অবস্থায় ইহাকে 'সৎ' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, অর্থাৎ উহা তখন ঈষৎ স্পন্দনোন্মুখ হইল। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায়, উহার নাম-রূপাকারে স্পন্দন অভিব্যক্ত হইল। পরে উহাই ক্রমে স্থূলাকারে দেখা দিতে লাগিল"। কঠ-ভাষ্যে ইহাকেই জগতের 'বীজাবস্থা' বলা হইয়াছে। বট-কণিকার মধ্যে যেমন বটবৃক্ষের সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রাগবস্থায়—পরে জগতে যত কিছু কার্য্য ও কারণ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তৎ-সমস্তেরই সমষ্টি, শক্তিরূপে সে অবস্থায় অন্তর্লীন থাকে। ইহাকেই জগতের 'অব্যক্ত বীজ' নামে বলা যায়; ইহাই নাম-রূপের অব্যক্ত বীজ; ইহাতে এখনও কোন ভেদ, কোন বিশিষ্টরূপ দেখা দেয় নাই। এই সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জ্জিত—'অব্যক্ত' বীজই ক্রমে নাম-রূপের আকারে অভিব্যক্ত

হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকেই কঠ-ভাষ্যে 'মায়া' নামে অভিহিত করা হইয়াছে—কঠ-ভাঃ, ৩।১১। কঠ-ভাষ্যে আরো বলা হইয়াছে যে, এই অব্যক্ত বীজ পরমাত্মার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে আশ্রিত ছিল। ব্রহ্মই এই অব্যক্ত বীজের অধিষ্ঠান (substratum)। এই জন্যই ভগবদ্‌ গীতায় বলা হইয়াছে—

"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং......সনাতনম্" (৭।১০)।

পরমাত্মার মধ্যে এই মায়াবীজ একাকারে লীন ছিল—"চিদেকাত্মনা বিলীনত্বাৎ"—উপঃ সাহস্রী। এই অবস্থায়, এই জগদ্বীজ বা মায়াকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া অসম্ভব বলিয়া, গীতায় "আমাকেই সেই সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে"—বলা হইয়াছে।

যদ্যপি ব্রহ্ম প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টং স্বতন্ত্রঞ্চ, তথাপি প্রপঞ্চো ন স্বতন্ত্রঃ...... বিকারাশ্রয়ত্বেপি অবিনাশি এব কূটস্থং ব্রহ্ম অবতিষ্ঠতে" (শ্বেঃ ভাঃ, ১।৭)।

এই মায়া বা শক্তি যোগে ব্রহ্ম কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠেন না। কেন না, ইহা ব্রহ্মেরই বিকাশোন্মুখ অবস্থা*, ইহা তাঁহারই ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা†, ইহা তাঁহারই প্রকাশ হইবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা† ; ইহা দ্বারা ব্রহ্ম যাহা তাহাই থাকিতেছেন।

মায়া, শক্তি, প্রকৃতি—এ সকলই একার্থবাচক শব্দ। পরমাত্মা, এই মায়া বা মায়ার অভিব্যক্তি যে জগৎ, তাহার অধিষ্ঠান। জগৎ সেই অধিষ্ঠানের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলেই এই মায়া বা জগৎই ব্রহ্ম হইয়া পড়ে। যাহা বিকার তাহাই নির্ব্বিকার হইয়া পড়ে। আবার, এই জগৎকে বা জগদ্বীজ মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ইহাকে (সাংখ্যদিগের ন্যায়) একটা স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়া ধরিতে পার না। কেন না, একটা বস্তুর অভিব্যক্তিকে সেই বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া ভাবিতে পারা যায় না। সকলের আশ্রয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া, স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে উহা থাকিতে পারে না। নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার এই যে জগৎ আকারে বিকাশ ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেদান্তে শুক্তির উপরে রজতখণ্ডের বিকাশ, রজ্জুর উপরে সর্পের প্রতীতি প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল স্থলে আমরা অন্তরালে যে শুক্তি বা রজ্জুর সত্তা আছে, সে কথাটা একেবারে

* বেঃ ভাঃ, রত্নপ্রভা ১।৫

† মুং ভাঃ ১।১।৮

† ছাঃ ভাঃ, ৩।১৯।১

যাই এবং উহাকে আমরা একান্তভাবে রজত বা সর্পের আকারে পরিণত করিয়া তুলি। ইহা আমাদের বুদ্ধির দোষেই হইয়া থাকে। বুদ্ধির দোষে আমরা সকলের অধিষ্ঠান ব্রহ্মবস্তুকে নামরূপাত্মক জগতের আকারে পরিণত করিয়া কেবল জগৎকেই দেখিতে পাই, জগৎ লইয়াই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নিষ্পন্ন করি। ইহার অন্তরালে যে পরমাত্মা আছেন, নামরূপাদি যে সেই পরমাত্মারই অবস্থা বিশেষ—ইহারা যে তাঁহারই বিকাশ বা বিভূতিমাত্র, সে তত্ত্বটী আমাদের বুদ্ধি ভুলিয়া যায়। সাধে কি ইহাকে মায়া বলা হইয়াছে?

জগদ্বীজ মায়াই বল; বা নামারূপাত্মক জগৎই বল; অথবা মায়াযুক্ত সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরই বল;—অন্তরালবর্ত্তী ব্রহ্মেরই ইহারা বিকাশ বা অবস্থান্তর মাত্র, একথা ভুলিয়া যদি ঐগুলিকেই একান্ত স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়া মনে কর;—বেদান্তে ইহাকেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই ভাবেই বেদান্তে ইহাদিগকে মিথ্যা, অসত্য বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। বিশেষ একটা আকার ধারণ করিলেই বস্তুটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না—"ন হি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তুন্যত্বং ভবতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ভাঃ) ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। ইহা ভুলিলে চলিবে না।

বেদান্তে তিন প্রকার সত্তা স্বীকৃত।

বেদান্ত-গ্রন্থে তিন প্রকার সত্তার উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়।

(১) মুখ্য বা সর্ব্বপ্রধান সত্তা। ইহাকে পারমার্থিক (Absolute) সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, স্বাধীন।

(২) পরতন্ত্র বা ব্যবহারিক সত্তা। পরিদৃশ্যমান্ জগতের সত্তা এইরূপ। এই সত্তা অন্য হইতে গৃহীত, সুতরাং পরতন্ত্র বা অন্যের অধীন।

(৩) আর এক প্রকার সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়। ইহা ভ্রান্তি-জনিত; ভ্রম চলিয়া গেলে ইহা থাকে না।

ইহাদের মধ্যে যেটী মুখ্য পারমার্থিক সত্তা, সেটী পরমাত্মার। বস্তুর যে সত্তা থাকার দরুণ আমরা সাংসারিক প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকি, তাহারই নাম ব্যবহারিক সত্তা। জগতে অভিব্যক্ত আকাশ, বায়ু, জলাদি নাম-রূপাত্মক বস্তুমাত্রেরই পরতন্ত্র (Relative or derivative) সত্তা আছে। আর এক প্রকার বস্তু আছে, যাহাদের ভ্রান্ত-প্রতীতি হইয়া থাকে,—যেমন কখন কখন একখণ্ড রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয়; ভগ্ন শুক্তি-খণ্ডকে রৌপ্যখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্থলে প্রাতীতিক সত্তা (Illusive appearance) স্বীকৃত হয়।

প্রথমটি কাহার অধীন নহে; উহা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা।

দ্বিতীয়টি পরতন্ত্র, অন্যাধীন সত্তা। তৃতীয় সত্তা মায়াময়, ভ্রমাত্মক, ইহা দ্রষ্টাকে বঞ্চিত করে। আমরা জগতে সে সকল নাম-রূপাত্মক বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদের কাহারই পারমার্থিক সত্তা নাই, ইহাই বেদান্তের মত। আমাদের স্বপ্নদর্শন কালে আমরা যে সকল বস্তু অনুভব করিয়া থাকি; বেদান্তমতে তৃতীয় প্রকারের সত্তা সেই সকল বস্তুর। কাল্পনিক বস্তুমাত্রেরই এইরূপ সত্তা আছে। আমাদের মন বা ইন্দ্রিয় কর্তৃকই এরূপ প্রতীতি বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর সত্তা, যতদিন না আমরা ব্রহ্ম-লাভে মুক্ত হইয়া না যাইতেছি, ততদিন এগুলির সত্তা থাকিবেই।

বেদান্তে প্রাতিভাসিক সত্তার বস্তুগুলিকে কখন কখন 'অসত্য', 'মিথ্যা' বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শঙ্কর-ভাষ্যে অপর কতকগুলি বস্তুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি সেইগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে একান্ত অসত্য, মিথ্যা, অলীক বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেগুলি যেমন—বন্ধ্যা-পুত্র, আকাশ-কুসুম, আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগরের দর্শন—প্রভৃতি। কিন্তু এ তত্ত্ব আর একদিন বলিব।

অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

শ্রীকল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ।

একটি তালের উপর কাক বসিল এবং তৎক্ষণাৎ তালটি পড়িয়া গেল, মাত্র এইটুকু দেখিয়াই যদি কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে কাকের উপবেশনই তালের পতনের কারণ, অর্থাৎ প্রথমটি ঘটিলেই দ্বিতীয়টি অবশ্যই ঘটিবে তাহা হইলে তাহার বিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচরাচর আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকি যে একটি বস্তু বা ঘটনা কোনও কোনও বস্তু বা ঘটনার সহিত কার্য্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত হইলেও অধিকাংশ বস্তু বা ঘটনার ভিতর এরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং যে কোনও দুইটি বস্তু বা ঘটনাকে কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত অথবা অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। একস্থানে এক্ষণে দুইটি পুস্তক পাশাপাশি রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে একত্রে থাকার জন্য একটা বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু কিছুকাল পরেও যে তাহাদের মধ্যে ঠিক এইরূপ সম্বন্ধই থাকিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। রাজপথের কোনও একস্থানে দাঁড়াইয়া পথিকশ্রেণী ও যানবাহনাদির গতির যে ধারা আজ লক্ষ্য করিলাম আগামী কালও যে ঠিক সেই ধারাই বর্ত্তমান থাকিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু বিষপান করিবার পর যদি কাহারও মৃত্যু হয় তাহা হইলে বিষপান ও মৃত্যু এই দুইয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে কোনও মনুষ্যদেহে অনুরূপ বিষপ্রয়োগ করিলে একই ফল পাওয়া যাইবে তাহার কোনও অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই মৃত্যু ও বিষপ্রয়োগ এই দুইয়ের সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ যে মাত্র দৈশিক অথবা কালিক সম্বন্ধ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ এবং বস্তু বা ঘটনামাত্রেরই যে অন্য কোনও একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা অথবা বস্তু বা ঘটনাসমষ্টির সহিত এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে ইহাই আমাদের স্থিরবিশ্বাস। একটি কার্য্য থাকিবে অথচ তাহার কারণ থাকিবে না ইহা আমাদের ধারণায় আসে না। আবার কেবল মাত্র কার্য্যও কারণের সম্বন্ধই যে অবিচ্ছেদ্য তাহা নয়, আরও কোনও কোনও স্থলে এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। একটি

বস্তুর দৈর্ঘ্য থাকিলে অবশ্যই তাহার প্রস্থ থাকিবে অথবা যদি কোনও ত্রিভুজ সমবাহুবিশিষ্ট হয় তাহার কোণগুলিও অবশ্যই সমান হইবে। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে বস্তু বা ঘটনাসমূহের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ থাকে তাহাদের একটী থাকিলে অপরটি অবশ্যই থাকিবে কখনও ইহার অন্যথা হইবে না। আবার নানাবিধ সম্বন্ধ আছে যাহারা এরূপ নহে। কোনও একটি পুষ্প যে অবশ্যই রক্তবর্ণ হইবে অথবা কোনও একটী বিশেষ দিনে যে অবশ্যই বারিপাত হইবে এরূপ মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

কিন্তু আমাদের সাধারণ বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন তাহা নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষায় যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। এবিষয়ে যাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এস্থলে ইংরাজ দার্শনিক ডেভিড্ হিউমের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। হিউম্ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মতে দুই বা ততোধিক বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনাকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারে এরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বাস্তব জগতে নাই। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিষয়ে আমাদেব যে ধারণা আছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক ঘটনা বা কার্য্যের কারণ আছে, এই কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ কারণের অন্তর্নিহিত এক শক্তি বলে উহা কার্য্যে পরিণত হয়, কারণ ও কার্য্যের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, এবং এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কোনও কারণবিশেষের পুনরাবির্ভাব হইলে কার্য্যবিশেষেরও পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এই সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাসের ভ্রম দেখাইতে গিয়া হিউম্ বলিতেছেন যে কার্য্য ও কারণের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অস্তিত্বের ধারণা কেবলমাত্র আমাদের অতীত সংস্কার প্রসূত বিশ্বাসমাত্র। বাস্তব জগতে এরূপ কোনও সম্বন্ধের অস্তিত্ব নাই অথবা থাকিবার কোনও প্রমাণ নাই। বহুবার 'ক'র আবির্ভাবের পর 'খ'র আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মনে এই দুইয়ের ধারণার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া যায় এবং কেবল ইহারই ফলে 'ক'কে প্রত্যক্ষ করিবামাত্র আমরা 'খ'র আবির্ভাবের প্রত্যাশা করিয়া থাকি। কিন্তু সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালে যে একটী বিশেষ

কারণ হইতে বিশেষ কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে এরূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নাই।

হিউম্ ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা যে বিচার প্রণালী দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা একটু বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। যে জগতের সহিত আমাদের পরিচয় আছে তাহাকে সাধারণ-ভাবে মনোজগৎ ও বহির্জ্জগৎ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বহির্জ্জগতের বস্তুগুলির মধ্যে যেমন নানাবিধ সম্বন্ধ আছে আমাদের মনের অন্তর্গত ভাবধারার মধ্যেও সেইরূপ নানাবিধ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই দুই জগতের প্রকৃতির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য সহজেই আমাদের কাছে ধরা পড়ে। যখন আমরা কোন সুসংবদ্ধ প্রণালী অনুসারে চিন্তা করি না, যখন নানাবিধ চিন্তা, বিশ্বাস বা ধারণা মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায় তখন তাহাদের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি গৃহ দেখিয়া আজ আমার মনে যে সব চিন্তার উদয় হইল কালও যে তাহা দেখিয়া ঠিক সেই সব চিন্তার উদয় হইবে এমন নহে। কিন্তু আমরা যখন কোনও সুসংবদ্ধ প্রণালী অনুসারে বুদ্ধিমূলক বিচার করিয়া থাকি তখন আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধের সাক্ষাৎ পাই। "মনুষ্যমাত্রেই মরণশীল" "রাম মনুষ্য" অতএব "রামের মরণ অবশ্যম্ভাবী" যখন এইভাবে বিচার করি তখন দেখিতে পাই যে প্রথক দুইটি চিন্তার সহিত তৃতীয় চিন্তাটির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। প্রথম বাক্য দুইটি সত্য অথচ তৃতীয়টী সত্য নয় এরূপ আমরা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু হিউম্ বলেন যে বহির্জ্জগতের বস্তুগুলির মধ্যে এরূপ কোনও সম্বন্ধের অস্তিত্বের সন্ধান আমরা পাই না। অগ্নিসংস্পর্শে জল বাষ্পে পরিণত হয়, এস্থলে অগ্নিসংস্পর্শ এবং জলের বাষ্পীভূত হওয়া এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকার প্রমাণ নাই। এইরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্ব দুইভাবে জানা যাইতে পারে, প্রথমতঃ বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা, দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞাননিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা বহির্জ্জগতে এরূপ কোনও সম্বন্ধের অস্তিত্বের বিষয় জানা যায় না। যেখানে কেবলমাত্র আমাদের মনোজগতের চিন্তাধারা লইয়াই কারবার সেখানে কেবলমাত্র বিচারমূলক যুক্তি দ্বারাই কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা গণিতশাস্ত্রে পাইয়া থাকি। যে কোনও ত্রিভুজের যে কোনও দুইটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুটি অপেক্ষা দীর্ঘতর ইহা অবিসংবাদিত সত্য। সরলরেখা, ত্রিভুজ প্রভৃতির সংজ্ঞা যদি প্রথমেই আমরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লই তাহা

হইলে আমাদের প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞার সত্যতার ব্যতিক্রম কোনও কালে হওয়া সম্ভব নয়। এই সত্যটি প্রতিপাদন করিতে হইলে আমাদের সরলরেখা, ত্রিভুজ প্রভৃতি না দেখিলেও চলে, বস্তুতঃ এক বা ততোধিক ত্রিভুজ দেখিয়া যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি এমন নয়, আমাদের এই মীমাংসায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কোনও স্থান নাই। কিন্তু এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের সিদ্ধান্ত যেমন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না সেইরূপ কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্যও নহে। জ্যামিতির সংজ্ঞানুযায়ী কোনও সরলরেখা বা ত্রিভুজ কোনও কালেই আমাদের দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যেসকল ত্রিভুজাকৃতি বস্তু আমরা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি তাহাদের কোনও কোনওটির সম্বন্ধে উপরে প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি সত্য নাও হইতে পারে। অর্থাৎ "ত্রিভুজের যে কোনও দুইটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর" এই সিদ্ধান্তটি আমাদের চিন্তাধারার মধ্যেই এক বিশেষ সম্বন্ধের সূচনা করিতেছে বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে ইহা কোনও কথাই বলে না। আমাদের মনের গঠনই এইরূপ যে সরলরেখা ও ত্রিভুজ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা করিলে এই সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। আরও একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে যদি এক বা ততোধিক চিন্তা মূলতঃ একার্থক হয় কেবল তাহা হইলেই তাহাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে। "রাম বনে গিয়াছিলেন" এবং "দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র বনে গিয়াছিলেন" এই দুইটির মধ্যে একটী সত্য হইলে অপরটীও সত্য হইতে বাধ্য, কারণ এই বাক্য দুইটি একার্থক। "এই পুষ্পটি রক্তবর্ণ" ইহা সত্য হইলে "এই পুষ্পটি রক্তবর্ণ নহে" ইহা অবশ্যই মিথ্যা হইবে, কারণ প্রথম বাক্যটির সত্যতা এবং দ্বিতীয় বাক্যটির মিথ্যাত্ব একই ব্যাপার। সেইরূপ "৭+৫=১২" "একটি সমকোণ ত্রিভুজের বাহু তিনটিও সমান হইবে" এই প্রকার সিদ্ধান্তগুলিও অবিসংবাদিতভাবে সত্য কারণ মূলতঃ তাহারা একই চিন্তার পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাহারা আমাদের চিন্তাধারার প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, বহির্জ্জগতের তথ্য সম্বন্ধে কিছুই বলে না। এখন দেখিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়জ্ঞাননিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা কার্য্য ও কারণের মধ্যে আমরা কিরূপ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারি। অগ্নি ও বাষ্প সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, অগ্নিসংস্পর্শ ও জলের বাষ্পে পরিণত হওয়া এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। অর্থাৎ অগ্নি বলিতে আমরা বাষ্প বুঝি না, অগ্নিসংস্পর্শ বলিতে আমরা জলের বাষ্পীভূত হওয়া বুঝি না। যে ব্যক্তি কখনও জলের সহিত অগ্নিসংস্পর্শ দেখে নাই সে শত বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিলেও অগ্নির মধ্যে বাষ্প অথবা বাষ্পের মধ্যে অগ্নির

সন্ধান পাইবে না। সুতরাং অগ্নি সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়াও আমরা বলিতে পারি না যে "অগ্নিসংস্পর্শে জল বাষ্পে পরিণত হয়" ইহা একটী অবিসংবাদিত সত্য অথবা অগ্নিসংস্পর্শ ও বাষ্পের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। অগ্নিসংস্পর্শে জল প্রস্তরীভূত হয় এইরূপ চিন্তা করিতেও কোনও বাধা নাই বা ইহা একেবারেই অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য এরূপ মনে করিবারও কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা যদি কার্য্য ও কারণের মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহা হইলে হয়ত পর্য্যবেক্ষণ বা ভূয়োদর্শন দ্বারা তাহা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হিউমের মতে তাহা পাইবারও কোনও সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি আজীবন দেখিয়াছে যে জল অগ্নিসংস্পর্শে বাষ্পে পরিণত হয় সেও অগ্নি জল বাষ্প ইত্যাদির অতিরিক্ত কোনও সংযোগসূত্র দেখে নাই এবং সেও কখনও বলিতে পারিবে না যে সকল দেশে ও সকল কালে জল অগ্নিসংস্পর্শে অবশ্যই বষ্পে পরিণত হইবে। কারণ হইতে কার্য্যে যে কোনও শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে ইহাও আমরা কখনই বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, এমন কি আমাদের মনের বাহিরে যে বল বা শক্তি আছে তাহাও আমরা নিঃশংসয়ে বলিতে পারি না। আমরা যখন আমাদের হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া থাকি তখন আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাই। আমরা যখন বাহির হইতে কোনও বাধা পাই তখন বহির্জ্জগতেও আমাদের শক্তির অনুরূপ শক্তি আছে ইহা মনে করা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এরূপ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও ভারী বস্তু স্থানচ্যুত করিতে হইলে তাহার উপর আমরা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া থাকি এবং সেই বস্তুটি যখন আমাদের হস্তের সংস্পর্শে আসে এবং স্বচ্ছন্দভাবে হস্তসঞ্চালনে বাধা দেয় তখন হস্তের সেই অংশে একটা চাপের অনুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা ইহাও দেখা গিয়াছে যে বাহিরের কোনও বস্তুর সহিত হস্তের সংস্পর্শ না হইলেও শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্নায়ুমণ্ডলীতে ভিতর হইতে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেক করান যাইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বল বা শক্তি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। বহির্জ্জগতের যখন কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার মূলে যে কোনও শক্তির ক্রিয়া আছে এরূপ বিশ্বাস করা স্বাভাবিক হইলেও তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অতএব আমাদের মনোজগতের বাহিরে যখন শক্তি বা বলের কোনও সন্ধান পাই না তখন একটী বস্তু নিজের শক্তিদ্বারা একটী কার্য্য উৎপাদন করে একথার কোনও অর্থই হয় না এবং তাহা হইলে কারণ ও কার্য্য

নামে অভিহিত বস্তু বা ঘটনাদ্বয় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত ইহাও বলা যায় না।

বহির্জ্জগতে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই যে যুক্তিগুলি প্রদত্ত হইয়া থাকে ইহারা কতদূর বিচারসহ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এই সকল যুক্তির মূল কথা হইতেছে যে, যে দুইটী বস্তু বা ঘটনাকে আমরা কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত করিয়া থাকি তাহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহাদের একটী অপর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অগ্নি এবং বাষ্প দুইটী পৃথক বস্তু, জলে অগ্নিসংস্পর্শ এবং জলের বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। সুতরাং প্রথমটীর মধ্যে দ্বিতীয়টীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে দুইটী বস্তু বা ঘটনাকে কখন পৃথক অথবা ভিন্ন বলিব? প্রশ্নটী যে একেবারে নিরর্থক নহে তাহা একটী সামান্য উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং মিঃ চার্চ্চিহিল দুই ব্যক্তি না একই ব্যক্তি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সকলেই বলিব যে এখানে নাম বা পদের বিভিন্নতা থাকিলেও দুইটীই একই ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। সুতরাং দুইটী নাম বা শব্দ বিভিন্ন হইলেই যে তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি দুই হইবে এক হইতেই পারে না এরূপ বলা যায় না। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে যদি দুইটি পদের উদ্দিষ্ট বস্তু ঠিক একই সময়ে একই স্থানে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদেব গুণসমষ্টিও একই হয় তাহা হইলে তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তু এক, দুই নহে। দুইটী সর্ব্বতোভাবে অনুরূপ রৌপ্যমুদ্রা দুই স্থানে একই সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে আমরা বলিব যে দুইটী মুদ্রা আছে একটী নহে। আজ যেস্থলে একটী রৌপ্যমুদ্রা দেখিলাম কাল ঠিক সেই স্থলে একটি তদনুরূপ মুদ্রা দেখিলেও তাহারা দুইটী বিভিন্ন মুদ্রা হইতে পারে। সুতরাং দুই বা ততোধিক পদের (অথবা পদসমষ্টির) উদ্দিষ্ট বস্তু এক অথবা পৃথক তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারদ্বারা স্থির করিতে হইবে। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান যতটা সহজ বলিয়া মনে হইতেছে ইহা ততটা সহজ নহে। কেন সহজ নহে তাহা একটি সাধারণ উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। মনে করা যাক্ আমি একটী রৌপ্যমুদ্রাকে পাঁচমিনিট ধরিয়া দেখিতেছি অর্থাৎ আমার দৃষ্টি কিছুক্ষণ ধরিয়া একটী উজ্জ্বল শুভ্র গোলাকার পদার্থের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। (এখানে সাধারণ প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার করা হইল যদিও আমার দৃষ্ট বিষয়টী এক দুই অথবা বহু ইহাই বিচার্য্য বিষয়) তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তে যে মুদ্রাটী দেখিতেছি ও পাঁচমিনিট আগে সেই একই স্থানে যে মুদ্রাটী দেখিয়াছিলাম তাহারা দুইটী বস্তু

অথবা একই বস্তু? পাঁচমিনিট আগে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাকে যদি ম' বলা যায় ও এই মুহূর্ত্তে সেই একই স্থানে যাহা দেখিতেছি তাহাকে যদি ম২ বলা যায় যাহা হইলে ম১. এবং ম২ ইহারা এক অথবা পৃথক? যদি বলা যায় যে তাহারা দুইটী বস্তু তাহা হইলে ম২ যখন বর্ত্তমান ম১ সেই একই স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ম১ হয় ইহার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে নহেত অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি যতক্ষণ ঐ স্থানে নিবদ্ধ আছে তাহার মধ্যে ম১কে ধ্বংস হইতে অথবা স্থানান্তরিত হইতে দেখি নাই বা অপর কেহও দেখে নাই, সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে ম১ ম২য়ের সহিত একই সময়ে একই স্থানে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দুইটী পৃথক বস্তু একই সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। অতএব ম১ ও ম২ দুইটী পৃথক বস্তু নহে একই বস্তু। 'ম' অর্থাৎ মুদ্রা নামে একটি বস্তু কিছুকাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালের প্রবাহ তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহার একত্ব তাহাতে ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু এস্থলে আপত্তি হইবে যে ম১ আমাদের সকলের অলক্ষ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা স্থানান্তরিত হইতে পারে এবং তাহার স্থলে ম২য়ের আবির্ভাব হইতে পারে, অর্থাৎ ম১ এবং ম২ সদৃশ কিন্তু অভিন্ন নহে। ছায়াচিত্রের পর্দ্দায় একটী চিত্র অপসারিত হইলে আর একটী চিত্রের আবির্ভাব হয় হবং সেটীর পর আর একটীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিত্রগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের না হইয়া ঠিক একপ্রকারের হয় তাহা হইলে আমরা পর্দ্দার উপরে কিছুকাল ধরিয়া একটী অচল অপরিবর্ত্তিত চিত্র দেখিতে পাই এবং উহা একটী বস্তু এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন হইলেও উহা বাস্তবিকপক্ষে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সদৃশ চিত্রের সমষ্টিমাত্র। সেইরূপ যে মুদ্রাটিকে আমরা একই বস্তু বলিয়া মনে করিতেছি তাহা ম১, ম২, ম৩ প্রভৃতির সমষ্টি হইতে পারে ম১, ম২ প্রভৃতি আমাদের অলক্ষ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং ম২, ম৩ প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের স্থান অধিকার করে এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। আমাদের অবস্থা যদি প্লেটোর কল্পিত গুহার অধিবাসিদের অবস্থার ন্যায় হয় তাহা হইলে আমরা হয়ত কেবল কতকগুলি ছায়ার আগমন ও নিঃসরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু একটী ছায়া অপর ছায়াগুলির সদৃশ হইলেও তাহাদের মধ্যে একত্ব বা অভিন্নত্ব নাই। এইরূপ আপত্তির উত্তরে দুইটী কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা সম্ভব বলিয়া মনে করা হয় তাহা সত্য কি না বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ বাস্তবিক যে একটী বস্তু ধ্বংস হইয়া গিয়া তাহার স্থলে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটী বস্তুর আবির্ভাব হয় তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। ছায়াচিত্রের পর্দ্দায় প্রতিফলিত

চিত্রগুলি যে একের পর আরেকটী অপসারিত হইয়া যায় তাহা আমরা ছায়াচিত্রযন্ত্রের সাহায্য লইয়া সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি, কিন্তু একটী মুদ্রার বেলায় সেরূপ কিছু প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। আর পর্দায় প্রতিফলিত চিত্রটী যে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের সমষ্টি তাহা বুঝাইতে গিয়া আমাদের এমন কতকগুলি বস্তুর সাহায্য লইতে হয় যাহারা পলে পলে ধ্বংস না হইয়া কিছুকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে পারে, অর্থাৎ যাহারা মাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্র বা ছায়ার সমষ্টিমাত্র নয়। সেইরূপ যদি ইহা প্রমাণ করিতে হয় যে মুদ্রাটি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বিচ্ছিন্ন কতকগুলি গোলাকার বিষয়ের সমষ্টিমাত্র তাহা হইলে আমাদের এমন কতকগুলি বস্তুর জ্ঞানের প্রয়োজন যাহারা কেবলমাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সমষ্টিমাত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে পর্দ্দায় প্রতিফলিত চিত্রগুলির প্রত্যেকটিই পর্দ্দার উপর অন্ততঃ কিছুকাল (তাহা যতই অল্প হউক না কেন) ব্যাপিয়া অবস্থান করে। কোন চিত্রটিই যদি ক্ষণকালের জন্যও পর্দ্দার উপর স্থায়ী না হয় তাহা হইলে সেইরূপ সহস্রাধিক চিত্রের সমষ্টিও কাল ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। সহস্র শূন্যের সমষ্টি শূন্যই হইবে। সেইরূপ যদিও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে মুদ্রাটি প্রকৃতপক্ষে ম১, ম২, ম৩, প্রভৃতি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সমষ্টিমাত্র তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে এইগুলির প্রত্যেকটি অন্ততঃ ক্ষণকাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ম১ অথবা ম২ যদি ক্ষণকালব্যাপী স্থায়ী দ্রব্য বা পদার্থ হয় তাহা হইলেও ক্ষণের একটা প্রসার থাকিবে এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যেও পূর্ব্ববর্ত্তী ম১ এবং পরবর্ত্তী ম১ এই দুইয়ের মধ্যে একটা ভেদ বা বিভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে। তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বেকার প্রশ্নই আবার উঠিবে যে ক্ষণের একটি ভগ্নাংশ ব্যাপিয়া যে ম১ বর্ত্তমান এবং অপর একটি ভগ্নাংশ ব্যাপিয়া যে ম১ বর্ত্তমান ইহারা দুই না এক? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইতেছে যে ইহারা পৃথক বা ভিন্ন হইয়াও এক। একত্ব এবং ভিন্নত্ব একান্তভাবে পরস্পরবিরোধী নহে। বিভিন্নতাবর্জ্জিত ঐক্য অথবা ঐক্যবর্জ্জিত বিভিন্নতা এই দুইই অসম্ভব। এখন যদি ক্ষণকালের জন্যও একটি বস্তু একই থাকিয়া বিভিন্ন হইতে পারে তাহা হইলে দীর্ঘকালের জন্যও যে কেন পারিবে না তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অর্থাৎ আমি পাঁচমিনিট কাল বা অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া একই স্থানে যে মুদ্রাটি দেখিতেছি তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন হইয়াও এক ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ বিপরীত প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ ইহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। এইবার স্থায়ী অচল বস্তু হইতে পরিবর্ত্তনশীল বস্তুতে আসা যাক্। যখন মৃদু উত্তাপে

কটাহস্থিত ঘৃত গলিতে থাকে তখন আমরা একটি ক্রমিক নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই পরিবর্ত্তন কিছুকাল ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে, ইহার মাঝে কোনও ব্যবধান বা বিরাম থাকে না। কোনও এক সময়ে ছেদ টানিয়া আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে এইখানে একটি দ্রব্যের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি হইল এবং পরে আর একটি সম্পূর্ণ নূতন দ্রব্যের উদ্ভব হইল। যে কোনও মুহূর্ত্তের মধ্যে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তাহাদের পৃথক করিয়া দেখান যায় না। কালের পরিমাণ যতই স্বল্প হউক না কেন তাহারই মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে একই পদার্থ অভিন্ন থাকিয়াও পরিবর্ত্তিত হইতেছে অথবা নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। পরিবর্ত্তন যেখানে নিরবচ্ছিন্ন এবং মন্থর সেখানে ভিন্নতার মধ্যে অভিন্নত্ব বা ঐক্য সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু একটি বস্তুর ঐক্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াও অব্যাহত থাকিতে পারে ইহা একবার স্বীকার করিয়া লইলে পরিবর্ত্তন যেখানে দ্রুত অথবা যেখানে পরিবর্ত্তনজনিত ভেদের পরিমাণ বেশী সেখানেও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সুতরাং দুই বা ততোধিক পদ ব্যবহার করিলেই যে তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তুগুলি নিশ্চয় পৃথক বা ভিন্ন হইবে এরূপ নহে।

দেশকালনিয়ন্ত্রিত জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আকাশে দৃশ্যমান গোধূলির বর্ণচ্ছটা ও হিমালয় এই দুইই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের গতি কোথাও দ্রুত কোথাও বা মন্থর। কিন্তু একটা মূলগত ঐক্য না থাকিলে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আমরা আমাদের সুবিধা ও প্রয়োজনানুসারে এক নিরবচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনা-প্রবাহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া থাকি বা বর্ণনা করিয়া থাকি, কিন্তু তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টিতে এইরূপ বিভাগ নিতান্তই কৃত্রিম ও অযথার্থ। যাহাদিগকে আমরা কারণ ও কার্য্য বলিয়া থাকি তাহারা যদি একই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের দুইটি অংশ হয় তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে তাহারা ভিন্ন বা পৃথক বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহারা মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। 'ক'র পরে 'খ'র আবির্ভাব কয়েকবার দেখিয়া তাহারা যে কার্য্যকারণসূত্রে আবদ্ধ এই সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে উদয় হয় বটে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'খ' 'ক'য়ের পরিণতি এইরূপ দেখাইতে না পারা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সম্ভাবনা নিশ্চয়তার আকার ধারণ করে না। একটা ভ্রাম্যমাণ গোলক যখন আর একটি অনুরূপ গোলকের সংস্পর্শে আসিয়া থামিয়া যায় ও দ্বিতীয় গোলকটা চলিতে থাকে তখন ঐ দ্বিতীয়গোলকটার গতি যে প্রথম গোলকটার গতিরই অংশ এইরূপ উপলব্ধি করিয়াই আমরা

সিদ্ধান্ত করি যে উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। প্রথম গোলকটী একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইবার সময় তাহার গতিতে যেরূপ একটি অখণ্ডতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ যখন দ্বিতীয় গোলকটী চলিতে আরম্ভ করে তখন তাহার ও প্রথম গোলকটির গতির মধ্যে একটী অখণ্ডতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূ অগ্নিসংযোগে যখন কোনও পাত্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন ঐ পাত্রের উত্তাপ এবং অগ্নির উত্তাপ যে অভিন্ন ইহাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। একটী বস্তু বা ঘটনার পর নিয়মিতভাবে আর একটী বস্তু বা ঘটনার আবির্ভাব ইহা কার্য্য-কারণসম্বন্ধের মূলতত্ত্ব নহে। কালপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য যে কারণ হইতে ভিন্ন হইয়াও এক ইহাই কার্য্যকারণসম্বন্ধের স্বরূপ।

কার্য্য ও কারণ যদি মূলতঃ অভিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হইবে কেবলমাত্র কালিক সম্বন্ধ নয়। কোন্ কারণের পর কোন্ কার্য্যের আবির্ভাব হয় তাহা বারবার প্রত্যক্ষ না করিলে কেবলমাত্র কোনও কারণবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার কার্য্যসম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না এই উক্তিও সত্য নহে। কোনও বস্তুর মধ্যে একটী ছুরিকা প্রবেশ করাইলে সেই বস্তুটী সেইস্থানে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এখানে একটী কারণের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মাত্র কারণটী দেখিয়া বলা যাইতে পারে। কোনও বস্তুতে ছুরিকা প্রবেশ করান এই ব্যাপারের অর্থ যদি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় তাহা হইলে সেই বস্তুটী যে অবশ্যই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি জীবনে কখনও কোনও বস্তুতে ছুরিকা প্রবেশ করিতে দেখে নাই সেও বলিতে পারিবে যে কোনও বস্তুর কোনও স্থানে ছুরিকা প্রবিষ্ট হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল সেই বস্তুটীর সেই স্থানে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়া। একটী ত্রিভুজ সমবাহুবিশিষ্ট হইলে তাহার তিনটী কোণ সমান হইবে ইহা যেমন ইন্দ্রিয়জ্ঞাননিরপেক্ষ অবিসংবাদিত সত্য, উপরে কথিত সত্যটীও সেইরূপ। এখানে এই আপত্তি হইতে পারে যে কোনও বস্তুতে ছুরিকা প্রবিষ্ট হওয়া ও সেই বস্তুটীর দুইভাগে বিভক্ত হওয়া ত একই ব্যাপার, সুতরাং এখানে একই ব্যাপারকে দুইভাবে বলা হইয়াছে অর্থাৎ উপরে কথিত বাক্যটী একটি সমার্থক বাক্য। আমাদেরও বক্তব্য এই যে এই দুইটী ব্যাপার বস্তুতঃ অভিন্ন কিন্তু এই অভিন্নত্ব ভিন্নতারহিত অভিন্নত্ব নহে। ছুরিকার দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহার গতি একটী ঘটনা, এবং সেই বস্তুটীর দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহার দুইভাগে বিভক্ত হওয়া আর একটী ঘটনা, অথচ দ্বিতীয়টী প্রথমটীরই পরিণতি। এই দুইটী মূলতঃ অভিন্ন

বলিয়াই প্রথমটী ঘটিলে দ্বিতীয়টী অবশ্যই ঘটিবে, কখনও ইহার অন্যথা হইবে না এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে সকল স্থলে এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায় না। জলে শর্করা নিক্ষেপ করিলে তাহার অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইবে অথবা আদৌ কোন পরিবর্ত্তন হইবে কিনা তাহা প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা ভিন্ন জানা যাইবে না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে শর্করা ও জলের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার জন্যই জলের সংস্পর্শে শর্করার পরিণতি কি হইবে তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু যদি জগতের প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতি, তাহাদের সূক্ষ্মতম অংশের সংস্থান ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে কোন্ সময়ে কোন্ কারণ হইতে কোন্ কার্য্য হইবে তাহা গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যেই বলিয়া দিতে পারিতাম, তজ্জন্য ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন হইত না।

কারণ ও কার্য্য দুইটী ভিন্ন পদার্থ, অতএব তাহাদের মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে না এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই যুক্তিটীর সারবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। অতঃপর দ্বিতীয় যুক্তিটি আলোচনা করা যাউক। হিউম্ ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা বলিয়া থাকেন যে কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আমাদের প্রতক্ষগোচর হয় না। আমরা কেবলমাত্র ইহাই দেখিতে পাই যে কারণের পর কার্য্যের আবির্ভাব হইতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগসূত্রের সন্ধান পাই না। এইরূপ সংযোসূত্রের ধারণা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং যাহা কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত তাহার কোনও বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে দুইটী বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যদি কোনও সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে এই সম্বন্ধটী এই দুই বস্তু বা ঘটনার অতিরিক্ত কোনও তৃতীয় বস্তু বা ঘটনা নহে। সুতরাং বস্তু বা ঘটনাকে যেভাবে দেখা যাইতে পারে কোনও সম্বন্ধকে সেভাবে দেখা যাইবে না। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ হয় না তাহাই যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বা অবাস্তব হইবে এমন নহে। কোনও বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হইলেই জ্ঞানলাভ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত যদি বুদ্ধির সাহচর্য্য না থাকে তাহা হইলে মাত্র ইন্দ্রিয়োপলব্ধি হইতে কোনও জ্ঞান হয় না। দূর হইতে কিয়ৎ পরিমাণ রং দেখিয়া যখন আমি বুঝিতে পারি যে একটী পুষ্প দেখিতেছি তখন এই জ্ঞানলাভ করিতে মাত্র চক্ষুর ব্যবহার যথেষ্ট নহে বুদ্ধির সাহচর্য্যেরও প্রয়োজন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও

নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কোনও একটী বিষয়ের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়, যাহা ঠিক সেই সময়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন হয় নাই তাহার কোনও সন্ধান দিতে পারে না। অথচ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান কোনও বিশেষ স্থান বা সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। "এই রক্তবর্ণের বিষয়টি আমার সম্মুখে অবস্থিত একটী পুষ্প" এইরূপ জ্ঞান হইতে হইলে এই বিষয়টির সহিত পূর্ব্ব দৃষ্ট কোনও কোনও বিষয়ের সাদৃশ্যের এবং কোনও কোনও বিষয়ের বৈষম্যের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। অধিকন্তু এই পুষ্প বস্তুটি এক্ষণে আমার সম্মুখে অবস্থিত এইরূপ প্রতীতি হইতে হইলে ঐ বিষয়টির সহিত আমার ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বিষয়গুলির সম্বন্ধ জানিতে হইবে। এইরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিলে কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে পুষ্প বলিয়া জানা দূরে থাক তাহা যে একটী বস্তু অথবা একটী বিশেষ বর্ণ এরূপ জ্ঞানও হইতে পারে না। অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয় আমাদিগকে একটী বিশেষ বিষয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় বটে কিন্তু তাহাকে জানিতে হইলে তাহাকে নানাবিধ সুদূরপ্রসারী সম্বন্ধসূত্রের কেন্দ্রীভূত করিয়া জানিতে হইবে। সমগ্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোনও বিষয়কে একেবারে একান্ত করিয়া জানিবার কোনও উপায় নাই। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত বুদ্ধির সাহচর্য্য আছে বলিয়াই এইরূপ নানা সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত, বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে। সুতরাং যখন কতকগুলি সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত কোনও বস্তু বা ঘটনাবিশেষের জ্ঞান হইবারই সম্ভাবনা নাই তখন এই সম্বন্ধগুলিকে কাল্পনিক বা অবাস্তব বলা চলে না। রূপ রস শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি যে অর্থে বাস্তব যে সকল সম্বন্ধসূত্রে জড়িত হইয়া ইহারা বিবিধ পদার্থরূপে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে সেগুলিও সেই অর্থেই বাস্তব। যখন কোনও বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় হয় তখন তাহাকে এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহের অংশ বলিয়া জানি। কোনও বস্তুই দেশে বা কালে স্ব-সম্পূর্ণ নহে। তাহার সত্তাকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। অর্থাৎ যে কোনও বস্তুকে পূর্ব্বগামী কারণের কার্য্য (অর্থাৎ পরিণতি) এবং অনাগত কার্য্যের কারণরূপেই জানা যায়। ভূয়োদর্শন, পর্য্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তুর মধ্যে কি সম্বন্ধ বর্ত্তমান সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে কিন্তু কার্য্যকারণসম্বন্ধ অথবা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের জ্ঞান যে কোনও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। বরং এ কথা বলা যাইতে পারে যে এরূপ জ্ঞান ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান হওয়াই অসম্ভব। ইন্দ্রিয়সংযোগে

যেভাবে বস্তু বা ঘটনার জ্ঞান হইয়া থাকে কার্য্যকারণসম্বন্ধের জ্ঞান ঠিক সেভাবে হয় না সত্য কিন্তু এই সম্বন্ধকে কাল্পনিক বা অবাস্তব মনে করিলে ভুল করা হইবে।

এখানে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কথাই প্রধানতঃ আলোচিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ন্যায় তাহারাও যথার্থই বহির্জ্জগতের অঙ্গীভূত। জগতের প্রকৃতিই এইরূপ যে ইহা অবিচ্ছেদ্য সংযোগসূত্রে গ্রথিত অসংখ্য কার্য্যকারণধারার সমষ্টি। এই সংযোগ-সূত্রগুলি কোথাও সুস্পষ্ট কোথাও বা প্রায় অদৃশ্য। জগতের প্রকৃতি এরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইল না কেন, জগৎ দেশ ও কালের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল কেন অথবা ইহা আদৌ হইয়াছে কেন মানববুদ্ধি এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। আমরা মাত্র ইহাই বলিতে পারি সে সমগ্র জগতের প্রকৃতি যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে তাহার অন্তর্গত কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনার সহিত অন্য কতকগুলি বস্তু বা ঘটনা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেই হইবে। জগতের একটী অংশকে বুঝিতে হইলে অন্যান্য অংশের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে, কিন্তু সমগ্র জগৎকে এরূপভাবে বুঝিবার কোনও উপায় নাই।

ভ্রমপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ

শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য
(ফেলো, অমলনের ইনষ্টিটিউট)

রাসেল্, ব্রড্, প্রাইস্ প্রভৃতি এক শ্রেণীর আধুনিক দার্শনিক ভ্রম-প্রত্যক্ষসম্বন্ধে যাহা বলেন, এখানে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এঁদের মতে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয়মাত্রই সমানভাবে সত্য, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষেরও সাক্ষাৎ-বিষয় মিথ্যা নহে, কিন্তু ঐ বিসয়সম্পর্কে জ্ঞাতার মনে যে বিশ্বাস বা ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহাই মিথ্যা, আমি যখন মনে করি, দূরে একটি পাকা আম দেখিতেছি তখন সন্দেহ হইতে পারে সেটী কি গাছের ফল, না রঙ্-দেওয়া কাঠের খেলনা; কিন্তু গোল লালরঙের একটা কিছু যে আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা একেবারেই অবিসংবাদিত, খুব বেশী হয়ত, এই লাল আকৃতির সত্তাটি যে কি রকম, তৎসম্বন্ধেই কথা উঠিতে পারে; অর্থাৎ আমি প্রশ্ন তুলিতে পারি, উক্ত আকারটি কি স্বপ্নের ন্যায় শুধু মানসিক অথবা প্রাতীতিক, না উহার মনোবাহ্য বস্তু-সত্তাও রহিয়াছে। মাতাল যখন খোলা চোখে রাঙা ইঁদুর দেখে বলিয়া মনে করে, তখন যে একটা কিছু রঞ্জিত আকার তাহার জ্ঞানে ভাসমান হয়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের এই যে অনপলাপ্য সাক্ষাৎ বিষয়, যাহা বিচারবুদ্ধি বা বিশ্বাসের দ্বারা গঠিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাহাকে সেন্‌স্‌ডেটাম্ কহে। অর্থাৎ বিচার-নিরপেক্ষ, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যে- বিষয় নিশ্চিতরূপে দেওয়া রহিয়াছে, তাহারই নাম সেন্‌স্‌ডেটাম্। আমরা বাঙ্‌লায় তাহাকে ইন্দ্রিয়োপাত্ত বলিব।

রাসেল্ প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন, আম্রনামক পদার্থ কখনও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয় হইতে পারে না। উহার দিকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণও দূরত্ব হইতে দৃক্‌পাত করিলে, আমরা লালরঙ্-এর নানাবিধ, ছোটবড়, বর্ত্তুল ও আবর্ত্তুল আকার মাত্র দেখিতে পাই; কিংবা উহার গায়ে হাত বুলাইলে কোমল ও মসৃণ স্পর্শযুক্ত আকার মাত্র অনুভব করি। এই সব রঞ্জিত বা স্পর্শান্বিত আকৃতি প্রভৃতি ছাড়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানে সাক্ষাৎভাবে আর কিছু পাওয়া যায় না। ইহারাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়োপাত্ত। আম্র-নামক বস্তুটি এইসব ইন্দ্রি য়োপাত্তের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে জানার যোগ্য

নহে ; কিন্তু ইহাদের সাহায্যে পরম্পরায় জ্ঞাতব্য, কারণ, উহা আসলে পরস্পর সম্বন্ধ অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের একটি বর্গ বা শ্রেণী (group of sense data) (রাসেল্) কিংবা এইরূপ কোন শ্রেণীর ইন্দ্রিয়বাহ্য ও নিয়ত কারণ-বিশেষ (ব্রড্), অথবা কারণধর্মান্বিত কোন কেন্দ্রের চারিধারে সমাবেশযোগ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তসমূহের একটি পরিবার বা গোষ্ঠীমাত্র (family of sense data) (প্রাইস্)।

যে-অন্তঃকরণবৃত্তিকে সচরাচর বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, উহা বাস্তবিক দৃষ্টিতে দুই বিভিন্ন অনুভবের সংমিশ্রণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। প্রথমটি, কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎজ্ঞান (acquaintánce) বা 'পরিচয়' ; এবং দ্বিতীয়টি, এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত-সংস্পৃষ্ট একটি সম্বন্ধের অস্তিত্বে 'বিশ্বাস' (belief)। আমি যখন মনে করি যে, একটি বিলাতি বেগুন দেখিতেছি, তখন প্রথমে আমার সহিত লাল ও গোল আকারের কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ; তারপর আমার মনে এই বিশ্বাস বা ধারণা জন্মে যে, সাক্ষাৎজ্ঞাত এই ইন্দ্রিয়োপাত্তটি অন্যান্য কতকগুলি প্রাপ্তব্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত এক পারিবারিক যোগসূত্রে সম্বন্ধ।

তথাকথিত প্রত্যক্ষের দুই উপাদান : (১) সাক্ষাৎ পরিচয় ও (২) বিশ্বাস। তন্মধ্যে প্রথমটি সত্যমিথ্যাঘটিত দ্বন্দ্বের অতীত; কিন্তু দ্বিতীয়টি উহার এলাকায়, বিলাতি বেগুনের তথাকথিত প্রত্যক্ষে, চোখে দেখা যায় শুধু লাল রঙের একখণ্ড বর্তুল আকার ; কিন্তু মনে বিশ্বাস বা ধারণা হয় যে, ঐ আকারের গায়ে হাত লাগিলে, মোলায়েম স্পর্শ উপলব্ধি হইবে, কিংবা উহার অভ্যন্তর জিহ্বার সহিত সংযুক্ত হইলে, অম্লমধুর রস অনুভূত হইবে। অবশ্য, আলোচ্য স্থলের এই বিশ্বাসটি যথার্থ। কিন্তু রক্তবর্ণ মূষিক দেখিবার সময়, মাতাল তাহার রক্তবর্ণ ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্বন্ধে যে বিশ্বাস পোষণ করে, তাহা অযথার্থ। সে যদি বুঝিতে পারিত যে তদ্দৃষ্ট লোহিত আকৃতিখানা মূষিকনামধারী কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহা হইলে তাহার ভুল হইত না, কিন্তু মাতালের যখন দৃঢ় ধারণা থাকে যে, তাহার জ্ঞানে ভাসমান এই আকারটি তাহাকে দংশন করিতে, কিংবা কখন কখন বিড়ালের ক্ষুধা নিবারণ করিতে সমর্থ।

বিলাতি বেগুন সম্পর্কে দৃশ্যমান লোহিতবর্ণ ও ভবিষ্যতে অনুভাব্য সুখস্পর্শ, এতদুভয়ের ভিতর দেশকালঘটিত একটি বাস্তব সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং এই সম্বন্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলে অন্যায় হইবে না। কিন্তু মাতালের দৃষ্ট রক্তাকৃতি এবং মূষিকদংশনজাত-বেদনা এতদুভয়ের মধ্যে সেরূপ কোন সত্য সম্বন্ধ নাই। তাই এতাদৃশ অবাস্তব সম্বন্ধের অস্তিত্বে

বিশ্বাস করিলে ভুল হইবে। খালিজায়গায় অন্ধকারে যে-ভূত দেখা যায়, তাহার সমস্তটাই যে মিথ্যা তাহা নহে, সেখানেও কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত জ্ঞানপটে নিশ্চয়ই দেখা দেয়। অবশ্য, জ্ঞাতা যে ভাবে, উহার ভিতর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া অসম্ভব, কিংবা সেরূপ চেষ্টা করিলে, গতি রুদ্ধ হইবে, তাহা ঠিক নয়। দ্রষ্টার ধারণা এই যে, ভূতরূপে ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়োপাত্তটি কোন রামশ্যাম সদৃশ ইন্দ্রিয়োপাত্ত পরিবারের এলাকাভুক্ত; কিন্তু উহা নিছক ভ্রান্তি; কারণ, এতদনুরূপ পারিবারিক যোগসূত্র সম্পূর্ণ অবাস্তব, ভূতসংক্রান্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তট নিতান্তই ছন্নছাড়া ও গৃহহীন; কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় পরিবারেই তাহাকে স্থান দেওয়া চলে না। মাতালের দৃষ্ট রক্তাকারগুলি-সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এই সব ইন্দ্রিয়োপাত্ত একেবারেই খাপছাড়া এবং পরিবারে থাকার অনুপযুক্ত। সুতরাং ইহারা যে কোন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এইরূপ ধারণামাত্রই ভ্রমমূলক। ইহাদের বেলায় যদি ভ্রমপ্রমাদ ঘটে, তবে তাহা বিশ্বাসগত, কিন্তু জ্ঞান-গত নহে।

অবশ্য, এমন অনেক ভ্রান্তি আছে, যাহা পূর্ণভাবে নিরালম্বন নয়। অধিকাংশ ভ্রমপ্রমাদেরই কোন পারিবারিক অবলম্বন থাকে; অর্থাৎ তৎসংসৃষ্ট ইন্দ্রিয়োপাত্তটি কোন-না-কোন বাস্তবপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উহা কোন পরিবারের অন্তর্গত, এইরূপ মনে করিলেই যে ভুল হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। এখানে যে-ভ্রান্তি ঘটে তাহা, হয় পরিবারটির স্বরূপসম্পর্কে, নয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়োপাত্তটার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান ও পদমর্য্যাদা আছে, তৎসম্বন্ধে। নিম্নলিখিত উদাহরণ দুইটাতে, বোধ হয়, কথাটা কিছু স্পষ্টতর হইবে।

সমুদ্রের পারে দাঁড়াইয়া, পশ্চিমদিক্‌প্রান্তে এক ক্ষুদ্রাকার জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিয়া মনে হইল, একটী নক্ষত্র অস্ত যাইতেছে। ধরা যাউক, আসলে সেটী দূরস্থ কোন দীপস্তম্ভের আলোক। এখানে ভ্রমটী সাবলম্বন; কারণ আলোকরূপ ইন্দ্রিয়োপাত্তটী দ্রষ্টার ধারণানুযায়ী নক্ষত্র পরিবারের অন্তর্গত না হইলেও, প্রদীপ-পরিবারে তাহার ন্যায়-সঙ্গত স্থান রহিয়াছে। এখানে, উপলব্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত সম্বদ্ধ একটি বাস্তব পরিবার আছে; কিন্তু ঐ পরিবারের স্বরূপ সম্বন্ধে, জ্ঞাতা যে-বিশ্বাস পোষণ করে, তাহা মিথ্যা।

অন্য একরকম সাবলম্বন ভ্রান্তি আছে, যাহা ইহা অপেক্ষা জটিলতর। একটি সরল যষ্টি জলপূর্ণ চৌবাচ্চায় অংশতঃ ডুবাইয়া রাখিলে, উহা বক্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়; একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বস্তুতঃ তখন যষ্টির আকারে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। এই বক্র ইন্দ্রিয়োপাত্তটি যে লাঠি-

পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। লাঠিটার দিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন রঙের চশমার ভিতর দিয়া তাকাইলে, বিবিধ বর্ণ ও আকারের যে-সব ইন্দ্রিয়োপাত্ত আমাদের গোচরীভূত হয়, তাহাদের সহিত জলস্থ বক্রাকৃতিগুলিও ঐ লাঠিপরিবারের পোষ্য, দ্রষ্টা-ও সাধারণতঃ ইহারা যে কোন্ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তৎ-সম্বন্ধে প্রমাদগ্রস্ত হয় না। এর্থাৎ এইরূপ কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত দেখিয়া সাধারণতঃ কেহ মনে করে না যে, উহা যষ্টি নয়, কিন্তু সর্প বা রজ্জু। তবে, এই সব ভ্রমের ভ্রান্তিটা ঠিক কোথায়?

অধ্যাপক প্রাইস উপরি উক্ত প্রশ্নের যে-উত্তর দিয়াছেন, তাহা নিম্ন-লিখিতরূপ। একই ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় পরিবারের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন উপবর্গ থাকে; এবং উক্ত পরিবারের প্রত্যেকটা উপাত্ত উহাদের ভিতর কোন এক নির্দ্দিষ্ট উপবর্গে এক নির্দ্দিষ্ট স্থলে অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব ও দৃষ্টি-কোণ হইতে যষ্টিবিশেষের যে নানা আকৃতি দেখা যায়, সেগুলি এক বিশিষ্ট উপশ্রেণীর (sub-class) সৃষ্টি করে। উহাকে 'পরিপ্রেক্ষিতীয় শ্রেঢ়ী' (perspectival series) বলা যাউক। আবার এক এক রকম স্ফীতিযুক্ত এক এক রকম কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া ঐ যষ্টির যে-সব বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে, উহাদিগকে অপর এক উপবর্গে সাজান যায়; উহাকে 'বক্রভাবীয় শ্রেঢ়ী' (perspectival distortion and refraction series) নামে অভিহিত করিলে মন্দ শুনাইবে না। লাঠি পরিবারের অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত এতদনুরূপ কয়েকটি শ্রেঢ়ীতে বিন্যস্ত করা সম্ভবপর। আরপ্রত্যেক শ্রেঢ়ীতে এমন এক ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাওয়া যাইবে, যাহা বা যাহার কিয়দংশ অন্যান্য সকল শ্রেঢ়ীতেই বিদ্যমান। এই অংশগুলি একত্র করিয়া যে গোটা আকৃতিটি পাওয়া যাইবে, তাহা এই যষ্টিপরিবারের কেন্দ্রস্থানীয় চক্ষুরুপাত্ত। কেন্দ্রস্থলে পরিবারের খণ্ডপাত্তগুলিকে-ও জায়গা দিতে হইবে। একটা আধুলীর দিকে নানা-ভাবে তাকাইলে, যেসব আবর্ত্তুল আকৃতি দৃষ্ট হয়, সেগুলি আবর্ত্তুলতার ন্যূনতানুসারে পর পর সজ্জিত হইলে সর্ব্বশেষে একটা পূর্ণাবয়ব বৃত্ত পরিলক্ষিত হইবে। আবার নানারকম স্ফীতিযুক্ত বিভিন্ন কাচখণ্ডে আধুলীর যে সব অদ্ভুত আকার দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলিকে স্ফীতির ন্যূনতানুসারে পর পর সাজাইলে, ঐ পূর্ণাবয়ব বৃত্তটাতেই উপনীত হওয়া যায়, সুতরাং এই বৃত্তাকারটা আধুলী পরিবারের কেন্দ্রীয় চক্ষুরুপাত্ত। স্থূলতঃ, সাদাচোখে দৃষ্ট ও খালিহাতে স্পৃষ্ট যে সব উপাত্ত এক স্থলে সমাবিষ্ট বলিয়া অবধারিত হয়, সেগুলিই পরিবারের কেন্দ্রস্থানীয়।

সত্যত্বের মাপকাঠিতে দেখিতে গেলে, যে-কোন পরিবারের প্রত্যেক উপবর্গ এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়োপাত্তের মূল্য সমান। কিন্তু জীবনধারণের জন্য পরিপ্রেক্ষিতীয় শ্রেঢ়ীর মূল্য বেশী; তন্মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় উপাত্ত সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। তাই, দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে ও বিজ্ঞানে উহারা বস্তুর আসল-স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয়। জীবনধারণের জন্য আমাদের ভিতর যে স্বাভাবিক অন্তঃপ্রেরণা আছে, তাহার প্রভাবে আমরা উপলব্ধ যে-কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তকেই তাহার পরিবারের কেন্দ্রস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে সাধারণতঃ উন্মুখ থাকি। জলে-ডুবান যষ্টির প্রত্যক্ষে, আমরা ঠিক কি ব্যাপারে ভুল করি, এখন তাহা সহজে বুঝা যাইবে। যষ্টির বঙ্কিম আকৃতিটি যে বক্রীভাবীয় শ্রেঢ়ীর কোন অকেন্দ্রীয় স্থলে বিদ্যমান, তাহা আশা করি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি রশ্মির বক্রীভবনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু জানে না, সে পূর্ব্বোক্ত উন্মুখতার বশে স্বভাবতঃ ভাবিবে যে, চৌবাচ্চার লাঠিটা মাঝখানে বাঁকা, কিংবা দৃষ্ট বক্রাকারের গায়ে হাত চালাইলে স্পর্শদ্বারা গতির দিক্ পরিবর্ত্তন অনুভূত হইবে, অথবা লাঠিখানা জল হইতে তুলিয়া লইলে-ও তাহার কটিদেশের বক্রতা পূর্ব্ববৎ দৃক্-গোচর হইতে থাকিবে। পারিভাষিক শব্দে বলা যায়, বক্রাকারটা ঐ ব্যক্তির নিকট যষ্টির স্ব-স্বরূপ কিংবা যষ্টিপরিবারান্তর্গত পরিপ্রেক্ষিতীয় শ্রেঢ়ীর কেন্দ্রীয় উপাত্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়োপাত্তটা স্বীয় পরিবারের কোন্ শ্রেঢ়ীতে ঠিক কোন্ জায়গায় অবস্থিত, তৎসম্পর্কে জ্ঞাতার যে ধারণা বা বিশ্বাস, তাহাই এখানে ভ্রান্তিমূলক।

মোটের উপর, আমি যখন মনে করি যে, কোন বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন প্রথমতঃ রূপস্পর্শাদিযুক্ত কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে; তারপর আমার মনে বিশ্বাস জন্মে যে, উহা এবং অন্যান্য কতিপয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত একটি পারিবারিক যোগসূত্রে গ্রথিত এবং সেই পরিবারের কোন বিশিষ্ট উপবর্গে তাহার এক নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই বিশ্বাস যদি সত্য হয়, অর্থাৎ আমার ধারণানুযায়ী পরিবার এবং তাহাতে ঐ ইন্দ্রিয়োপাত্তের তদনুরূপ স্থান যদি বাস্তবিকই থাকিয়া থাকে, তবে আমার প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রমা, নহিলে উহা অপ্রমা। আর এই বিশ্বাস সত্য না অসত্য, তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ পরিচয়েই সম্ভবপর। কোন দৃশ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত যে স্পৃশ্য উপাত্তের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, সেই প্রত্যাশিত স্পৃশ্য উপাত্তটা বাস্তবিকই অনুভবের বিষয় হয় কিনা, তাহাত সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ দ্বারাই

অবধারিত হইতে পারে। অবশ্য ব্যবহারিক জীবনে, এই সব বস্তু-বিষয়ক বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত সময় ও অবসর আমাদের থাকে না; তা ছাড়া, কতক জায়গায় তাহা কার্য্যতঃ অসম্ভবও বটে। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, কার্য্যতঃ বহু (এবং তত্ত্বতঃ সর্ব্ব-) স্থলেই ইন্দ্রিয়োপাত্তবিষয়ক বিশ্বাসের সত্যতা কিংবা অসত্যতা সাক্ষাৎ-পরিচয় দ্বারা জানা সম্ভবপর।

অন্তর্নিরীক্ষণে (Introspection) জ্ঞানের প্রামাণ্য জানা দুষ্কর। কারণ, যতক্ষণ ভ্রান্তির নিরসন হয় না, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত জ্ঞাতা উহাকে প্রমা বলিয়াই গ্রহণ করে। যদিও কল্পনা এবং প্রত্যক্ষের পার্থক্য অন্তর্নিরীক্ষণে ধরা যায়, তবু কল্পনা যখন জ্ঞানের বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এই অন্তর্গম্য পার্থক্যদ্বারা ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া চিনিবার উপায় থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদী সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক্ করিবার যে-উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার জন্য কল্পনা ও প্রত্যক্ষের উক্ত অন্তর্জ্ঞেয় প্রভেদের কোন প্রয়োজন হয় না। অন্ধকারে যাহাকে ভূত মনে করিয়া ভয় পাই, তাহা বাস্তব কি অবাস্তব, সেকথা দৃষ্ট পদার্থটিকে স্পর্শ করিতে গেলেই, সাক্ষাৎভাবে বুঝিতে পারা যায়। বৈয়ক্তিক মনোবীক্ষণ হইতে সর্ব্বজনবেদ্য কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ পরিচয় যে সত্যমিথ্যা-নির্ণয়ের অনেক ভাল পন্থা, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবু ইহাতে বেশ কয়েকটি খুঁত রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বিশ্বাসের যাথার্থ্য যাচাই করার মানে কি? এক ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইবামাত্র আমরা আশা করি, ভিন্ন স্থান হইতে তৎসদৃশ অপর ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত পরিচিত হইব; এই প্রত্যাশিত উপাত্তের সাক্ষাৎ পরিচয়ই ত বিশ্বাসের পরীক্ষা, কিন্তু এই যে সাক্ষাৎ-পরিচয়, তাহার সম্বন্ধেও কি সত্যমিথ্যার কথা উঠে না? উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রত্যাশিত ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ জ্ঞান সংশয়ের উর্দ্ধে; তবে সেখানে যে-সন্দেহ উঠে, তাহার বিষয় উক্ত সাক্ষাৎজ্ঞান নহে, কিন্তু অপর এক বিশ্বাস। কিন্তু এক বিশ্বাস অন্য বিশ্বাস দ্বারা, আবার এই দ্বিতীয় বিশ্বাস তৃতীয় এক বিশ্বাস দ্বারা, সমর্থন করিতে গেলে, অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। বিশ্বাস জিনিষটা নিতান্তই মানসিক ব্যাপার। সত্য হোক মিথ্যা হোক, বিশ্বাসমাত্রেরই যে মানসিক সমর্থন সম্ভবপর, তাহাত আমাদের দৈনন্দিন অনুভবের বিষয়। তা ছাড়া, সত্যাসত্যপ্রতিপাদনের সবটাই যে একটা সুসংবদ্ধ ভ্রান্তিমাত্র নয়, তাহা কি কেহ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিতে পারে? স্বপ্নে, মস্তিষ্কবিকারে, মদের নেশায় এবং তৎসদৃশ

অন্যান্য বিকৃত ও অসুস্থ মানসিক অবস্থায় সুসংবদ্ধ ভ্রান্তির বহু উদাহরণ অহরহ দেখা যায়। অবশ্য সুস্থাবস্থায়, জ্ঞাতা বুঝিতে পারে যে, এই সব ভ্রান্তি পূর্ণভাবে সুসংবদ্ধ নয়। কিন্তু ভ্রমের সময়, একথা তাহার নিকট একেবারেই অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং বিশ্বাসের সমর্থন যে বাস্তবিকই যুক্তিসঙ্গত, তাহা অন্তর্মিরীক্ষণের সাহায্যেই আমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ সত্যমিথ্যানিরূপণের এই আলোচ্য প্রণালীটী অন্তর্নিরীক্ষণের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ করিতে অসমর্থ। জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানব্যতীত নির্ণয় করা অসম্ভব; অথচ যে-কোন বাহ্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই সংশয়ার্হ অবশ্য, সত্যমিথ্যা-সম্পর্কিত সর্ব্ব মতবাদের বিরুদ্ধেই এই সমালোচনা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এক হিসাবে, ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদীর উপরই এই সমালোচনা বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। কারণ, তিনি দাবী করেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ 'পরিচয়ে' তিনি পাষাণ হইতে সুদৃঢ় এক সন্দেহাতীত সত্তার আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাঁহার মতে, বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষরূপ মানসিক ব্যাপারটী 'সাক্ষাৎপরিচয়' এবং 'বিশ্বাস', এই দুইটী পৃথক্ ও প্রায় সমসাময়িক মনোবৃত্তির সমষ্টি। কিন্তু অন্তর্নিরীক্ষণে, এই বিশ্লেষণ যথার্থ বলিয়া মনে হয় কি? জ্ঞাতার নিকট প্রত্যক্ষ নামক মনোব্যাপার একটা গোটা অনুভবের আকারেই প্রতীত হয়। আর যদি ধরিয়া লও, উহাতে উক্ত উপাদানদ্বয় রহিয়াছে, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, উহারা এমনি ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, ফলে একটী অখণ্ডরূপে প্রতীয়মান এবং উক্ত উপাদানদ্বয় হইতে পৃথক্ নূতন অনুভবের সৃষ্টি হইয়াছে।

তর্কের খাতিরে মানা যাউক যে, এই বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত অর্থাৎ ভ্রমপ্রত্যক্ষে, কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবার পর, তৎসম্বন্ধে একটী ভ্রান্তবিশ্বাস গৃহীত হয়। তবু স্বীকার করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়োপাত্তটি অন্ততঃ আংশিকভাবে সেই ভ্রান্তবিশ্বাসের জন্মদাতা ও পরিপোষক। প্রত্যক্ষে, জ্ঞাতা তাহার ইচ্ছামত যে-কোন বিশ্বাসই যে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা নহে। স্বানুভবের কাছে, ইন্দ্রিয়োপাত্তটি সম্পূর্ণ মূক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; বরং উহা যেন জোরে বলিতে থাকে, আমার সম্বন্ধে অমুক বিশ্বাসটিই গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। সুতরাং ভ্রমপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয়োপাত্ত নিজেই প্রতারক ও মিথ্যা-উহাকে সত্যমিথ্যার ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া ঠিক নয়। অস্পষ্টতা-নিবন্ধন, কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী একাধিক বিশ্বাস মাথা তুলিতে

চাহিলে, অনেক সময়, জ্ঞাতা উহাদের ভিতর একটীকে স্বেচ্ছায় বাছিয়া লয় বটে ; কিন্তু এরূপস্থলে, বিশ্বাসটি যদি পরে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা আশ্চর্য্যে একেবারে হতভম্ব হইয়া যায় না, কারণ সে ভুলিতে পারে না যে, এই ভ্রমের জন্য সে নিজেই দায়ী। কিন্তু প্রত্যক্ষের বেলায় জ্ঞাতা এরকম কোন স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইতে পারে না, তাই বিভ্রান্ত প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি ধরা পড়িলে, আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই ; মনে হয়, যেন হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় এক মায়াময় জগৎ হইতে মাটীর পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হইলাম। ভ্রান্তি দূর হইবার পরেও মনে হইতে থাকে, ভ্রান্তিকালীন উপাত্তটিই মিথ্যা পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঠকাইয়াছিল।

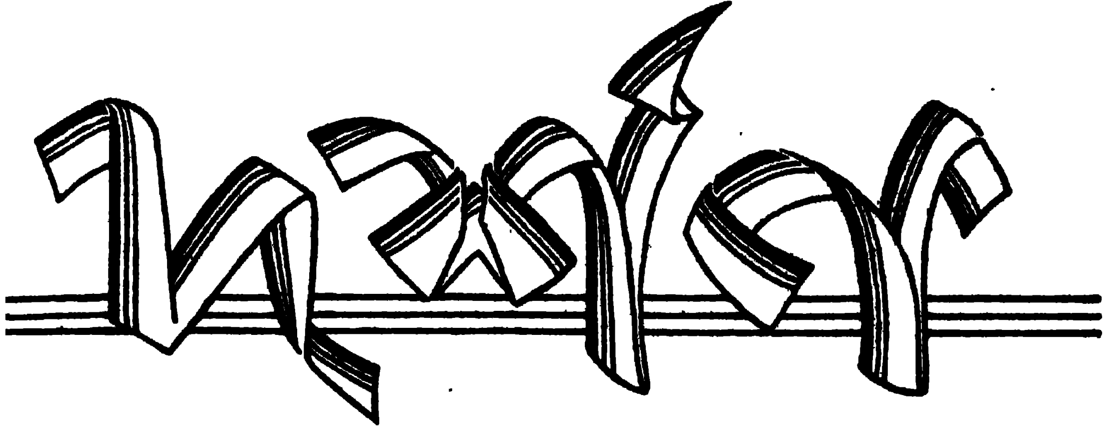
প্রত্যক্ষে, বিশ্বাস-জাতীয় জ্ঞানাতিরিক্ত কোন মনোব্যাপার থাকিলে, তাহা জ্ঞাতার নিরঙ্কুশ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না ; বরং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত, তাহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর যদি মানিয়াও লই যে, বিশ্বাসের উৎপাদনে ইন্দ্রিয়োপাত্তের কোন হাত নাই, তাহা হইলে বোধ হয় স্বীকৃত হইবে যে, জ্ঞাতার অজ্ঞাত-সারে তাহার কোন দুর্দম্য আকাঙ্ক্ষা, আশা, ভীতি, চিরাভ্যস্ত কোন চিন্তাপ্রণালী, অথবা তৎসম মানসিকব্যাপার তাহাকে সেরকম বিশ্বাসগ্রহণ করিবার জন্য প্রণোদিত করে। এখন আমরা বলিতে চাই, এইসব বিশ্বাসোৎপাদক মনোবৃত্তি শুধু একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উপরন্তু সেই বিশ্বাসানুযায়ী একটি ইন্দ্রিয়োপাত্তও নির্ম্মাণ করে। ইন্দ্রিয়োপাত্তের এবং-বিধ নির্ম্মিতি ও পরিবর্ত্তন যে সম্ভবপর, তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতে স্পষ্ট হইবে। অধ্যাপক ব্রড লিখিয়াছেন, "আমি যদি কিয়ৎক্ষণ একটা সিঁড়ির ছবির দিকে চাহিয়া থাকি তাহা হইলে হঠাৎ সিঁড়ির দৃশ্যখানা, যেন কলের টিপে, দালানের কার্ণিসে রূপান্তরিত হইয়া যায়। কার্ণিস্ কিংবা সিঁড়ি, ইহাদের ভিতর যাহার কল্পনায় মনোযোগ নিবদ্ধ করা যায়, বিশেষতঃ ঐ দিকেই পরিবর্ত্তন ঘটিতে চাহে।" [সায়ন্টিফিক্ থট্। পৃঃ ২৬০]। অর্থাৎ খেয়ালমত এক বিশ্বাসের জায়গায় অপর বিশ্বাস প্রবর্ত্তন করিলে, ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপটাও বদলাইয়া যায়। আর বিশ্বাস যেখানে জ্ঞাতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর আদৌ নির্ভর করে না, সেখানে ভ্রমপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয়োপাত্তটি যে তন্নিরাসক প্রমাজ্ঞানের ইন্দ্রিয়োপাত্ত-হইতে পৃথক, তাহা ত একেবারে পরিস্ফুট। কাগজের ফুলকে যখন বাগানের বলিয়া ভুল করি, তখন উহাতে কাগজের লেশমাত্রও মালুম হয় না ; বরং উহার প্রত্যেকটি পাঁপড়ির সুন্দর রং ও

মনোহর বিন্যাস, এমন কি, উহাদের কোমলতাটি পর্য্যন্ত একান্তভাবে স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু সেই ইন্দ্রজালের মোহ কাটীয়া যায়, তখন কোথায় সেই অকৃত্রিম কমনীয়তা ও অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা! তখন সমগ্র ইন্দ্রিয়োপাত্তটীই যেন একটা কাগজীয় পরিণামের প্রভাব অনুভব করে। মনোবৈজ্ঞানিক জেমস তাঁহার এক ভ্রান্তির বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "একদিন, অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়া বই পড়িতেছি; হঠাৎ একটা জোরাল আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, উহা উপরতলা হইতে আসিতেছে; ঐ শব্দে যেন আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। উহা মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া আবার সুরু হইল। স্পষ্ট শুনিবার জন্য উপরে বৈঠকখানায় গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে উহা থামিয়া গিয়াছে। নীচে আসিয়া যেই চেয়ারে বসিয়াছি, অমনি আবার শুনিতে পাই, কি একটা শব্দ আকাশের সকল দিক হইতে তীব্রবেগে ধাইয়া আসিতেছে,—কি তার শক্তি, সে কি গভীর ও ভীতিজনক—যেন বন্যার জল ফুলিয়া উঠিতেছে, অথবা ভীষণ ঝটীকার অগ্রদূত তাহার আগমনবার্ত্তা বহিয়া আনিতেছে। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া আবার উপরে গেলাম, কিন্তু কি অদ্ভুত! আওয়াজটী আবার বন্ধ হইয়া গেল! দ্বিতীয়বার নীচে আসিয়া দেখি, মেজের উপরে স্কট্ল্যাণ্ডীয় টেরিয়ার কুকুরটা পড়িয়া ঘুমাইতেছে আর আমার আকর্ণিত সেই বিভীষণ শব্দ তাহারই শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে নিঃসৃত! বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আওয়াজটী কয়েক মুহূর্ত্ত আগে ঠিক যেরকম বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, চিনিবার পর সেরকমটী আর শুনা গেল না; মানিতে বাধ্য হইলাম, বর্ত্তমান শব্দটী পূর্ব্বানুভূত শব্দ হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ।" [সাইকলজি ; ব্রীফার কোর্স পৃঃ ৩২৪]

উপরিবর্ণিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যায়, সর্প কিংবা রজ্জুসদৃশ বাহ্যবস্তুর ইন্দ্রিয়োপলব্ধিতে আমরা যে প্রথমে বস্তু-গন্ধ-শূন্য কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংস্পর্শে আসিয়া, তারপর উহাকে সর্প বা রজ্জু বলিয়া ব্যাখ্যা করি, একথা সত্য নয়। বরং ইন্দ্রিয়োপলব্ধির গোড়া হইতেই রজ্জ্বাকার কিংবা সর্পাকার প্রতীতি বিদ্যমান। অবশ্য, ইন্দ্রিয়োপাত্তটী অত্যন্ত অস্পষ্ট ও নিষ্প্রকারক হইলে, উহা ঠিক কোন্ বাহ্যবস্তুর অংশ, তাহা বিচারান্তেই নির্দ্ধারিত হয়। তথাপি এই সব স্থলে, ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রথমোপলব্ধ আকারটী বিচারের ফলে আমাদের চোখের সম্মুখেই কিয়ৎ পরিমাণে স্পষ্টতর ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদীর মতে, বাহ্য প্রত্যক্ষের তিন উপাদান, যথা (১) বিষয় বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত, (২) তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় এবং (৩)

তৎসম্পর্কিত একটা বিশ্বাস; তন্মধ্যে সত্যমিথ্যার কারবার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত এবং তাহার-পরিচয় ক্ষেত্রে নহে। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এই বিশ্লেষণ অযথার্থ; তা ছাড়া, ইহাকে যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ভ্রমপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয়োপাত্তটিকেও মিথ্যাত্ব-দোষে দুষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।



(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

দ্বিতীয় সংখ্যা] **মাঘ** [সন ১৩৪৮ সাল

সম্পাদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ, পি-এচ্. ডি

মাঘ সংখ্যা

২য় সংখ্যা দর্শন মাঘ, ১৩৪৮ সাল

ব্র্যাড্‌লের অদ্বৈতবাদ

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরী, এম, এ

[মিষ্টার এফ্‌. এচ্‌. ব্র্যাড্‌লে একজন খ্যাতনামা ইংরাজ দার্শনিক। তিনি দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাণ্ড রিয়ালিটি,' প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব্‌ লজিক,' 'এথিক্যাল্‌ ষ্টাডিস' এবং 'এসেজ্‌ অন্‌ টুথ অ্যাণ্ড রিয়ালিটি' নামক পুস্তকগুলি দার্শনিক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। সাধারণভাবে তিনি হেগেলপন্থী বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতবাদ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন এবং কতকাংশে অদ্বৈতবেদান্তের অনুরূপ। এই প্রবন্ধে তাহার স্থূল পরিচয় পাওয়া যাইবে।—সম্পাদক]

ইন্দ্রিয়-অনুভূতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয় তখন তাহার জ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে এক অদ্বৈত, অখণ্ড অবিভাজ্য সত্য। সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তা যেমন বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যের পশ্চাতে এক অদ্বিতীয় অনন্ত তত্ত্বের সন্ধান দেয়, সুগভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারাও লাভ হয় সেই অদ্বৈত সত্যেরই অভ্রান্ত সাক্ষাৎ পরিচয়। দার্শনিক চিন্তাধারার স্বাভাবিক গতিই হইল 'বহু'কে 'একে'র মধ্যে, বৈচিত্র্যকে অনন্ত সত্তার মধ্যে তুলিয়া ধরা, এবং আবার সেই অনন্ত এক হইতে অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমাভিব্যক্তির একটা সুসম্বদ্ধ বিবরণ দেওয়া। যে পর্যন্ত দর্শন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌'কে সৃষ্টির আদি

এবং অনন্তরূপে প্রদর্শন করিতে না পারে সে পর্য্যন্ত তাহা স্থির ও নিশ্চিন্ত-ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মতবাদ হইতে এই কথাই নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও আরিষ্টটল্‌এর নিকট চরম সত্যের এই অনন্ত রূপই প্রতিভাত হইয়াছিল, প্লেটো তাহার নাম দিলেন শিব-সত্তা (Idea of the Good), আর আরিষ্টটল্ উহাকে বলিলেন অচল বিশ্বপরিচালক (Unmoved Mover of the world)। স্পিনোজার অদ্বিতীয় অসীম দ্রব্য (One Infinite Substance) এবং হেগেলের স্বীকৃত পরমাত্মা (Absolute Spirit) "একম্ সৎ" এরই মহিমা প্রচার করে। আমাদের দেশের শঙ্কর ও রামানুজের চিন্তাধারাও "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"কেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার বিপুল প্রয়াস। আধুনিক যুগে গ্রীন্, ব্র্যাড্‌লে, রয়িস্, ক্রোচে, জেনটিলে, বার্গ্‌সেঁা, এমন কি বস্তুতন্ত্রবাদী আলেকজাণ্ডার পর্যন্ত পরমতত্ত্বকে এক ও অদ্বিতীয় রূপেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা যে অনন্ত সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, দার্শনিক চিন্তা তাহাকেই বুদ্ধির নিকট স্বচ্ছ ও পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করে। ব্র্যাড্‌লের দর্শন সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে অস্পষ্ট অপরোক্ষানুভূতির ভিত্তিতেও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সত্যকে প্রতিভাত করিবার ইহা একটা বিরাট চেষ্টা। ব্র্যাড্‌লের দর্শনে অদ্বৈতবাদ তর্কবুদ্ধির সহায়ে ঠিক কিভাবে বিকাশলাভ করিয়া কি রূপ ও পরিণতি লাভ করিয়াছে, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দর্শনের উদ্দেশ্য সৃষ্টির চরম রহস্য ভেদ করা। এবং পরম সত্যের শাশ্বত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। কিন্তু সত্য নির্ণয় করিবার উপায় কি? সত্য যখন আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে তখন তাহাকে কোন চিহ্ন দ্বারা চিনিয়া লইব, কোন দিশারীর অভ্রান্ত নির্দেশে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া সত্যকে পরমশ্রদ্ধাভরে বরণ করিতে সমর্থ হইব? ব্র্যাড্‌লে বলেন যে দর্শনের দিক হইতে বুদ্ধিই আমাদের সত্যানুসন্ধানের দিশারী; কোন বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আমাদের বিচারমূলক চিন্তাধারা যখন একটা স্বচ্ছন্দ পরিতৃপ্তি লাভ করে তখনই বুঝিব যে আমরা সত্যের সন্ধান পাইতেছি। এখন প্রশ্ন হইল কিসের দ্বারা আমাদের বিচারমূলক

চিন্তা স্থির পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে? ব্র্যাড্‌লের মতে আমাদের চিন্তারাশি তখনই পূর্ণশান্তি লাভ করে যখন আমরা আবিষ্কার করি অন্তর্বিরোধশূন্য সামঞ্জস্য বা আত্মসঙ্গতি। সুতরাং এই আত্মসঙ্গতিই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ। যেখানেই আমরা লক্ষ্য করি আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য বা আত্ম-অসঙ্গতি সেখানেই আমাদের বুদ্ধি অসত্যের স্পর্শে যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, মিথ্যার কৃষ্ণচ্ছায়া আমাদের চিন্তাকে সুসমঞ্জস সত্যের আলোকের জন্য অধীর করিয়া তোলে। কিন্তু এই আত্মসঙ্গতি (Self-coherence) কথাটা তর্কশাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ অর্থে নিলে চলিবে না। কোন কোন তর্কশাস্ত্রের মতে আমাদের কোন ধারনা অসত্য হইয়াও আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন হইতে পারে, যেমন, আকাশকুসুমের বা সুবর্ণময় পর্বতের কল্পনা মিথ্যা কিন্তু তবু অন্তর্বিরোধশূন্য। ব্রাড্‌লে আত্মসঙ্গতি কথাটা গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বব্যাপকতা (all-comprehensiveness or extension) আত্ম-সঙ্গতিরই অপর এক অবিচ্ছেদ্য দিক। পূর্ণ আত্মসঙ্গতি যাহার আছে তাহাকে সর্বব্যাপক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় হইতে হইবে, কারণ খণ্ডের ও ক্ষুদ্রের পক্ষে অন্তর্বিরোধশূন্য হওয়া অসম্ভব। সঙ্কীর্ণ, ও সীমাবদ্ধ যাহা তাহাই অভ্যান্তরীণ বিরোধদুষ্ট। নিম্নলিখিত যুক্তিদ্বারা ইহা বোধগম্য করা যাইতে পারে। ধরুন ক একটি খণ্ড বস্তু; ইহা ছাড়া আর অন্ততঃ একটী পদার্থ নিশ্চয়ই থাকিবে, যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে খ। এখন ক-র স্বতন্ত্র রূপটী বুঝিতে হইলে খ-র সহিত উহার তুলনা করা ও সম্বন্ধ স্থাপন করা দরকার; খ-র সহিত ক-র সাদৃশ্য কোথায়, পার্থক্যই বা কি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াই শুধু ক-র স্বতন্ত্র-রূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ক-র প্রকৃতি বা বিশেষ রূপ (nature or distinctive character) ক-র নিজস্ব সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, উহা ক-র সসীম সত্তার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া খ-র সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যদিও ক-র প্রকৃতি তাহার অস্তিত্বের সীমানা অতিক্রম করিয়া একটা ব্যাপকতা লাভ করিতেছে এবং খ-কেও আলিঙ্গন করিতেছে, অস্তিত্বের দিক হইতে কিন্তু 'ক' 'খ'-কে বাদ দিয়া একটা সঙ্কীর্ণতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। 'ক'-র মধ্যে সত্তার (existence) ও স্বরূপের (nature) এই যে বিরোধ,

অস্তিত্বের ও ধর্মের এই যে বিরোধ তা' 'ক'-র সসীমতারই অপরিহার্য ফল; সুতরাং 'ক'-র সসীমতাই "ক'-কে অন্তর্বিরোধদুষ্ট করিয়া অসত্য' প্রমাণিত করিতেছে। অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখানো যাইতে পারে যে সসীম 'খ' ও পারমার্থিক সত্তার অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে পরম সত্য যাহা তাহা হইবে পূর্ণ আত্ম-সঙ্গতিসম্পন্ন, সর্বব্যাপক, এক ও অদ্বিতীয় (One unitary all-comprehensive, perfectly self-coherent whole)। কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠিবে, এই সর্বব্যাপক অদ্বিতীয় পারমার্থিক সত্তা কোন্ উপাদানে গঠিত, এবং জীব ও জগতের সঙ্গে উহার প্রকৃত সম্বন্ধটিই বা কি? অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাণ্ড রিয়ালিটি (Appearance and Reality) নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগে (যাহা অ্যাপিয়ারেন্স নামে অভিহিত) ব্র্যাড্‌লে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান-লব্ধ বিভিন্ন বিষয়-বস্তু (objects of experience) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের দ্বারা উহাদের প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল ব্যাপক ও অপরিহার্য বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাহায্যে আমরা জগতকে বুঝিবার চেষ্টা করি এবং আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি গড়িয়া তুলি উহাদের প্রত্যেকটিকে ব্র্যাড্‌লের ক্ষুরধার বিশ্লেষনের নিকট উহার তাত্ত্বিক মূল্যের পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণ গুণাবলী, দ্রব্য ও গুণ, দেশ ও কাল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, অহং, আত্মা প্রভৃতির প্রত্যয়নিচয়কে ব্র্যাড্‌লে খুব সুনিপুনভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সর্বত্রই তিনি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ইহাদের কোনটিই আমাদিগকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে না,—মিথ্যার ও অনৃতের দ্যোতক ইহারা সকলে। নানাভাবে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া ব্র্যাড্‌লে সমস্ত পদার্থের ও সমস্ত বুদ্ধি প্রত্যয়ের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে শুধু দুই একটা মূল যুক্তির আলোচনা দ্বারা ব্র্যাড্‌লের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীটি বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা যখন কোন জিনিষকে গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বলিয়া অথবা দেশকালে অবস্থিত পদার্থ বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি তখন আমরা জিনিষটাকে বুঝিতে চাই নানারূপ সম্বন্ধ ও পার্থক্যের মধ্য দিয়া, বহুকে একের মধ্যে, সংগ্রথিত করিয়া। যে কোন বস্তু সম্বন্ধে আমরা দেখি

যে উহাতে একাধিক গুণের সমাবেশ হইয়াছে। ঐ গুণাবলীর সংহতিকেই আমরা বস্তুর প্রকৃতি বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকি। এখন প্রশ্ন হইল, কি ভাবে কোন্ তত্ত্বের দ্বারা ঐ গুণসমূহ সংহত বা একত্রীভূত হইতেছে? এ বিষয়ে সাধারণ ধারণা হইল যে, গুণাশ্রয় কোন দ্রব্যবিশেষের মধ্যে গুণসমুদায় সংহত বা সংগ্রথিত হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ গুণের অতিরিক্ত কোন কিছুই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যদিও গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়া কোন তত্ত্ব আমরা স্বীকার করিয়া লই, তখন উহার একত্রীকরণ ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে, অর্থাৎ ঐ দ্রব্য কতদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। যেহেতু দ্রব্য গুণাবলী হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং দ্রব্যও বহুর পাশে একটি বৃহত্তর বহুর অংশবিশেষ হইয়া পড়িল না কি? অখণ্ডত্ব পাইতে হইলে দ্রব্য ও গুণাবলীকে একত্রে সংগ্রথিত বা একত্রীভূত করিতে পারে এমন আর একটি তত্ত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না কি? কিন্তু এ পথে অগ্রসর হইলে অনবস্থা (infinite regress) দোষের উদ্ভব হয়; তত্ত্বের পর তত্ত্ব স্বীকার করিয়া একীকরণ আর হইয়া উঠে না। যদি বলা হয় যে দ্রব্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, গুণসমূহ নিজেরাই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বস্তুসংহতি গড়িয়া তোলে, তখনও সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথমতঃ একাধিক গুণের সমষ্টিও একটি গুণ, এবং গুণমাত্রেরই একটি আধার বা আশ্রয় প্রয়োজন। গুণ কখনো আধার ব্যতীত আত্মনির্ভরশীল হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। যদি বলা হয় এককভাবে না হইলেও সমষ্টিরূপে গুণাবলী আত্মনির্ভরশীল তখন সেই সংহত গুণসমষ্টির অন্তরে একটি সংযোগ বা মিলনসূত্র স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয়; অথচ এই মিলনসূত্রটির স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলেই আবার জটিলতার উদ্ভব হইতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যদিও একের মধ্যে বহু সর্বত্রই সংগ্রথিত ও সংহত তবু বুদ্ধির নিকট এক ও বহুর এই সমন্বয়কে আমরা কিছুতেই বোধগম্য করিতে পারি না। জগতকে বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে গিয়া প্রথমেই আমরা অনন্ত ভেদসৃষ্টি করিয়া বহুর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি; পরে নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বহুকে আবার একের সমন্বয়ে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু প্রকৃত সমন্বয়সূত্র বা একীকরণক্ষম তত্ত্বের কোন সন্ধান আমরা পাই না।

আমাদের জ্ঞানোন্মেষের প্রথম অবস্থা নির্বিকল্প জ্ঞান বা অনুভূতি (immediate experience), এই নির্বিকল্প জ্ঞানের মধ্যে অনন্ত বহুর একটা সমন্বয় হইয়াছে, অথচ সেখানে বহুর কোন বিশিষ্টরূপ নাই, সম্বন্ধ সম্বন্ধীয় ভেদ তখনো সৃষ্টি হয় নাই। ভেদাত্মক বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই নির্বিকল্প জ্ঞানের সেই সমন্বয় ভাঙ্গিয়া যায়, এবং বিশিষ্টরূপ নিয়া অনন্ত বৈচিত্র্য স্বতন্ত্রভাবে আমাদের সবিকল্প জ্ঞানের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু এই বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যকে এবং গুণবহুত্বকে বুদ্ধি আর অখণ্ড সমন্বয়ের মধ্যে সম্মিলিত করিতে পারে না। নানারূপ সম্বন্ধের সাহায্যে বুদ্ধি নির্বিকল্প জ্ঞানের লুপ্ত সমন্বয়কে ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু বুদ্ধিনির্মিত সমন্বয় ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও পারমার্থিক সত্যের কোন সন্ধান দেয় না। বুদ্ধি সমন্বয় করিতে চেষ্টা করে বহুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, কিন্তু সম্বন্ধ সম্বন্ধীয় যে ব্যবস্থা তাহা আভ্যন্তরীণ বিরোধে পরিপূর্ণ। ধরুন ক ও খ দুটি সম্বন্ধী যাহারা সম্বন্ধ ম-র দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এখন ক ও খ-কে যুক্ত করিতে হইলে ক ও খ উভয়ের সঙ্গেই পৃথগ্‌ভাবে ম-র সংযোগ বা সম্বন্ধ থাকা চাই। কিন্তু ক-র সঙ্গে ম-র সংযোগ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে $ম_1$ নামক আর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়; সেইরূপ খ-র সঙ্গে ম-র সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে $ম_2$ নামক আর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এরূপভাবে ক ও খ-র মিলনসূত্র বুঝিতে গিয়া আমাদিগকে ১টি, ২টি, ৪টি, ৮টি করিয়া অগণিত সম্বন্ধ টানিয়া আনিতে হইবে; ফলে ক ও খ-র ব্যবধান ক্রমশই বাড়িয়া গিয়া উহাদের মিলন রহস্য বুদ্ধির অনধিগম্য হইয়া পড়িবে। ক ও খ ইহাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরেও এই একই অনবস্থা দোষ পরিলক্ষিত হইবে। ক-র সম্বন্ধ ক-কে আশ্রয় করিয়াই সম্ভব, ক-কে বাদ দিয়া অবস্থান করিতে পারে না। এদিকে আবার ক-র সমগ্র প্রকৃতিটি বিভিন্ন সম্বন্ধের সমাবেশ হইতেই উদ্ভূত, সম্বন্ধকে বাদ দিয়া ক-র স্বরূপই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সম্বন্ধ সম্বন্ধীর মধ্যে আমরা পাইতেছি একটা চক্রক দোষ (vicious circle) আবরা বিভিন্ন সম্বন্ধের দরুণ ক-র প্রকৃতির মধ্যেও একটা বহুত্ব মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। নানাবিধ সম্বন্ধ হইতে ক-র মধ্যে বিভিন্ন গুণ উৎপন্ন হয়।

এই সম্বন্ধঘটিত গুণসকলের (relational qualities) সংহতিই ক-র প্রকৃতি, অথচ এই সংহতি বুদ্ধির অনধিগম্য।

হেগেল, গ্রীণ কেয়ার্ড প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন যে এক ও বহুর সমন্বয়ের একটি সুন্দর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। সেই দৃষ্টান্তস্থল হইতেছে আমাদেরই আত্মচেতনা। বিষয়-বিষয়ী স্বরূপ আত্মচেতন পুরুষের মধ্যে বহু একের দ্বারা অতি চমৎকারভাবে বিধৃত হইতেছে এবং সেই একই বহুর মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। আমরা যখন আমাদের নিজেদের বিভিন্ন ভাবরাশি সম্বন্ধে সচেতন হই তখন সেই ভাবসমূহের বহুত্ব ও বিশিষ্টরূপ নষ্ট হয় না, যদিও উহারা আমাদের অখণ্ড সত্তার সহিত এক ও অভিন্ন। বহু কি করিয়া বহুত্ব বজায় রাখিয়াও এক অখণ্ড মিলনসূত্রে বিধৃত ও সংগ্রথিত হইতে পারে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আত্মচেতন পুরুষের জীবন। ব্র্যাড্‌লে আত্মচেতনার এই গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রকৃতি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়াই একের সহিত বিচিত্ররূপবিশিষ্ট বহুর সম্মিলন মাত্রকেই তিনি আত্মবিরোধদুষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু হেগেল-পন্থীদের এই যুক্তি ব্র্যাড্‌লের নিকট শূন্যগর্ভ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের আলোকে আত্মচেতনার মধ্যেও নানারূপ অন্তর্বিরোধ প্রকট হইয়া উঠে। এখানে ঐরূপ একটি মাত্র স্ববিরোধের উল্লেখ করাই যথেষ্ট হইবে। আত্মচেতনার মধ্যে একটা বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা ভেদ আছে। বিষয়কে বিষয় হিসাবে বুঝিতে হইলে বিষয়ী হইতে উহার ভেদ এবং বিষয়ীর সহিত উহার সম্বন্ধ জানা দরকার। কিন্তু বিষয়ীকে বিষয়বৎ জানিতে না পারিলে এইরূপ ভেদ ও সম্বন্ধজ্ঞান অসম্ভব; অথচ যে মুহূর্ত্তে বিষয়ীকে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের একটি অন্তরূপে জানা গেল, সে মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ী বিষয়ে পরিণত হইল, এবং প্রকৃত 'বিষয়ী' এই বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধের অতীতে সর্ব্ব সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আবার সেই বিষয়ীকেও তাহার স্বরূপে বুঝিবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পরিস্থিতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধযুক্ত আত্মচেতনা আত্মবিরোধপূর্ণ। সুতরাং আত্মচেতনাকেও এক ও বহুর সমন্বয়কারক তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা চলে না। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে

সবিকল্পজ্ঞান ও বিষয়-বিষয়ীর ভেদ নির্বিকল্প অনুভূতি হইতেই বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু নির্বিকল্প অনুভূতির যে অখণ্ডত্ব ও একত্ব একবার বিলুপ্ত হইয়াছে বুদ্ধি সহস্র সম্বন্ধের দ্বারা ও নিজের চেষ্টায় আর সেই অখণ্ডত্ব ফিরাইয়া আনিতে পারে না। বিকল্পাত্মক আত্ম-চেতনা ব্যাপক নির্বিকল্পজ্ঞানের অসম্পূর্ণ ও স্ববিরোধদুষ্ট অথচ অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও অভিব্যক্তি।

বস্তু, ব্যক্তি, দেশকাল প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক অংশ সম্বন্ধেই—দ্রব্য ও গুণ, কার্য্য ও কারণ প্রভৃতি প্রত্যেক মূল প্রত্যয় সম্বন্ধেই—ব্র্যাড্‌লে বহু যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে সম্বন্ধাত্মক বলিয়া তাহারা অন্তর্বিরোধপূর্ণ এবং সেই কারণে মিথ্যা। আমাদের সবিকল্পজ্ঞানের কোন বিষয়বস্তুকেই আমরা পারমার্থিক সত্তার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা, কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে পারমার্থিক সত্তা সুসমঞ্জস ও আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন। কিন্তু মিথ্যা হইলেও অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তার অধিকারী না হইলেও পরিদৃশ্যমান জগৎ নিছক অভাবাত্মক বা শূন্যগর্ভ হইতে পারে না, কারণ উহা আমাদের অনুভূতি ও জ্ঞানের বিষয়বস্তু। সুতরাং ভাবাত্মক অথচ মিথ্যা এই জগতের যথার্থ স্থান কোথায়? পারমার্থিক সত্তা এক ব্রহ্মের বাহিরে ইহা পড়িতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত; অথচ ব্রহ্মের অন্তরেই বা মিথ্যার স্থান হয় কিরূপে? ব্রহ্মের অন্তর্গত হইলে জগতের মিথ্যাত্ব ব্রহ্মকেও স্পর্শ করিতে বাধ্য নয় কি? ব্র্যাড্‌লে বলেন যে জগতের বিভিন্ন অন্তর্বিরোধপূর্ণ অংশ ব্রহ্মের মধ্যেই রূপান্তরিত অবস্থায় অবস্থান করে এবং উহাদের উপাদানেই ব্রহ্ম বস্তুতঃ গঠিত। আমাদের অনুভূতির এক অংশকে যখন আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করি তখনই উহাতে স্ববিরোধ দেখা দেয় এবং মিথ্যারূপে উহা প্রতিভাত হয়। কিন্তু অনন্ত মিথ্যারাজি যখন ব্রহ্মের মধ্যে সম্মিলিত হয় তখন একের আভ্যন্তরীণ গলদ অপরের সংস্পর্শে বিদূরিত হয় এবং পারস্পরিক অন্তর্প্রবেশ-জনিত এক অভাবনীয় রূপান্তরের ফলে সবিকল্পজ্ঞানের মিথ্যা বিষয়সমূহ পরম সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হয়। এই রূপান্তর ও পরিণতি কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা বুদ্ধির দ্বারা আমরা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু তবুও ইহাই চরম সত্য; কারণ দার্শনিক বিচার এই সিদ্ধান্তেই

আমাদিগকে নিঃসংশয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। সঙ্গতির মধ্যে অসঙ্গতির রূপান্তর যে সম্ভব তাহার প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ হইতেই লাভ করি। আমাদের দেহের কোন অংশবিশেষের যন্ত্রণা আমাদের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ বা আনন্দবোধের মধ্যে রূপান্তরিত হয়; অথবা কোন যন্ত্রমধ্যস্থ অংশসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষ সমগ্র যন্ত্রটির সুসমঞ্জস ও সুসম্বদ্ধ কার্য্য-পদ্ধতিরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং বিরোধ ও সংঘর্ষ কিরূপে একটা ব্যাপক সমন্বয়ের অংশ হইতে পারে আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আবার ব্রহ্মের মধ্যে মিথ্যার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, কারণ ভাবাত্মক (positive entity) মিথ্যাও ব্রহ্মের বাহিরে পড়িতে পারে না, এবং ব্রহ্ম আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন বলিয়া ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থানকালে মিথ্যার অসঙ্গতি বিলুপ্ত না হইয়া পারে না। সুতরাং যাহা সম্ভবও বটে এবং অবশ্যম্ভাবীও বটে, তাহা বস্তুতঃ সত্য না হইয়া পারে না। (What must be and also may be surely is).

এবার ব্রহ্ম (Absolute) সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন বিকল্পাতীত পুরুষ। আমাদের জ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তু, সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া অন্তর্বিরোধমুক্ত এক মহাসমন্বয়ে বিধৃত হইতেছে। ব্রহ্মকে পুরুষ (Experience or spirit) বলিব এইজন্য যে অনুভূতি বা চেতনাই Absoluteএর স্বরূপ যদিও সেই অনুভূতি অপরোক্ষ এবং সেই চেতনা বিকল্পাতীত। অনুভূতি বা চেতনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত কোন সত্তা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি সে সমস্তই অপরোক্ষানুভূতি হইতে বুদ্ধির ক্রিয়াদ্বারা উদ্ভূত হইয়া একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সকল বুদ্ধি নির্মিত দৃশ্যবান বস্তুদ্বারাই ব্রহ্ম গঠিত, এবং ইহাদের রূপান্তরের ফলে যে অখণ্ড অনির্ব্বচনীয়, বুদ্ধির অনধিগম্য, অনুপম চেতনার উৎপত্তি তাহাই ব্রহ্মের পরম সম্পদ। ব্রহ্মকে শুধু পরম জ্ঞান (Absolute knowledge or Thought) অথবা পরা শক্তি (Absolute Will or Power) অথবা পরম প্রেম বা আনন্দ (Absolute Love or Bliss) বলিয়া নির্দ্দেশ করা ব্র্যাড্‌লের মতে অযৌক্তিক। আবার এ কথা বলাও যুক্তিবিরুদ্ধ যে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম এই তিনই ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি অবিকৃত দিক। কারণ

ইহারা সকলেই ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্গত হইলেও ব্রহ্মের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া ন্যূনাধিক রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাদের রূপান্তরজনিত যে অনির্ব্বচনীয় অবস্থা তাহাই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মের মধ্যে জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ এই সমস্তই বিদ্যমান থাকিলেও ইহাদের কোনটির মধ্যে পৃথগ্-ভাবে অথবা ইহাদের সকলের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ নহেন।

এবার ব্রহ্মের সহিত আমাদের জীবনের তিনটি সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, সত্য, শিব ও সুন্দরের (Truth, Goodness and Beauty) সম্বন্ধ নির্ণয় করা দরকার। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে উহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও না, আবার অভিন্নও না, অথবা বলা যাইতে পারে যে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। সত্য আমাদের জ্ঞানের অনুবন্ধী (Correlative), অর্থাৎ জ্ঞানকে বাদ দিয়া সত্যের বিশিষ্টরূপ কল্পনা করা যায় না: সেইরূপ শিব আমাদের ইচ্ছা-শক্তির অনুবন্ধী, এবং সুন্দর আমাদের আবেগময়ী প্রকৃতির অথবা প্রেমতৃষ্ণার অনুবন্ধী। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ব্র্যাড্‌লের মতে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম ইহারা সকলেই ব্রহ্মের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সত্য, শিব ও সুন্দর নিজেদের বিশিষ্টরূপ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় স্বরূপে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু পরাৎপর ব্রহ্মই আবার একদিকে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম এবং অপরদিকে সত্য, শিব ও সুন্দরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, যদিও ভেদ ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এই আত্মপ্রকাশ ব্রহ্মের অখণ্ড পূর্ণতাকে কিছু পরিমাণ বিকৃত করিতে বাধ্য। সত্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, কারণ সত্য যে পর্য্যন্ত না ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইতেছে সে পর্য্যন্ত তাহাকে আমরা পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ সর্ব্বভেদবর্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়ার ফলে সত্যের বিশিষ্টরূপ লুপ্ত হইয়া যায়। শিব ও সুন্দর সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রয়োজ্য।

জগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় চেতনাময় জীবও ব্র্যাড্‌লের মতে এক সর্ব্বগত রূপান্তরের ফলে আত্মস্বাতন্ত্র্য উৎসর্গ করিয়া ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ সত্তার অঙ্গীভূত হয়। জীবেরও স্বরূপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বিদ্যমান; আত্মচেতনের মধ্যে যে এক ও বহুর অন্তর্বিরোধমুক্ত সমন্বয় সাধিত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জীবগণের

কোন স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও রূপান্তরিত অবস্থায় নির্বিশিষ্টভাবে তাহারা ব্রহ্মের অপূর্ব্ব সম্পদ। বিভিন্ন জীবকে কেন্দ্র করিয়াই অরূপ ব্রহ্মের অনন্ত রূপবৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হয়। অনেকে জীবাত্মাকে অনাদি, অনন্ত, নিত্যপূর্ণ ও স্বয়ম্ভূ বলিয়া মনে করেন। অনেকে আবার জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে স্বীকার করিলেও জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লন এবং উহাকে অনাদি ও অনন্ত বলাও অসঙ্গত মনে করেন না। অনেক চরমপন্থী আবার জীবাত্মাকে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক মনে করিয়া জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নত্বই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। ব্র্যাড্‌লের মতে জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু ব্রহ্মের অংশরূপে তাহার আত্মস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। পরিদৃশ্যমান জড়জগতের মত জীবনসমষ্টিকেও এক ব্যাপক রূপান্তরের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে হয়।

সর্ব্বশেষে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে ব্র্যাড্‌লের মত কি তাহা জানা দরকার। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে মানুষের ধর্ম্মগত চেতনার নিকট আত্মচেতন, সর্বমঙ্গলময়, প্রেমময় যে ঈশ্বর আবির্ভূত হন, দার্শনিক বিচারে তাঁহাকেও পারমার্থিক সত্তার অধিকারী বলিয়া মনে করা যায় না। ঈশ্বরের প্রকৃতিতেও আত্মবিরোধ আছে; একটু গভীরভাবে ভাবিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। প্রথমতঃ আত্মচেতনার মধ্যেই যে স্ববিরোধ অন্তর্নিহিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের প্রকৃতির মধ্যে জীব ও জগতের সহিত কতকগুলি সম্বন্ধ অনুস্যূত আছে। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা হিসাবেই তিনি ঈশ্বর। জীবের নিয়ন্তা ও ভাগ্য-বিধাতা হিসাবেই তিনি তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির চরম লক্ষ্য এবং আরাধনার দেবতা হিসাবেই তিনি ঈশ্বর। এই সকল সম্বন্ধ ঈশ্বরের প্রকৃতির মধ্যে আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির কারণ হইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে ঈশ্বরও অব্যক্ত ব্রহ্মের একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তরূপ,—পূর্ণ আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন পরম সত্তার অন্তর্বিরোধদুষ্ট অভিব্যক্তি। অবশ্য ঈশ্বর ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন না হইলেও ব্র্যাড্‌লে খুব জোরের সহিতই বলিয়াছেন যে আমাদের জ্ঞানে ঈশ্বরকেই আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে উপলব্ধি করি। একদিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের জ্ঞানের বিষয়মাত্রই আত্মবিরোধদুষ্ট অতএব মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি

যে এই সকল "মিথ্যার" উপাদানেই আবার ব্রহ্ম গঠিত। ব্যাপক রূপান্তরের মধ্য দিয়া মিথ্যা সমূহই পরম সত্যের অঙ্গীভূত হইতেছে। সুতরাং সর্ব্বৈব মিথ্যা ও অলীক কিছুই থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মিথ্যার মধ্যেই কিছু পরিমাণ সত্য অন্তর্নিহিত আছে। তা ছাড়া আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আত্মসঙ্গতি কথাটা ব্র্যাড্‌লে তর্কশাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। আত্মসঙ্গতি ও ব্যাপকতা (self-coherence and comprehensiveness) এই দুইটি তিনি একই সত্যস্বরূপের অবিচ্ছেদ্য দুইটি দিক্ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং জ্ঞাত পদার্থসমূহের মধ্যে যখন দেখি যে উহাদের কোনটি বেশী কোনটি বা কম ব্যাপক, অর্থাৎ যখন দেখি যে উহাদের কোনটির সাহায্যে জ্ঞানরাজ্যের বৃহত্তর অংশ বুদ্ধির সহজগম্য হইয়া উঠে, কোনটির দ্বারা বা অনুভব ক্ষেত্রের অতি সামান্য অংশের উপরই আলোকসম্পাত হয়, তখন আমরা স্পষ্টভাবে বুঝি যে সত্যের আত্মপ্রকাশের মধ্যে তারতম্য আছে। ব্যাপকতা ও আত্ম-সঙ্গতির দিক্ হইতে যাহা গরীয়ান্ তাহা পারমার্থিক সত্তার নিকটতর; কেননা উহার আভ্যন্তরীণ বিরোধ অপেক্ষাকৃত সামান্য রূপান্তরের ফলেই ব্রহ্মপ্রকৃতির সমন্বয়ের মধ্যে নির্বাণ লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ব্যাপকতা ও আত্মসঙ্গতির দিক্ হইতে যাহা নিকৃষ্ট পরম সত্য হইতে তাহার দূরত্ব সর্ব্বাধিক এবং মিথ্যার নিম্নতম স্তরে তাহার অবস্থিতি, কারণ আমূল রূপান্তরের ফলে ব্রহ্মের বুকে ইহার স্বরূপ একরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সুতরাং জড়, প্রাণ, মন, ঈশ্বর প্রভৃতি একদিক্ হইতে মিথ্যা হইলেও ইহাদের কোনটি পরম সত্তার নিকটতর বলিয়া অধিকতর সত্য, আবার কোনটি ব্রহ্ম হইতে অধিকতর দূরে বলিয়া অধিকতর মিথ্যা। জড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে ঈশ্বর অধিক আত্মসঙ্গতিপূর্ণ ও ব্যাপক, অতএব ব্রহ্মের নিকটতর ও অধিক সত্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর ব্রহ্মের অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইলেও আমাদের অভি-জ্ঞতার মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মের স্বরূপে আমাদের জ্ঞানের সীমানা অতিক্রান্ত হয় এবং আমাদের স্বতন্ত্র সত্তাও সেখানে বিলুপ্ত হয়।

পারমার্থিক সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে ব্র্যাড্‌লের অভিমত সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এবার দুই একটা বিষয়ের সমালোচনা করিয়াই প্রবন্ধ-শেষ করিব।

আমাদের জ্ঞানের অন্তর্গত সর্ববস্তু সম্বন্ধেই ব্র্যাড্‌লে বলেন যে উহারা মিথ্যা হইলেও ব্রহ্মের বাহিরে পড়িতে পারে না ; ব্রহ্মের অন্তরেই উহাদের ঐসব স্থান, এবং ঐসব উপাদানেই ব্রহ্ম গঠিত। (The appearances are the stuff of which the Absolute is made.) ব্রহ্মের বিরাট পূর্ণতা সাধনে উহারা প্রত্যেকেই ন্যূনাধিক সহায়তা করে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে এখানে একটা জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় মিথ্যা কখনো সত্যের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত হইতে পারে না। ব্র্যাড্‌লে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে শুধু রূপান্তরের মধ্য দিয়া আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের অন্তরে স্থানলাভ করিতেছে। প্রত্যেক দৃশ্যমান পদার্থ আত্মবিরোধদুষ্ট, সুতরাং অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হইলে ব্রহ্মও সেই আত্মবিরোধজনিত মিথ্যা দ্বারা কলুষিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুর দুইটা দিক্, একটা তার বহিরঙ্গ, স্ববিরোধকলঙ্কিত মায়াময় বাহ্যরূপ, আর একটা তার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ রূপান্তরিত অব্যক্ত অবস্থা। দৃশ্যমান বস্তু সমূহের শেষোক্ত এই রূপান্তরিত অবস্থামাত্রই (Transmuted alter ego) ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হইবার উপযুক্ত। সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগতের অবক্ত্য রূপান্তরিত সত্তা ব্রহ্মের অন্তর্গত হইলেও প্রশ্ন উঠিবে যে, উহার বহিরঙ্গের অর্থাৎ মায়াময় বাহ্যরূপের স্থান কোথায় বা আশ্রয় কি? দৃশ্যমান বস্তুরূপেই দৃশ্যমানের আশ্রয় কি হইতে পারে সেই প্রশ্নের কোন সদুত্তর আমরা ব্র্যাড্‌লের দর্শনে খুঁজিয়া পাই না।

ব্র্যাড্‌লীয় দর্শনে আর একটি বড় প্রশ্ন উঠে সৃষ্টিরহস্যকে কেন্দ্র করিয়া। দৃশ্যমান পদার্থসমূহ অল্পবিস্তর রূপান্তরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মের অনির্বচনীয় অজ্ঞাত স্বরূপ গড়িয়া তুলিতেছে। কিন্তু নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্মের পক্ষে বৈচিত্র্যময় এ মিথ্যার রাজ্যে নামিয়া আসিবার প্রয়োজন কি? অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে দ্বন্দ্বময় এই দ্বৈত জগতের উদ্ভব ও সৃষ্টির হেতু কি? শঙ্করপন্থী মায়াবাদীর পক্ষে এই প্রশ্নের গুরুত্ব হ্রাস করিবার একটি পথ আছে। তাঁহারা বলিবেন ব্রহ্মের দিক্ হইতে জগৎ সম্পূর্ণ তুচ্ছ, ইহার কোনরূপ অস্তিত্বই নাই, সুতরাং জগতের মধ্যে ব্রহ্মের নামিয়া

আসিবার বা আত্মপ্রকাশ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। ব্রহ্মের উপর মিথ্যা জগতের অধ্যাস বুঝাইবার জন্য তাঁহারা আবরণ-বিক্ষেপময়ী মায়া-শক্তির আশ্রয় নিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের এই মায়া ধারণাতীত, সদসদ্‌-বিলক্ষণা, "মহাদ্ভুতানির্বচনীয়স্বরূপা"। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে সম্বন্ধপ্রাক্‌ নির্বিকল্প-অনুভূতির অখণ্ডত্ব ভাঙ্গিয়া সম্বন্ধমূলক বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে বহুত্ব-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম এই বহুত্ববিশিষ্ট দৃশ্যমান জগতের রূপান্তরিত সম্বন্ধাতীত নির্বিশেষ অবস্থা। কিন্তু সম্বন্ধপ্রাক্‌ নির্বিকল্প অনুভূতি এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট জগৎ এই দুই-ই অসম্পূর্ণ ও অস্থায়ী। বৈচিত্র্য-ময় জগৎ নির্বিকল্প জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি, আবার অখণ্ড নির্বিশেষ ব্রহ্ম নামরূপাত্মক জগতের চরম সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হইল, যে অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ নির্বিকল্প জ্ঞানের মধ্যে নামিয়া আসিয়া নামরূপাত্মক মিথ্যা বিস্তার করিবার তাৎপর্য্য ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি? বুদ্ধির ক্রিয়ার মধ্য দিয়া রূপবৈচিত্র্যের বিকাশ সম্বন্ধে ব্র্যাড্‌লে বহুস্থানে আত্মস্ফুরণ, আত্ম-অভি-ব্যক্তি প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ সমগ্র ব্র্যাড্‌লীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইল যে সম্বন্ধযুক্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, নামরূপের মধ্য দিয়া সত্য কখনো আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না; সমস্ত সম্বন্ধ ও রূপবৈচিত্র্যকে এক অরূপ অনির্দেশ্য অখণ্ডতার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়াই সত্য আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এককে বহুর মধ্যে, অরূপকে রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করিবার এই মিথ্যা ও অসম্ভব প্রয়াস কেন? আর এই অসম্ভব প্রয়াসকে পূর্ণজ্ঞান ব্রহ্মতে আরোপই বা করা যায় কিরূপে? ব্র্যাড্‌লে এখানে নিরুত্তর। তিনি শুধু এক যায়গায় বলিয়া-ছেন যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা দর্শনের দিক্‌ হইতে অসঙ্গত, কারণ এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধির সাধ্যাতীত। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধটি এই দিক্‌ হইতে না বুঝিতে পারিলে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভ করিতে পারি না এবং দার্শনিক যুক্তি ঘুরিয়া ফিরিয়া অনন্ত জটিলতার সৃষ্টি করিতে বাধ্য। পাশ্চাত্য দর্শন ছাড়িয়া ভারতীয় দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই চরম রহস্য উদ্‌ঘাটনের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের চোখে পড়ে। পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ অখণ্ড সত্তা ও অনন্ত জ্ঞানের সাহায্যেই জগদ্‌রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মানুষের জিজ্ঞাসু মন একটা পরম প্রশান্তির মধ্যে পরিতৃপ্ত

হইতে পারে না। ভারতীয় ঋষির দৃষ্টিতে আনন্দই সৃষ্টির চরম উৎস। এই আনন্দ অনাবিল, অনন্ত, বিশুদ্ধ আনন্দ। জগৎ সৃষ্টির মূলে এই অফুরন্ত আনন্দের অহেতুক অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিবার লীলাময়ী ব্রহ্মশক্তি অনন্ত বিশ্ববৈচিত্র্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন। সত্তা ও শক্তি অভিন্ন, উহারা একই পরব্রহ্মের দুইটি অবস্থা বা দিক্।

ঈডিপাস্ এষণা

অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ রায়, এম্, এ

পরলোকগত ডক্টর ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। তিনি মানবের নির্জ্ঞান (unconscious) মন সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া মনোবিজ্ঞানের চলিত ধারণাগুলির আমূল পরিবর্ত্তনের ধারা সূচিত করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল তথ্য অবগত আছেন তাঁহাদিগের নিকট এই পরিবর্ত্তনের বিষদ ব্যাখ্যা করা নিস্প্রয়োজন মনে করি। এখানে শুধু ফ্রয়েড কল্পিত মানবের ঈডিপাস্ এষণা বা Oedipal wish সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

ঈডিপাস্ প্রাচীন গ্রীস দেশের অন্তর্গত থীব্‌সের রাজকুমার। তাহার পিতা তাহার জন্মগ্রহণের পর তাহাকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ এক ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছিলেন যে ঐ পুত্রই তাহার পিতার হন্তা হইবে। প্রাণভয়ে পিতা পুত্রকে বনে পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু নিয়তির পরিহাস এমনই যে এক কাঠুরিয়া তাহাকে বন হইতে লইয়া গিয়া কোরিন্থ্ সহরে লালন পালন করিল এবং যৌবনে ঈডিপাস্ অতি সুন্দর ও সবল হইয়া উঠিল। যুদ্ধনিপুণ ঈডিপাস্ উত্তরকালে তাহার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হত্যা করিল এবং তাহার মাতার পাণি-গ্রহণ করিল। অবশ্য ঈডিপাস্ তাহার মাতা বা পিতাকে জানিত না।

অজ্ঞাতসারে মাতার সহিত পরিণয় বা অযাচার মানবমনের একটি গভীরতম বাসনা। ঈডিপাসের গল্পে নাকি ঐ বাসনার পরিতৃপ্তি দেখান হইয়াছে। বিবিধ জাতির কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন উপাখ্যানে ঐ বাসনার প্রকাশ হইয়াছে ও পরিতৃপ্তি ঘটিয়াছে। মানব ইতিহাসের প্রারম্ভে ঐ বাসনা প্রকট ছিল এবং পরে সভ্যতার চাপে উহার অবদমন (repression) ঘটিয়াছে। প্রমান হিসাবে বলা হইয়াছে যে পশুগণের যৌন সঙ্গমের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু মানুষের তাহা নাই। সেইজন্য আদিম যুগে মানুষ তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার জন্য

তাহাকে কাছে রাখিত, এবং স্ত্রী তাহার পুত্রকে নিজের কাছে রাখিতে চাহিত এবং তাহার ভরণপোষণের জন্য স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারিত না। ফলে স্বামী স্ত্রী পুত্র লইয়া একটি প্রাথমিক পরিবার গঠিত হইল। কিন্তু পুত্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহার যৌন ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিত এবং সে তাহার সহচরী লাভের আকাঙ্খা চরিতার্থ করিতে উৎসুক হইত। কিন্তু বলবান ও নিষ্ঠুর পিতা পাছে সে তাহার মাতা বা মাতৃ-স্থানীয়া অন্য কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এই ভয়ে তাহাকে পরিবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিত, ফলে বিদ্রোহী পুত্রগণ একত্র হইয়া পিতাকে হত্যা করিত ও তাহাদের যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করিয়া পুনঃ স্ব-স্ব স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবার গঠন করিত। প্রত্যেক পুত্রের মাতার প্রতি অনুরাগ কেবলমাত্র পিতার দাপটে ক্ষুণ্ণ ও অবরুদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু অবরুদ্ধ বাসনার উচ্ছেদ হয় না, তাহার প্রকাশ অন্যভাবে ঘটিয়া থাকে। প্রথমে পিতা হইতে যে ভয় উপজাত হইল পরে তাহা সমাজ-নিন্দা ভয়ে পরিণত হইল এবং ব্যক্তির মানসিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নিন্দা বা ভয় তাহার অন্তরে উপ্ত হইল। এইরূপে ব্যক্তির (individual) মধ্যে বিবেকের আবির্ভাব ঘটিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে যে সকল ইচ্ছা সমাজরীতির বিরোধী তাহার অবদমন হইল, অর্থাৎ সেগুলি ব্যক্তির চেতনা হইতে বিলুপ্ত হইল

স্বপরিবারের মধ্যে বিবাহ, সগোত্রে বিবাহ প্রভৃতি সমাজ নিষিদ্ধ বিবাহে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য অযাচার বাসনার প্রতিরোধ করা। অনেকে বলিবেন পুরুষ কখনও স্বীয় পরিবারভুক্ত নারীকে বিবাহ করিতে চাহে না, কারণ পুরুষের স্বভাব অন্যত্র সহচরী অন্বেষণ করা, অন্য পরিবার-ভুক্ত নারীর সহিত মিলিত হওয়া। কেহ কেহ বলেন নিকট আত্মীয় বা সগোত্রকে বিবাহ করিলে রক্ত দূষিত হয় এবং ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক বা বিচারের উদ্দেশ্য আমাদের নির্জ্ঞান মনের অন্তর্ভুক্ত অযাচার বাসনাকে স্বীকার না করা এবং প্রচ্ছন্ন রাখা। এই অযাচার বাসনা আমাদের মনে অবরুদ্ধ আছে এবং অনেক সময়ে উহার প্রকাশ ঘটে, বিশেষ করিয়া স্বপ্নে এবং মানসিক বিকারে। পুঞ্জীভূত বাসনা ও সংবেদনার সমষ্টিকে complex বলা হয়। ঈডিপাস্ গ্রন্থির মূলে যে বাসনা নিহিত রহিয়াছে তাহা এক কথায় বলা যাইতে পারে পিতার

হত্যা সাধন করিয়া মাতাকে লাভ করা। ইহার মধ্যে বৈরী পিতার প্রতি যে দ্বেষ বা ঘৃণা আছে তাহার সহিত যুগ্ম সম্বন্ধে স্থিত মিত্র পিতার প্রতি ভালবাসা। অতএব ঘৃণা বা প্রীতি দ্বিতয় বা দ্ব্যাত্মক (ambivalent) —যখন ঘৃণা প্রকট হইয়া পড়ে প্রীতি তখন নির্জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়, আবার যখন প্রীতি স্পষ্ট হইয়া উঠে ঘৃণা তখন প্রচ্ছন্ন রূপে থাকে। এমনও হইতে পারে যে পুত্র পিতার সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া মাতার ভালবাসা ভোগ করিবে। অথবা সে নিজে স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া পিতাকে আকর্ষণ করে এবং মাতার প্রতি বৈরিতা সাধন করে, এই অবস্থাকে ঈডিপাস্ এষণার বিপরীত ভাব বা inverted Oedipus Complex বলা হয়।

পশু-শিশুর তুলনায় মানব-শিশুর নিঃসহায়তা অধিক কালব্যাপী, সেইজন্য মানব শিশু তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও আহার সরবরাহের জন্য মাতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। ফলে মাতার প্রতি তাহার টান এত অধিক থাকে যে সে পিতা অপেক্ষা মাতাকেই বেশী ভালবাসে ও মাতার প্রতি পিতার আদর অপছন্দ করে। এই অবস্থায় তাহার মনে ঈডিপাস্ এষণা যে ভাবে কার্য্য করে তাহার কয়েকটি স্তর ব্যাখ্যা করিব। প্রথমে শিশু মায়ের আদর ও যত্ন লইতে ভালবাসে এবং সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে তাহা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় অবস্থায় সে যে শুধু আদর গ্রহণ করে তাহা নয়, পরিবর্ত্তে আদর প্রদান করিতেও সচেষ্ট হয়। তৃতীয় অবস্থায় সে পুত্তলিকা লইয়া মায়ের মত আদর করে ও খেলা করে। চতুর্থ অবস্থায় মা যেমন সকলের প্রতি ব্যবহার করেন সেইরূপ ব্যবহার করিতে প্রয়াস পায়, অর্থাৎ সকলকে মায়ের চক্ষে দেখে। পঞ্চম অবস্থায় শিশু পিতার সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আনন্দ ভোগ করে। ষষ্ঠ অবস্থায় শিশুর পৌরুষ প্রকট হয় এবং সে মাতাকে একান্তভাবে পাইতে চাহে এবং পিতার বিরোধী হইয়া উঠে। ইহাই ঈডিপাস্ এষণার পরিপূর্ণ অবস্থা।

হ্যাভ্‌লক্ এলিসের মতে জীবনের প্রথম অবস্থায় শিশু যখন মায়ের স্তন পান করে তখন সে স্ত্রীভাবে মাতার সহিত রমণ করে। এইরূপ সম্বন্ধকে প্রকৃত রতি বলা চলে না, কারণ ইহা জনন ক্রীয়াশীল রতি নহে। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে লিঙ্গ ও যোনির সম্বন্ধন একমাত্র যৌন ক্রিয়া নহে।

তৎপূর্ব্বে বালক তাহার মুখ, পায়ু ও উপস্থের ক্রিয়া হইতে যে আনন্দ উপভোগ করে তাহাও যৌনসম্বন্ধীয়। বাল্যাবস্থায় শিশু জননক্রিয়ায় অসমর্থ, সেইজন্য ঈডিপাস্ এষণা সে পরিত্যাগ করে। শুধু তাহাই নহে, বিবেকের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার অপ্রীতিকর বাসনাগুলিকে ভুলিতে থাকে এবং সম্বিদ্ হইতে সরাইয়া দেয়। চেতন মনের গণ্ডী হইতে নিষ্কাশন ব্যাপারে পিতৃজনিত অঙ্গহানির ভয় (castration fear) কার্য্যকরী হয়। পরে সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ঈডিপাস্ এষণা নির্জ্জান মনের কোণে অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপ অবদমনের ফলে নানারূপ কল্পনা, স্বপ্ন ও মানসিক বিকারে ঈডিপাস্ এষণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রয়েডের মতে ঈডিপাস এষণার স্বাভাবিক চরিতার্থতার প্রতিবন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার লীলা দৃষ্ট হয়। এই সব ক্ষেত্র যৌন ব্যাপার সংক্রান্ত না হইয়াও মুলতঃ যাহা যৌন প্রবৃত্তি তাহার বিকাশ সাধন করে, ইহাকে ফ্রয়েড sublimation of sex instinct বা যৌন ইচ্ছার উদ্গতি বলিয়াছেন।

ফ্রয়েডের মতে সকল প্রকার কৃষ্টির মূলে ঐ ঈডিপাস্ এষণা নিহিত রহিয়াছে। যৌন প্রবৃত্তির অবদমন হেতু উহার বিকাশ নানারূপে ও বিভিন্ন প্রণালীতে ঘটিয়া থাকে। যদি সভ্যতা এবং সমাজের গঠন ও ক্রমবর্দ্ধমান প্রসারের কারণ অন্বেষণ করা যায় তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উহার আধার স্বরূপ যৌন প্রবৃত্তি প্রকট রহিয়াছে। এবং মানুষ সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি উদ্ভাবন করিয়া তাহার যে উন্নতি সাধন করিয়াছে সেই সকল কার্য্যের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটিয়াছে।

ফ্রয়েড্ পশু প্রতীক গোত্র বা টোটেম (Totem) সম্বন্ধে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন টোটেম সমাজ অতি প্রাচীন, এখন মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে টোটেম সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রাচীন টোটেম সমাজ হইতে ভিন্ন। টোটেম সমাজের মূল সূত্র হইতেছে কোন একটি পশু বা পাখী যেমন ক্যাঙ্গারু, এমু প্রভৃতি। ঐ পশু বা পক্ষীকে প্রতীক স্বরূপ লইয়া এক একটি পরিবার বা দল গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন একটি দল বা সঙ্ঘের পূর্ব্বপুরুষের প্রতীক হইয়াছে ঐ পশু বা পক্ষী। নিজ নিজ

টোটেম বা প্রাণীর সংহার বা উহার মাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কোন একটি টোটেম দলের যে কোন ব্যক্তি যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, গোত্র হিসাবে সে ঐ দলের সভ্য এবং তাহার সহিত ঐ গোত্রের সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারে না। বংশপরম্পরায় সমস্ত ব্যক্তিই ঐ দলের সহিত মিলিত থাকিত এবং একই পিতা বা মাতার সন্তান না হইলেও তাহারা পরস্পরকে ভাই ভাগিনী রূপে দেখিত। "ক্যাঙ্গারু" দলের কোন একটি পুরুষ "এমু" দলের কোন একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করায় যে সকল সন্তান জন্মিত তাহারা সকলেই 'এমু' নামে অভিহিত হইত। এইরূপ বিবাহের ফলে যে পুত্র জন্মিত তাহার 'এমু' দলের কোনও নারীর পাণি-গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে টোটেম সমাজের দুইটি রীতি ছিল—টোটেম প্রাণীর সংহার না করা এবং একই টোটেমভুক্ত রমণীর পাণিগ্রহণ না করা। ফ্রেজার, য়্যাণ্ড্রু, ল্যাং প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদগণ তাঁহাদের স্ব স্ব গবেষণার ফলে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ফ্রয়েড বলেন যে টোটেম রীতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে আদিম যুগেও মানবের মনে অযাচার বাসনা ছিল এবং তাহার প্রতিরোধ হেতু যে বিধি নিষেধ ছিল তাহা কালক্রমে ভিন্ন ভাবে আমাদের সমাজে ক্রিয়াশীল আছে। ফ্রয়েডের মতে মানুষের আদিম বাসনা শিশুর মনে উপজাত হয় এবং শিশুর মানসিক অবস্থা অনেকটা আদিমযুগের মানব মনের অবস্থার অনুরূপ।

ফ্রয়েডের মত সমীচীন হইলেও ডক্টর ম্যালিনোস্কি ঐ মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন ঈডিপাস্ এষণা মৌলিক প্রেরণা নহে। তিনি যে সমস্ত অসভ্য জাতির সমাজ, রীতি, নীতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মানুষের মনে যে ভালবাসা জন্মে তাহা বালকের মাতার প্রতি অনুরাগকে কেন্দ্র করিয়া উপজাত হয় না বরং পরিবারভুক্ত মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনীকে কেন্দ্র করিয়া উপজাত হয়। এবং এইরূপ ভালবাসার বিভিন্নরূপ প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মানুষের আদি বাসনা অবরুদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু ঐ অবরুদ্ধ বাসনাকে ঈডিপাস্ এষণা নাম দেওয়া অন্যায়।

ডক্টর হির্শফেল্ড্ বলেন যে ঈডিপাস্ এষণার যে রূপ ব্যাখ্যা ফ্রয়েড দিয়াছেন তাহা যুক্তিহীন, কারণ ঈডিপাস্ জ্ঞাতসারে তাহার মাতার পাণিগ্রহণ করিতে চাহে নাই এবং ঈডিপাস্ গল্পের উপর ভিত্তি করিয়া ঈডিপাস্ এষণার সম্বন্ধে যে গবেষণা করা হইয়াছে তাহা ভুল। ডক্টর উলজিমথ ও ঐরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঈডিপাস্ গল্পের মত আরও অনেক গল্প গ্রীক্ পুরাণে আছে, অতএব ঈডিপাসের কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া তাহার বাসনার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার সপক্ষে কোন সদ্‌যুক্তি নাই। তিনিও বলেন ঈডিপাসের মনে কোনও অযাচার বাসনা ছিল না।

আমাদের মনে হয় ফ্রয়েড মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীর ব্যবহার ও মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নির্ভুল না হইলেও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে। তবে ভালবাসা ও ঘৃণার যে ছবি তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিছক সত্যের প্রতিকৃতি নহে। ভালবাসা কোন একটি সরল মনোভাব নহে, উহার মধ্যে বিভিন্ন ভাব ও প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে। আলেক্‌জাণ্ডার শ্যাণ্ড ভালবাসার জটিল প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয়। ভালবাসা বা অনুরাগের যে বিভিন্ন অবস্থার কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া দেখিলে ঈডিপাস্ এষণাকে সমস্ত সভ্যতার মূল ভিত্তি বলিয়া মনে হয় না।

জৈনদর্শনে পরিণামতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ।

জৈন দার্শনিকগণ পরিণামতত্ত্বের যে বিবরণ দিয়াছেন ঐরূপ বিবরণ আমরা ভারতীয় অন্য কোনও দর্শনে দেখিতে পাই না। তাঁহাদের মতে সত্তা ও পরিণাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সত্তা হইতে পরিণাম বা পরিণাম হইতে সত্তা পৃথকভাবে দেখিবার উপায় নাই। পরস্পর বিজড়িত এই সত্তা ও পরিণাম হইতেই অর্থ বা বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে এমন কোন বস্তু নাই যাহার পরিণাম হইতেছে না অথবা এমন কোন পরিণাম নাই যাহা বস্তুনিষ্ঠ নহে[১]। কোন বস্তু সত্তাবান্ বলিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে তাহাতে পরিণাম চলিতেছে এবং পরিণামও নিরাধার নহে, পরিণাম সত্তাবান হইতে গেলে বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। স্বাশ্রয়ভূত বস্তুর অভাবে পরিণাম নিরাশ্রয় হইয়া শূন্যত্বে পরিণত হয়। বস্তু পরিণামের ভিতর দিয়া সত্তা হইতে নিজরূপ লাভ করিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা গেল যে বস্তুসমুদয়, যাহা লইয়া আমাদের প্রতীতি-সিদ্ধ জগতে আদান প্রদান চলিতেছে, উহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সত্তা ও পরিণাম এই দুইটির সংমিশ্রণে আত্মলাভ করে। এক কথায় বলিতে গেলে পরিণাম (Evolution) বস্তুর নিজস্ব ধর্ম্ম এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধ। ফলকথা এই দাঁড়াইল যে সত্তাই বস্তুতত্ত্বের ভিত্তি; কিন্তু সে সত্তাটি এরূপ যে উহা পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না এবং এই পরিণামে সত্তার আত্যন্তিক লোপও হয় না অথচ পরিণম্যমান সত্তাই বস্তুকে স্বরূপ দান করে।

এইরূপ সত্তা এবং পরিণামের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জৈনমতে সর্ব্ব বস্তুর বস্তুত্বের ভিত্তি। পাশ্চাত্য দর্শনে অনেকস্থলে Existence অথবা সত্তা এবং বস্তু অথবা Real এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা হয় না। ম্যাক-টাগার্ট (McTaggart) তাঁহার সুবিখ্যাত *The Nature of Existence* নামক গ্রন্থে Reality এবং Existenceএর স্বরূপ আলোচনা

১। প্রবচন-সার ১।১০

প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে Reality is Existence অর্থাৎ সত্তা ও বস্তু অভিন্ন। কিন্তু আমরা জৈনের সত্তাবাদ আলোচনায় দেখিলাম যে বস্তু ও সত্তা একেবারে অভিন্ন নহে অথচ সত্তা উহার অবশ্যম্ভাবী এবং নিয়ত পরিণামের মধ্য দিয়া বস্তুর বস্তুত্ব সম্পন্ন করে; সুতরাং বস্তু ও সত্তা এক নহে অথচ সত্তা হইতে বস্তুকে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় নাই। আরও মনে হয় যে জৈনমতে সত্তা বস্তুর অপ্রকট অবস্থা এবং বস্তু সত্তার প্রকট অবস্থা এবং সত্তার এই যে প্রকট অবস্থা যদ্দ্বারা বস্তু স্বরূপ লাভ করে, তাহাই পরিণাম। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে পবিণামের সহিত সত্তার স্বগত ভেদ নাই। সত্তাই পরিণত হয়। সুতরাং বস্তু হইতেছে পরিণম্যমান সত্তা। আমরা বস্তু ও সত্তার পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইতে বলিয়াছি যে বস্তু সত্তার স্পষ্ট অবস্থা এবং সত্তা অস্পষ্ট বস্তু, কিন্তু ইহার দ্বারা যেন কেহ মনে না করেন যে এইরূপ পরিণাম সাংখ্যীয় পরিণামের অনুরূপ। কারণ সাংখ্যে যদিও পরিণাম অর্থে, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তি বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলেও সাংখ্যে একমাত্র অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই যাবতীয় ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ সাংখ্য বিবৃত এই পরিণাম সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-সাপেক্ষ নয় অন্ততঃ উহাতে নির্লিপ্ত পুরুষের সংযোগ বা সান্নিধ্যের অপেক্ষা আছে এবং যেমন সৃষ্টি প্রবাহে প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ বুদ্ধি অহঙ্কার আদি আবির্ভূত হয়, ঠিক তেমন প্রলয় প্রবাহেও বস্তু সমুদায় স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং অবশেষে প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্তি হয়, জৈনেরা ঐরূপ কোন একমাত্র অব্যক্ত শক্তি স্বীকার করিয়া জগতের যাবতীয় বস্তুকে উহার পরিণাম বা বিকাররূপে ভাবেন না। জৈনমতে বস্তু বহু এবং প্রত্যেক বস্তুই স্বতঃসিদ্ধ অথচ তাহার স্বভাব এই যে উহা সত্তা ও পরিণামের মধ্য দিয়া আত্মলাভ করে এবং এই পরিণম্যমান সত্তা বস্তুর কেবল উৎপত্তি কেন তাহার স্থিতি-বৃদ্ধি-ক্ষয়ও নিরূপিত করে। সুতরাং দেখা গেল যে জৈনের পরিণামবাদ সাংখ্যের পরিণামবাদ হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক। রামানুজ দর্শনেও পরিণামের কথা আছে বটে কিন্তু রামানুজের পরিণামবাদ জৈন পরিণাম হইতে অন্যরূপ। কারণ রামানুজ মতে ব্রহ্ম পরিণামী নিত্য সত্তা, তিনি তাঁহার বিচিত্র মায়াশক্তির সাহায্যে জগৎ সংসার স্বীয় সত্তা হইতে বিকার বা

পরিণামরূপে সৃষ্টি করেন সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব কোন পরিণাম প্রবৃত্তি নাই। পক্ষান্তরে পরিণাম বস্তু মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহাই জৈনদিগের মত। পাশ্চাত্য বিকাশবাদীদিগের (Evolutionists) মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক পরিণাম-প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পরিণাম-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক না হইলে পরিণাম-প্রবৃত্তির প্রেরণা কি হইতে পারে এ প্রশ্ন কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদী তুলিয়াছেন আবার কেহ কেহ বা উহা অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ করেন নাই। আলেকজাণ্ডার (Alexander) এই প্রেরণার নাম দিয়াছেন নাইসাস্ (Nisus); এবং দিক্-কাল হইতে বিকাশের স্রোতে যতদিন অধ্যাত্ম জগৎ আবির্ভূত হয় নাই ততদিন ঐ প্রেরণা বা নাইসাস্ ছিল আধিভৌতিক কিন্তু যখন অধ্যাত্মজগৎ আবির্ভূত হইল তখন ঐ প্রেরণাও আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিল। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে পরিণাম বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হইলেই প্রেরণার আবশ্যক হয়, অন্যথা নহে। আলেকজাণ্ডারের ক্রমবিকাশবাদের মূলে যখন কোন আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নাই তখন বিকাশপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক বলিলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইত না বরং তিনি একটী প্রেরণার অভ্যুপগমের (Assumption) দোষ এড়াইতে পারিতেন। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে জৈনবিবৃত পরিণামবাদ আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদিগের অভিমত বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলে দেখা গেল যে জৈনমতে প্রত্যেক বস্তু, উহা জীবই হউক বা অজীবই হউক সতত পরিণামাধীন এবং এই স্বাভাবিক পরিণামই বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতেছে। জৈনদিগের এই বস্তুতত্ত্ববাদকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয় উহা Evolutionary Realism। প্রতি বস্তুই অস্তিত্ববান এবং প্রতি বস্তুই পরিণম্যমান। সত্তা ও পরিণামের মধ্য দিয়া বস্তু আমাদের নিকট বস্তু বলিয়া পরিচিত হয়। এই সত্তা ও পরিণাম, যাহাদের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্নীত হয়, উহাদিগকে আরও স্পষ্টভাবে উমাস্বাতি তাঁহার 'তত্ত্বার্থ সূত্রে' "উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ" এই সূত্রের দ্বারা বিবৃত করিয়াছেন। বস্তুর একটা দিক্ সত্তা তাহার অপর দিক্‌টি

পরিণাম। উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ এই তিনটি শব্দের দ্বারা উমাস্বামী এই পরিণামের প্রকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখিতে পাই যে জৈনগণ বস্তু সক্রিয় এই মত (Dynamic Conception) গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুই প্রতি মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সৃষ্টি করিতেছে এবং ঐ সৃষ্ট গুণগুলির নাশও হইতেছে বটে কিন্তু এইরূপ গুণোৎপাদন ও গুণ নাশের সঙ্গে বস্তুর স্থৈর্য্য সংরক্ষিত হইতেছে এবং ইহার দ্বারাই বস্তুর প্রতিনিয়ত স্বার্থস্বরূপ বা ব্যক্তিত্ব (Individuality) রক্ষিত হইতেছে। জৈনগণ এই প্রকার পরিণাম ব্যতীত আর এক প্রকার পরিণাম স্বীকার করেন তাহার নাম অবস্থা পরিণাম। এই অবস্থা পরিণামের অপর নাম 'পর্য্যায়'। কোন বস্তুর নূতনত্ব হইতে পুরাতনত্ব লাভ বা এক বর্ণ ত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণ গ্রহণ এইরূপ অবস্থা পরিণাম পর্য্যায়ের উদাহরণ। এই অবস্থা পরিণাম যোগশাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। যোগ শাস্ত্রে আরও দুই প্রকার পরিণাম উল্লিখিত আছে, তাহাদের নাম ধর্ম্ম-পরিণাম ও লক্ষণ-পরিণাম। তবে যোগের এই ত্রিবিধ পরিণাম বস্তু ও তাহার ধর্ম্মের ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়া কল্পনা করা হয় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীতে ভেদ না থাকায় পরিণাম প্রকৃতপক্ষে এক প্রকারই হইতে পারে। কারণ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনটি বিভিন্ন পদার্থকে ধর্ম্ম শব্দের অর্থে অন্তর্ভূত করিলে বাস্তবিক অসঙ্গতি হয় না। ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা দ্বারা ধর্ম্মীরই পরিণাম সূচিত হয়। সাংখ্য যোগ মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ এবং অভেদ স্বীকার করা হয়। ধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন যে হেতু ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মীর অভিব্যক্তি বা স্পষ্টতা প্রতিপন্ন হয়। আবার ধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে অভিন্নও বটে কারণ ধর্ম্ম ধর্ম্মীর পরিণাম মাত্র। এই অংশে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদাভেদ সম্বন্ধে সাংখ্যযোগের সহিত জৈন মতের ঐক্য আছে কিন্তু পরিণামের স্বরূপ, উৎপত্তি ও প্রেরণা সম্বন্ধে সাংখ্যযোগ ও জৈনমতে যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম।

এক্ষণে বস্তুর পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও উহার বিরতি বা বিশ্রাম জৈনগণ স্বীকার করেন কিনা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্যমতে পরিণাম পুরুষের ঈক্ষণে আরব্ধ হয় বটে কিন্তু যে জীবের সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে তাহার পক্ষে আবার প্রকৃতি লয় হইয়া থাকে।

পরিণামের কেবল যে বিশ্রাম হয় তাহা নহে উপরন্তু যাবতীয় বিকার বা পরিণাম অবশেষে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। বিকৃত অবিকৃতে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সাংখ্যের পরিণামে আরম্ভ, বিরতি এবং লয় স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু জৈন পরিণামকে এরূপভাবে দেখেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জৈনমতে জীব ও অজীবাত্মক সর্ব্ব বস্তুই পরিণামাধীন এবং পরিণামের বিরতি নাই এবং লয়ও নাই। বস্তু ভৌতিকই হউক বা আত্মিকই হউক, পরিণাম উহার স্বভাব এবং যেহেতু কোন বস্তুরই নাশ স্বীকার করা হয় না সেইহেতু বস্তু এই পরিণামের নাশকেও প্রশ্রয় দিতে পারে না এবং তাহার ফলে বস্তু মাত্রই পরিণামের মধ্য দিয়া নিজ সত্তা রক্ষা করিয়া যাইতে বাধ্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সত্তা ও পরিণাম যাহা লইয়া বস্তুর স্বরূপ তাহাকে যদি কেবল অজীব বস্তুতে নিরুদ্ধ না রাখিয়া জীব বস্তুরও নিয়ামক বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা হইলে এই সত্তা ও পরিণাম নিয়ন্ত্রিত আত্মবস্তুর স্বরূপ, স্থিতি, বৃত্তি ও চরম গতি কিরূপ হইবে? আত্মার স্বভাবই হইল এই যে উহা জ্ঞানরূপ পরিণাম গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জৈনমতে বস্তু ও তাহার পরিণাম অভিন্ন। সুতরাং জ্ঞান হইতে জ্ঞাতা আত্মা অভিন্ন। যদি জ্ঞান আত্মা হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে জ্ঞান চেতন আত্মা হইতে ভিন্ন হইত অর্থাৎ জ্ঞান অচেতন অথবা অপ্রকাশ হইত। কিন্তু জৈন মতে আত্মা ও জ্ঞান অভিন্ন সুতরাং জ্ঞান ও স্বপ্রকাশ। এইরূপে আত্মার অন্যান্য পরিণাম ও আত্মার সহিত অভিন্ন এবং আত্মার জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র প্রভৃতি পরিণামের মধ্য দিয়া আত্মার বস্তুত্ব নিস্পন্ন হইতেছে। আত্মা স্বয়ম্ভূত এবং উহার বিনাশও নাই সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও এই স্বতঃসিদ্ধ নিত্য আত্মবস্তুও পরিণাম হইতে বিচ্যুত হয় না। জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে আমরা সংসার দশায় যে সীমার মধ্যে অবস্থান করি এমন কি জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম যাহা কিছু সংসারি জীবনে ঘটিতেছে সে সীমার নাম লোকাকাশ। জীব যখন মুক্ত হয় তখন তাহার জ্ঞানদর্শন ও চারিত্র চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করে সত্য কিন্তু তাহারা আত্মার যে পরিণাম সেই পরিণামই থাকে, কেননা বস্তুর সত্তা ও পরিণাম ইহার প্রত্যেকটী বাস্তব এবং বস্তু সত্তা ও পরিণাম ত্যাগ করিয়া বস্তুত্ব রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং জৈনমতে সত্তা ও পরিণাম যেমন

সংসারি জীবের স্বরূপ নির্ণয় করে সেইরূপ মুক্ত জীবেরও স্বরূপ নির্ণয় করে। জৈনমতে জীব পরিণামী নিত্য। সাংখ্য ও বেদান্ত মতে আত্মা অপরিণামী নিত্য। সুতরাং জৈন সম্মত জীবের লক্ষণ হইতে সাংখ্য ও বেদান্তের আত্মার লক্ষণ ভিন্ন। এইরূপে দেখা গেল যে মুক্তির পরে যখন জীব অলোকাকাশে উন্নীত হয় তখনও পরিণম্যমান থাকে। কিন্তু এই মুক্ত জীব কি ভাবে তখনও পরিণত হয় তৎ সম্বন্ধে জৈনগণের সিদ্ধান্ত তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। তবে ইহা সত্য যে তাঁহাদের মতে মুক্ত জীব যদিও কর্ম্মের আবর্ত্তে পুনর্ব্বার পতিত হয় না তথাপি তাহার পরিণাম সুতরাং কর্ম্ম কোন কোন আকারে বর্ত্তমান থাকে, অবশ্য সে কর্ম্ম আর পুদ্গল আকারে তাহাকে আবৃত করিতে পারে না। এই মুক্ত জীবের নাম 'জিন' এবং 'তীর্থঙ্কর' তাঁহার অপর নাম। তীর্থঙ্কর অর্থাৎ যিনি জীব এবং জড়জগতের তীর্থ অর্থাৎ মঙ্গলের সোপান রচনা করেন। তাঁহার সেই রচনা ক্রিয়া তাঁহার পরিণাম ভিন্ন আর কিছু নহে। সত্তা এবং পরিণামে যখন কোন ভেদ স্বীকার করা হয় না তখন মুক্ত জীব বা তীর্থঙ্করের যে সত্তা তাহা শুদ্ধ সত্তা, সুতরাং সেই শুদ্ধ সত্তার যাহা পরিণাম তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধ পরিণাম অর্থাৎ তাহা কর্ম্ম বা পুদ্গলের কলুষ হইতে নির্ম্মুক্ত। জৈনগণ ইহাও বলেন যে তীর্থঙ্কর এমনকি দেবগণ হইতেও শুদ্ধতর অথচ পরিণামশীল। তবেই দেখা যাইতেছে যে মুক্ত জীব তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তার পরিণামের মধ্য দিয়া লোকাকাশ এবং অলোকাকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং সেই সম্বন্ধ তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তার পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নহে।

এইরূপে জৈনগণের সত্তা ও পরিণামবাদের আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হইল যে জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা উপরি উক্ত সত্তা ও পরিণামের স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত। কি জীব কি অজীব সকল বস্তুই সত্তা ও পরিণামের মধ্য দিয়া আপনার স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করে। সত্তা ও পরিণাম এইরূপে জীবাজীবাত্মক সমগ্র জগতের মূলসূত্র। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে জগৎ সংসার সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শনের একটি মুখ্য মতবাদ যাহা Dynamic Conception of Reality বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে জৈনদর্শনগণ তাহাই অতি সুস্পষ্ট ভাবে অতি প্রাচীন কালেও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরিণাম অনাদি

ও অনন্ত। সুতরাং এই পরিণাম বর্ত্তমান পরিস্থিতিতেই পর্য্যবসিত নহে, ইহা ভবিষ্যতেও বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে প্রচলিত আরম্ভবাদ (Doctrine of Emergent Evolution) জৈনমতের সহিত পরিণামের সাতত্য অংশে সমান হইলেও অনেকাংশে উহা হইতে বিলক্ষণ। Emergent Evolutionএর যে কয়েকটি ব্যাখ্যাকর্ত্তা জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রমপরিণতির পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের সহিত জৈন-মতাবলম্বীদের মূল পার্থক্য এই যে তাঁহারা হয় দিক্-কাল (Space-Time) না হয় চৈতন্যাচৈতন্যময় (psycho-phyisical) সত্তা স্বীকার করিয়া উহাদের প্রাথমিক অব্যক্ত অবস্থা ধরিয়া নিয়া ও ক্রমবিকাশের স্রোতে ফেলিয়া উহা হইতে জগৎসংসারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু জৈনদিগের মধ্যে ঐরূপ কোন অব্যক্ত একটি সত্তা লইয়া জগৎ সংসারের উৎপত্তি ও ক্রমপরিণাম বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহারা বহুত্ববাদী এবং অনন্ত সত্তাপরিণামময় জীবা-জীবাত্মক বস্তু স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহাদের প্রত্যেকেই সত্তা ও পরিণামের দ্বারা চালিত বলিয়া ভাবিয়াছেন।

জৈনগণের বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদ সাধারণ জ্ঞান (Common sense) এবং প্রতীতির (Experience) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এতদুভয়ের উপর ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত অনুমান সম্ভব হইয়াছে তাঁহারা তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য নব্য বস্তুতন্ত্রবাদী (Neo-Realist) যে নির্গুণ বা নিরপেক্ষ সত্তা (Neutral Reality) স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা হইতে ক্রমবিকাশফলে জীব ও অজীবাত্মক বস্তুর আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন জৈনগণ তাহার পক্ষপাতী নহেন, কারণ, তাহা সাধারণ জ্ঞান ও প্রতীতির বহির্ভূত। আবার বহুত্ববাদ স্বীকার করায় জৈনগণ চৈতন্যাচৈতন্যময় কোন এক অবিবিক্ত বস্তু সত্তাও গ্রহণ করেন নাই কারণ তাহাও তাঁহাদের নিকট প্রতীতিবিরুদ্ধ। আবার বস্তুর পরিণাম বস্তুর স্বভাবগত নিয়ম এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ক্রমবিকাশে কোন এক উদ্দেশ্যবান চৈতন্যশক্তির আশ্রয় লইয়া এই সত্তা ও পরিণামের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করেন নাই। তাঁহারা প্রতীতি ও অনুমানলব্ধ বস্তুর স্বরূপ ধরিয়া লইয়া বস্তুর পরিণামের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে জৈনমতে সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা ঈশ্বরের

স্বীকার নাই, সুতরাং পরিণাম কোন এক উদ্দেশ্যবান চৈতন্যময় ভগবৎ শক্তির বা উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য সংঘটিত হয় একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ফলকথা এই যে তাঁহাদের মতে বস্তু স্বতঃপরিণম্যমান, কারণ পরিণাম বস্তুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এই কারণেই আমরা পূর্ব্বেই জৈনের বস্তুবাদের Evolutionary Realism এই নাম করণ করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আরও দেখিতে পাইবেন যে পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদে, বিশেষতঃ দ্বৈতমূলক বস্তুতন্ত্রবাদে Theory of Interaction অর্থাৎ জীব ও অজীবের মধ্যে ক্রিয়া ব্যতিহারমত যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে জৈনগণের Evolutionary Realism সেই অসামঞ্জস্যের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান করিয়াছে। উক্ত Interaction Theoryর সেইখানেই অসামঞ্জস্য যেখানে উহা জ্ঞাতা জীব ও জ্ঞেয় অজীবকে অক্রিয় (Static) অর্থাৎ পরিণামরহিত ভাবিয়া পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াব্যতিহার দেখাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু জৈনমতে বস্তু মাত্রই, উহা জীবই হউক বা অজীবই হউক, সক্রিয় বা পরিণামস্বভাব (dynamic) এবং অজীব বস্তুর পরিণাম আর কিছুই নহে উহা জীবের বা জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়া। আবার জীববস্তুর পরিণামই হইতেছে অজীব বস্তুর জ্ঞান। জীব এবং অজীব ধর্ম্মগত পৃথক্ ইহা সত্য হইলেও তাহাদের পরিণামের স্বরূপ এই যে সেই পরিণাম দ্বারাই অজীববস্তু জ্ঞাতার জ্ঞেয়ত্ব আকার ধারণ করে এবং জীববস্তু তাহার জ্ঞানরূপ পরিণাম দ্বারা অজীব বস্তুকে উহার বিষয়ীভূত করে [১]। জৈনের এই প্রকার বস্তুস্বরূপের বিবৃতিকে আধুনিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক (Scientific) বিবৃতি বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। চেতন ও জড়ের পরস্পর ক্রিয়া (Interaction) বুঝাইবার জন্য ভগবৎ শক্তির অবতারণা করিয়া যে মতবাদগুলি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্টের (Descartes) পরবর্ত্তীকালে প্রচলিত হইয়াছিল আমাদের মনে হয় যে জৈনের এই বিবৃতি অন্ততঃ সেই মতবাদগুলির অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

১। প্রবচনসার ১।২৯-৩১

স্বীকার নাই, সুতরাং পরিণাম কোন এক উদ্দেশ্যবান চৈতন্যময় ভগবৎ শক্তির বা উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য সংঘটিত হয় একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ফলকথা এই যে তাঁহাদের মতে বস্তু স্বতঃপরিণম্যমান, কারণ পরিণাম বস্তুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এই কারণেই আমরা পূর্ব্বেই জৈনের বস্তুবাদের Evolutionary Realism এই নাম করণ করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আরও দেখিতে পাইবেন যে পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদে, বিশেষতঃ দ্বৈতমূলক বস্তুতন্ত্রবাদে Theory of Interaction অর্থাৎ জীব ও অজীবের মধ্যে ক্রিয়া ব্যতিহারমত যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে জৈনগণের Evolutionary Realism সেই অসামঞ্জস্যের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান করিয়াছে। উক্ত Interaction Theoryর সেইখানেই অসামঞ্জস্য যেখানে উহা জ্ঞাতা জীব ও জ্ঞেয় অজীবকে অক্রিয় (Static) অর্থাৎ পরিণামরহিত ভাবিয়া পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াব্যতিহার দেখাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু জৈনমতে বস্তু মাত্রই, উহা জীবই হউক বা অজীবই হউক, সক্রিয় বা পরিণামস্বভাব (dynamic) এবং অজীব বস্তুর পরিণাম আর কিছুই নহে উহা জীবের বা জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়া। আবার জীববস্তুর পরিণামই হইতেছে অজীব বস্তুর জ্ঞান। জীব এবং অজীব ধর্ম্মগত পৃথক্ ইহা সত্য হইলেও তাহাদের পরিণামের স্বরূপ এই যে সেই পরিণাম দ্বারাই অজীববস্তু জ্ঞাতার জ্ঞেয়ত্ব আকার ধারণ করে এবং জীববস্তু তাহার জ্ঞানরূপ পরিণাম দ্বারা অজীব বস্তুকে উহার বিষয়ীভূত করে [১]। জৈনের এই প্রকার বস্তুস্বরূপের বিবৃতিকে আধুনিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক (Scientific) বিবৃতি বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। চেতন ও জড়ের পরস্পর ক্রিয়া (Interaction) বুঝাইবার জন্য ভগবৎ শক্তির অবতারণা করিয়া যে মতবাদগুলি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্টের (Descartes) পরবর্ত্তীকালে প্রচলিত হইয়াছিল আমাদের মনে হয় যে জৈনের এই বিবৃতি অন্ততঃ সেই মতবাদগুলির অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

১। প্রবচনসার ১।২৯-৩১

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ।

সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের সবারই আছে—কম আর বেশী। সুন্দরকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা মানুষের প্রকৃতিগত ভাব—এ ভাবের ধারা মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রথম থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। কখনও বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে সে নিজের ভেতরে টেনে আনে, আবার কখনও বা নিজের সৌন্দর্য্য প্রকৃতিতে আরোপ করে—এ নিয়েই মানুষের কাব্য, সঙ্গীত, কলা এসব গড়ে উঠেছে। সুন্দর বলতে শুধু যে রূপ বোঝায় তা নয়; সুন্দরের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সবই পড়ে। তাই সুন্দর বলতে আমরা সঙ্গীত, নৃত্য, কলা, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য সবই বুঝি। এই সুন্দরকে উপলব্ধি করতে মানুষের মনে ও দেহে এক অদ্ভূত সংবেদনের (sensation) উৎপত্তি হয়। আমাদের সকল অনুভূতিতেই কোনরূপ না কোনরূপ সংবেদনের প্রয়োজন; কিন্তু এ রস সংবেদন যেন একটু বিভিন্ন প্রকারের। অনেক মনস্তত্ত্ববিদের মতে রস-সংবেদন ও অন্য সংবেদনের মধ্যে কোন জাতিগত পার্থক্য নেই, কেবল প্রগাঢ়তার তারতম্য (difference in degree) রয়েছে। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এই মতবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানবের সরল ও অবিকৃত মনের কাছে এ রস-সংবেদন যে একটা অসাধারণ ও অলৌকিক অনুভূতিরূপে প্রতীত হয় তাতে কোন সন্দেহই নেই। এই সংবেদন আবার সব মানবের সমান নয়। বিভিন্ন মানবের সহজাত ধাত ও ভাবধারা বিভিন্ন; তাই বিভিন্ন রুচি এবং সেই হেতু এ রস-সংবেদন ও বিভিন্নরূপেই অনুভূত হয়। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে আনুমানিক একটা সাদৃশ্য আছে কি না, এই মানবরুচির বৈষম্যের মধ্যে কোন সাম্য পরিলক্ষিত হয় কি না—এ প্রশ্ন মানবের নীতি ও সমাজ-তন্ত্রে এবং দার্শনিকের ভাবনা শাস্ত্রে (Science of Thought) একটা মস্ত বড় সমস্যা। এক কথায় বলতে গেলে বলতেই হবে যে আমাদের

এ রুচির প্রকারের নানাত্বের এবং অসাম্যের মধ্যে একত্বের ও সাম্যের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। সুন্দরের এই বিশ্বজনীন অনুভূতি (universality of the feeling of the Beautiful) সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানে সৌন্দর্য্য-সংজ্ঞা বা সৌন্দর্য্য-চেতনা (aesthetic sense) নামে অভিহিত।

মানুষ স্বভাবতঃই তত্ত্বজিজ্ঞাসু। যা কিছু তার জ্ঞানের এলাকায় এসে উপস্থিত হয় তারই তত্ত্ব খুঁজে বার করতে সে চায়—এটা মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি। এবং এই প্রকৃতিটিই মানুষের বৈশিষ্ট্য—যে বৈশিষ্ট্য মানবেতর প্রাণী থেকে তাকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে রেখেছে। আর এই প্রকৃতি থেকেই তার জীবনের যত সমস্যার উদ্ভব এবং তাদের সমাধানের প্রবল প্রচেষ্টা। তাই মানবজগতে দর্শনের আবির্ভাব, বিজ্ঞানের উৎপত্তি, কলার বিকাশ ও শাস্ত্রের প্রয়োজন। যখন মানবের বাহ্য বা আন্তর ইন্দ্রিয়ে কোন একটী উত্তেজনা (stimulus) সংবেদন (sensation) সৃষ্টি করে তখন তার বিচারশীল মন কিছুতেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে না। তখনই তার প্রজ্ঞা এই সূত্রবিহীন বিচ্ছিন্ন (discrete) সংবেদনগুলির বিশ্লেষণে (analysis) ও সংশ্লেষণে (synthesis) নিযুক্ত হয় এবং এই সব অর্থহীন সংবেদনের মধ্যে একটা মহান্ অর্থ খুঁজে বার করে। তার এই প্রজ্ঞাচক্ষুর সম্মুখে সে দেখতে পায় এই সব অরূপের উজ্জ্বল রূপ, প্রজ্ঞা কর্ণে শুনতে পায় তাদের সুমধুর সুভাষিত ছন্দবদ্ধ সঙ্গীত। এই প্রজ্ঞাই মানবের চলচ্চিত্রবৎ গতিশীল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তরালে উপলব্ধি করে নিশ্চল শাশ্বত সত্তাকে। এই হলো মানব জ্ঞানের মৌলিক তথ্য। সুন্দরের উপলব্ধি ব্যাপারেও তাই। শুধু উপলব্ধিতেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না, সেই উপ-লব্ধিকে আবার সূক্ষ্ম বিচারের শানে ফেলে সে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তৎপর হয়। কবির ছন্দে, শিল্পীর নৃত্যে ও কলায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সবটাতেই চিন্তাশীল মানব বসে যায় তত্ত্ব গবেষণায়। কোথায় সঙ্গীতের আদি এবং সঙ্গীত কি বস্তু ? নৃত্য, কলা, কাব্য এসবের মানে কি ? এ সব মানবের পরমার্থ বস্তু কি না ? প্রকৃতির একটী বস্তু সুন্দর, আর একটী অসুন্দর কেন ? সুন্দরের বাসস্থান কোথায় ? আমাদের মনে না বাইরের জগতে ?—ইত্যাদি নানা রকমের প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয় তার মনের

কাছে। এই সব প্রশ্নের বা সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধানের প্রচেষ্টা যে শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই তাকেই আমরা সৌন্দর্য্যশাস্ত্র (aesthetics) বলি। বিচারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় যে সুন্দরের সমস্যা কেন, মানবজীবনের কোন সমস্যারই প্রকৃতপক্ষে সমাধান হয় না। দার্শনিক চিন্তা দ্বারা মানুষ তার কোন সমস্যারই সমাধান করে উঠতে পারে না। তা বলে সে চিন্তা বা গবেষণা থেকে ক্ষান্তও থাকতে পারেনা, কেননা চিন্তাশীলতা যে তার ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম—এটাই যে তার স্বভাব। তাই সমস্যাগুলো এড়িয়ে যেতেও সে পারে না। তাই বলছিলাম যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বে আমরা দেখতে পাই শুধু কতকগুলি সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধানের প্রচেষ্টা—প্রকৃত সমাধান নয়।

সে যাই হোক্, এই সৌন্দর্য্যশাস্ত্রকে খতিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই—এতে রয়েছে দুটি জ্ঞানের ধারা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত হয়ে। একটা হচ্ছে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান (the science of the Beautiful) আর একটা হচ্ছে সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞান (the Philosophy of the Beautiful)। বিজ্ঞান শুধু পরিদৃশ্যমান জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর (phenomena) মধ্যে যদি কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকে তবে তাহা নির্দ্ধারণ করা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মগুলি (laws of nature) আবিষ্কার করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান শুধু ভূয়োদর্শনদ্বারা ব্যাপ্তি নিরূপণ করে (a mere induction of particulars), বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত (particular instances) থেকে সাধারণ নিয়মগুলির (universal laws) জ্ঞান দেয়। সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানও তাই করে। দৃশ্যমান সুন্দর বস্তুগুলোর বিশ্লেষণই (analysis) শুধু আমরা এতে পাই। সৌন্দর্য্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের (noumenon) সাথে এর কোন সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ অনুভূত সুন্দর বস্তুগুলির অন্তরালে কোন অতীন্দ্রিয় (transcendental or metempirical) স্বয়ংসিদ্ধ সুন্দর-সত্তা আছে কি না এ বিষয়ের আলোচনা এবং বিচার বিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে না। এ বিচার হচ্ছে সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞানের (Philosophy of the Beautiful) বিষয়বস্তু। এতে প্রধান প্রশ্নই হচ্ছে সৌন্দর্য্য আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে (sense) না বুদ্ধিতে (intellect) অবস্থিত? সুন্দরের আদিম বাসস্থান কোথায়? আমাদের মনের অনুভব শক্তিতে, কিম্বা

ধীশক্তিতে ?—ইত্যাদি অনেক রকম জটিল প্রশ্ন এই শাস্ত্রে উত্থাপিত হয়। আমরা এখানে সৌন্দর্য্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করবো। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা যদিও আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয়, তবুও সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা এই বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে করলে মোটেই যুক্তিসঙ্গত ও সম্পূর্ণ হবে না। কোন তত্ত্ববিজ্ঞানই (metaphysics) বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিজ্ঞান আর দর্শনের পার্থক্য আছে বটে—অন্ততঃ পক্ষে এদের নিজ নিজ সমস্যার সমাধানের পন্থা বা পদ্ধতি বাস্তবিকই বিভিন্ন। সমস্ত জাগতিক ব্যাপারেই বিজ্ঞান দেয় খণ্ডজ্ঞান আর দর্শন বা তত্ত্ববিজ্ঞান চেষ্টা করে তাদের বিষয়ে এক অখণ্ড জ্ঞান দিতে। কিন্তু সমস্ত তত্ত্ববিজ্ঞানই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি স্থাপনা করে বিচারান্বেষী হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যেখানে এসে শেষ হয়েছে, তত্ত্ববিজ্ঞান সেখান থেকে চলতে আরম্ভ করে। অথবা বিজ্ঞানের কাছে যে সব প্রশ্ন অনাবশ্যক এবং যে মৌলিকতত্ত্বগুলি (first principles) বিজ্ঞানের কাছে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ (a priori) ও বিচারাতীত বলে প্রতীয়মান হয় তাদেরই সম্বন্ধে বিশেষ বিচারমূলক আলোচনাই হচ্ছে তত্ত্ববিজ্ঞানের এক প্রধান কার্য্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। দর্শনের আলোচনায় বিজ্ঞানের আলোচনা অনুপ্রবিষ্ট হবেই, তা না হলে সে আলোচনার অঙ্গহানি হবে। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানের আলোচনায়ও যে দর্শনের মস্ত বড় স্থান রয়ে গেছে সে কথা উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ অস্বীকার করলেও এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এর সত্যতা তাঁরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এডিংটন, জীন্‌স্‌ প্রভৃতি যে সব মনীষী অধ্যাত্মবাদ (spiritualism) বা বিজ্ঞানবাদের (idealism) দিকে বিশেষ করে ঝুঁকে পড়েছেন তাঁদের কাছে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো যে দার্শনিক সিদ্ধান্তের সাথে একাকারে পরিণত হতে চলেছে সেটা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই সব বিজ্ঞানবাদী বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত সমালোচনা করে দেখলে দেখা যায় যে বিজ্ঞান এসে মিশেছে তত্ত্ববিজ্ঞানে—ফিজিক্স্‌ আর মেটাফিজিক্স্‌ হয়েছে এক। সে যাই হোক্‌ আমাদের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এই যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে আমরা যতই পৃথক্‌

করে আলোচনা করতে চেষ্টা করি না কেন তাতে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের সমস্যাকেও কিছুটা স্থান দিতে হবে। কাজেই আমাদের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচনায় বিশ্লেষণ (analysis) ও সংশ্লেষণ (synthesis) দুইই এসে পড়ে। বিশেষতঃ একথাটা ভুললে চলবে না যে বিজ্ঞানই বলি আর তত্ত্ববিজ্ঞানই বলি, বিশ্লেষণই বলি আর সংশ্লেষণই বলি—দুইই সেই এক মানবের চিন্তাশক্তি (thought) থেকে উদ্বুদ্ধ—দুটি সেই একই চিন্তাধারার দুটি প্রবাহ মাত্র।

যাক্ সে সব কথা, এখন সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মস্ত বড় একটা প্রশ্নই হচ্ছে যে সুন্দরের কোন আদর্শ বা নিরূপক (standard বা criterion) আছে কিনা এবং থাকলে তার অধিষ্ঠান কোথায়? এ বিষয়ের অবতারণা আমরা পূর্ব্বেই করেছি। মানব রুচির-ও উপলব্ধির বৈষম্যের কথা আমরা মোটেই অস্বীকার করতে পারি না। এই বৈষম্যের কারণ এক নয়, বহু। এর জন্য দায়ী কিছুটা আমাদের ব্যক্তিগত সংস্কার, কিছুটা পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা, কিছুটা নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং কিছুটা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environments)। এই সব সামগ্রী (causes and conditions) বহুকাল ধরে মানব রুচি ও উপলব্ধির বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। আমরা পূর্ব্বে এও বলেছি যে এই অসমতার মধ্যে সাম্যের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এ সামরূপ আদর্শের উপলব্ধি আমাদের কি প্রকৃতপক্ষে হয়? বিশ্বজগতে—কি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, কি মানুষের কৃত সৌন্দর্য্য—কোনটাতেই কি নিখুঁত সুন্দরের উপলব্ধি আমাদের হয়? যে বস্তু যতই সুন্দর বলে আমাদের উপলব্ধি হোক্ না কেন, তবুও যেন কি একটা অভাবের জ্ঞান আমাদের এই উপলব্ধিতে থেকে যায়। অথচ বাস্তবজগতে সুন্দরের আদর্শ যে একেবারে না পাই তাও নয়—হয়ত সম্পূর্ণভাবে না পেতে পারি। গ্রীক্ দার্শনিকচূড়ামণি প্লেটোর মতে আমাদের সুন্দর বোধে পূর্ণতার অভাবের কারণ হচ্ছে এই যে জগৎ প্রপঞ্চের সুন্দর বস্তুগুলির অন্তরালে যে সৌন্দর্য্যের স্বয়ংসিদ্ধ আদর্শ বা আকার (form) রয়েছে তার সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধি আমাদের নেই। বিশেষতঃ এটাই আমাদের মনে হয় যে বাইরের জগতে যদি সৌন্দর্য্যের আদর্শ না থাকে তবে আমরা এই আদর্শের খোঁজ পেলামই বা কোথা থেকে? খোঁজ না পেলেই বা সৌন্দর্য্য কি দিয়ে মাপি? কি করেই

বা মন্তব্য প্রকাশ করে থাকি যে এটি আদর্শস্থানীয় সুন্দর নয়, অথবা এই সৌন্দর্য্যের আদর্শ অত্যন্তই নীচু? এখানে কবি টেনীসনের কথাই মনে পড়ে—তবে বুঝি সেই নিখুঁত নিদর্শনের আশ্রয় আমাদের মনোজগতে! কিন্তু প্রকৃতিতেই যদি এ নিদর্শন না থাকে তবে মানব মনেই বা কি করে থাকা সম্ভব হয়? মানবের কারুকার্য্যে থাকা ত একেবারেই অসম্ভব।

এই আদর্শের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই আমাদের সমস্যা এসে দাঁড়ায়—সৌন্দর্য্য জ্ঞানগত (subjective) কি বিষয়গত (objective)। অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) এবং বিজ্ঞানবাদ (Idealism) এই চির প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ দুটীর মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর সৌন্দর্য্যতত্ত্বের এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। এই সংক্রান্তে এখানে কয়েকটী সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় মতবাদের (Theories of Beauty) আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কোন কোন দার্শনিকের মতে আমাদের সৌন্দর্য্য চেতনা সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমাজের চিরপ্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস থেকে নিরূপিত হয়। এই বোধ আমরা শিক্ষা থেকে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে (inheritance) আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত হই। প্রত্যক্ষবাদীগণের (empiricists) মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী বা সংশয়বাদী (sceptics) তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ মত পোষণ করেন। এরকম মন্তব্যে কিছুটা যে সত্যতা আছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে বলে মনে হয় না। আমাদের সৌন্দর্য্যচেতনার প্রগাঢ়তা যে অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। শুধু প্রগাঢ়তার বৃদ্ধি কেন অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা আমাদের রুচির প্রকারগত ভেদ জন্মে থাকে। কিন্তু তা বলে সৌন্দর্য্যবোধ যে আমাদের ঐ শিক্ষা থেকে সৃষ্ট হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করাটা মোটেই সমীচীন হবে না। আর এক মতানুসারে সুন্দর হচ্ছে সুখপ্রদ—যে বস্তু সুখদায়ক নয় সে বস্তু সুন্দর নয়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সুন্দরমাত্রই সুখদায়ক হলেও সুখদায়কমাত্রই কি সুন্দর হবে? যদি তাই হয় তবে যে বস্তু সুখ দেয় অথবা যখনই কোন সুখের অনুভূতি আমাদের হয় তা থেকেই আমাদের সুন্দরের সঙ্গলাভ করা উচিত। কিন্তু সব সময় তা ঘটে কি? আরও বিশেষ কথা এই সুন্দর শব্দটি ইন্দ্রিয়জন্য সুখ অর্থে

ব্যবহৃত হবে না ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত আধ্যাত্মিক আনন্দ অর্থে আমরা বুঝবো এটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা দরকার; নচেৎ সৌন্দর্য্যসেবা ইন্দ্রিয়সেবার (sensualism) নামান্তর হবে।

পূর্ব্বোক্ত মতটী পরিবর্দ্ধিত করে আর একটী মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্দ্ধিত মতানুসারে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা ও উপকারকতা। অর্থাৎ যে বস্তু যত বেশী প্রয়োজনীয় এবং উপকারী সে বস্তু তত বেশী সুন্দর—সৌন্দর্য্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হবে তার সুফল দেবার যোগ্যতা দ্বারা, তার অর্থক্রিয়াকরিত্বের (practical efficiency) দ্বারা। কিন্তু সৌন্দর্য্যের সঙ্গে উপকারিতা বা কার্য্যকারিতা মিশিয়ে ফেলাতে যে শুধু যুক্তিতর্কের বাধা ঘটে তা নয় পর্য্যবেক্ষণেরও (observation) অবমাননা করা হয়। কোন প্রয়োজনীয় বস্তু সুন্দর হলে আমরা তাতে আকৃষ্ট হই অথবা কোন সুন্দর বস্তু আমাদের জীবনযাত্রায় ফলদায়ক হলে তার মূল্য বেড়ে যায় বটে কিন্তু একথাও সত্য যে যে বস্তুতে যত বেশী পরিমাণে সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখা যায় সে বস্তু তত কম ব্যবহারে লাগে এবং যে বস্তু যত বেশী ব্যবহারোপযোগী সে বস্তু তত কম সুন্দর হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত না দিলেও বোধ হয় এর সত্যতা সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ হবে না।

আর একটী প্রচলিত মতবাদ অনুসারে কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যের মূলাধার হচ্ছে তার অঙ্গসৌষ্ঠব (symmetry) বা অবয়ব-সামঞ্জস্য (proportion)—সুসমঞ্জসতাই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের একমাত্র নিদর্শন। কলা ও কাব্যেই বিশেষ করে এ মতবাদের সমর্থন দেখা যায়। কিন্তু সুন্দরকে সামঞ্জস্য বা মিলন থেকে অভিন্ন বললে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না—সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্যের একটী উপাদান বা সহকারী কারণ (condition) হতে পারে কিন্তু তার সমগ্র কারণ নয়।

পাশ্চাত্য দর্শনে সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিচারে আর একটী মতের প্রাবল্য দেখা যায়—সেটী হচ্ছে সংসর্গবাদ (Associationism.) সংসর্গবাদ অনুসারে বস্তু স্বভাবতঃ সুন্দর বা অসুন্দর পদবাচ্য নয়। অর্থাৎ বস্তু স্বরূপতঃ সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়; সে তার আনুসঙ্গিক বা সংসর্গী ঘটনাবলীর অনুরূপ গুণযুক্ত হয় মাত্র। এইভাবে প্রকৃতির সমস্ত বস্তুতেই আমাদের অনু-রাগানুযায়ী সৌন্দর্য্য আরোপিত হয়। কিন্তু এই মতাবলম্বীগণ একটা

কথা ভুলে যান যে সংসর্গ বা অনুসঙ্গ (association) কোন দ্রব্য বা গুণ সৃষ্টি করতে পারে না, শুধু পূর্ব্বপরভাবী গুণ বা দ্রব্য সকলকে সম্বন্ধ করতে পারে। একাধিক সুন্দর বা অসুন্দর বস্তুর সমাবেশে সৌন্দর্য্যের তারতম্য ঘটতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না। তা ছাড়া আর একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে সম্বন্ধীকে ছেড়ে দিয়ে কোন সম্বন্ধেরই মানে হয় না। কাজেই কোন অস্থায়ী সম্বন্ধ বা সংসর্গ বুঝতে গেলেই আমাদের আগে বুঝতে হবে কোন এক অসম্বন্ধ সত্তাকে, যার সম্বন্ধে এই সংসর্গের উৎপত্তি। তাহলেই আমাদের বলতে হবে যে সংসর্গজ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যায় বস্তুতে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, অপ্রমাণিত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলির কোনটাই দোষরহিত নয়, গলদ প্রত্যেকেরই যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রত্যেকটা মতবাদেই আংশিক সত্য নিহিত আছে। কোন মতটাকেই আমরা একেবারে মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) এবং বিজ্ঞানবাদ (Idealism) এই দুটী প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করতে হয়। পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলিকেও এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এখানেও প্রশ্ন হচ্ছে যে সৌন্দর্য্য জ্ঞানাতিরিক্ত কোন একটী সত্তা কি না ?

বিজ্ঞানবাদীর মতে একটী সুন্দর বস্তুর প্রত্যক্ষের মানেই হচ্ছে এই যে জ্ঞাতার জ্ঞানগত ভাবনা হতে কোন একপ্রকার সংবেদনের সৃষ্টি এবং ঐ সংবেদনই জ্ঞাতার মনে এক সংমিশ্রিত ভাবপ্রবাহের সাম্যাবস্থা (emotional equilibrium বা harmony) আনয়ন করে। এই সাম্যাবস্থার উদ্বোধনে জ্ঞাতার মনে এক অদ্ভুত আনন্দের হিল্লোল উৎপন্ন হয় এবং সেই হেতুই সে ঐ সংবেদনের কারণ-বস্তুতে সৌন্দর্য্য আরোপ করে থাকে। সৌন্দর্য্য স্বরূপতঃ বহির্জগতে নেই, অন্তর্জগতের বা মনোজগতেরই বিকার মাত্র। এই হ'লো পরিমার্জ্জিত বিজ্ঞানবাদীর মতের সারসংক্ষেপ। কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁরা আবার চরমপন্থী এবং যাঁরা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের (subjectivism) পক্ষপাতী তাঁদের মতে সৌন্দর্য্যের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে এই যে ভোক্তার কাছে সেটী কতটা ফলপ্রদ হয়েছে।

এ মতের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করেছি। টলষ্টয়ের মতে কি চারুকলা কি কাব্য, কি সঙ্গীত সবারই মূল্য ধার্য্য করতে আমাদের দেখতে হবে যে তারা কত সংখ্যক ভোক্তার উপলব্ধিতে বা ভোগে কতটা ফলদায়ক হয়েছে। তিনি মনে করেন হৃদয়ের আবেগের আদানপ্রদান করাই (communication of emotion) হচ্ছে কলার উদ্দেশ্য এবং যখন এই ভাবাবেগ অতি স্বচ্ছ শুভ্র এবং নির্ম্মল হয় তখনই সেটা আদর্শ কলারূপে পরিগণিত হয়। যে কলা সুন্দর সৃষ্টি করবে বলে সঙ্কল্প ক'রে শুধু সুখরস সৃষ্টি করে, টলষ্টয়ের মতে সে কলা আদর্শ কলা নয়, সে শুধু এক শ্রেণীর লোকেদের আনন্দ দেয়, সর্ব্বসাধারণের কাজে লাগে না,—সে শুধু 'বুরজোঁয়াদের আর্ট'। তাই তিনি মনে করেন যে সেক্সপীয়রের কিং লিয়ার (King Lear) থেকে একটা রুশদেশীয় গ্রাম্যসঙ্গীতও অনেক বড় আর্ট, কেননা কিং লিয়ার যত লোকের হৃদয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারবে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোককে আনন্দ দেবে এই গ্রাম্য সঙ্গীত। এই হলো টলষ্টয়ের "কলাশিল্পের স্বরূপ কি?" (What is Art?) নামক গ্রন্থখানির মোটামুটি তাৎপর্য্য এবং এই তাৎপর্য্য থেকে বিজ্ঞানবাদের চরম সিদ্ধান্তের আভাসই আমরা পেয়ে থাকি। সৌন্দর্য্যের বাসস্থান বহির্জগতে নয়, সুতরাং সৌন্দর্য্য বিষয়গত (objective) নয়। প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য্য একটা বিষয়ীগত অনুভূতি মাত্র (subjective experience) অর্থাৎ জ্ঞানের অতিরিক্ত এর কোন স্বাধীন সত্তা নেই। শীতলতা বা উষ্ণতা যেমন হিম বা অগ্নির গুণ নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপরে কেবল তাদের ক্রিয়াফল মাত্র তেমনি সৌন্দর্য্য ও আমাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (Aesthetic sense) ওপরে বিশেষ একটা ক্রিয়াফল মাত্র।

বিজ্ঞানবাদের এই মতের বিরুদ্ধে বস্তুতান্ত্রিকের (realist) আপত্তি অনেক। প্রথম কথাই হচ্ছে যে প্রমাতা বা প্রমাণচৈতন্য ব্যতীত প্রমেয়ের যে কোন অতিরিক্ত সত্তা নেই একথা বস্তুতান্ত্রিক স্বীকার করেন না—অর্থাৎ সম্মুখস্থ টেবিলটার অস্তিত্ব আমার টেবিলের জ্ঞান বা কোন মানসিক বিকারের ওপর নির্ভর করে সে কথা স্বীকার করেন না। সৌন্দর্য্যের সত্তা সম্বন্ধেও এই একই কথা। আমরা পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে যদি বহির্জগতে সৌন্দর্য্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করে দ্রব্যসংশ্লিষ্ট বিশেষ কোন একটা সম্বন্ধকেই সৌন্দর্য্য বলে বুঝি তবে এটাই আমাদের

সিদ্ধান্ত হলো যে সৌন্দর্য্যবোধই (appreciation of beauty) সৌন্দর্য্য। তাই যদি হয় তবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আমরা যখন কোন সুন্দর বস্তু উপলব্ধি করি বা কোন সুন্দর দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধ হই আমরা শুধু আমাদের স্বীয় সৌন্দর্য্যবোধের মধুরতা উপভোগ করে (appreciation of the act of appreciating beauty) বিমোহিত হয়ে থাকি। বাস্তবিক পক্ষে কোন সম্বন্ধের সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ হলে কি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, না আমাদের মনের সঙ্গে কোন সুন্দর বস্তুর সম্বন্ধ হলে আমরা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে থাকি? যুক্তিতর্কের দিক ছেড়ে দিলেও দেখি যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধিতে আমাদের সুন্দর বস্তুরই জ্ঞান হয়, স্বকীয় সৌন্দর্য্য বোধের উপভোগ বা জ্ঞান হয় না, বা হলেও সে জ্ঞান গৌণ (secondary বা derivative) মুখ্য (primary বা original) নয়।

দ্বিতীয়তঃ, সৌন্দর্য্য বলতে যদি আমরা ভোক্তার ভাবধারার সাম্যই বুঝি তবে এক যুগের আদৃত কলা শিল্প অন্য যুগে অনাদৃত হয় কেন? অথবা একই দৃশ্য বিষয়ে দ্রষ্টার মনে এক সময় এই ঐক্যতান বেজে ওঠে আর এক সময় মন নীরব হয়ে থাকে কেন? এরকম আরও অনেক আপত্তি এখানে উত্থাপন করা যেতে পারে। এবং এর কোন আপত্তিরই সমাধান এই বিজ্ঞানবাদের দিক থেকে হয় বলে পূর্ব্বপক্ষ মনে করেন না।

সুতরাং বিরুদ্ধমতবাদীগণ বহির্জগতে সৌন্দর্য্যের বাস্তব সত্তার (objective entity) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এঁদের মতে সৌন্দর্য্য বিষয়গত ভাব। এখানে আমরা প্লেটোর মতবাদেরই উল্লেখ করবো। আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি যে প্লেটো এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চের সুন্দর বস্তুগুলির অন্তরালে এক সৌন্দর্য্যের ছাঁচ বা আদর্শ বা আকারের (Form of Beauty) অস্তিত্ব স্বীকার করেন; এবং এই আদর্শের সঙ্গে বাস্তবজগতের বস্তুগুলির যতটা মিল বা অমিল হবে তারা ততটা সুন্দর বা অসুন্দর হবে—অর্থাৎ ঐ আদর্শকে যে বস্তু যতটা অনুকরণ করতে পারবে সে বস্তু তত বেশী সুন্দর বলে পরিগণিত হবে এবং যে বস্তু মোটেই তার তদনুরূপ হয় না—সে বস্তু অসুন্দর বা কুৎসিত। প্লেটোর সিম্পোসিয়াম্ (Symposium) নামক কথোপকথনমূলক গ্রন্থে (Dialogue) সৌন্দর্য্য তত্ত্বানুসন্ধান সূত্রে এই সৌন্দর্য্যের ছাঁচগুলোর বিশেষ আলোচনা আমরা দেখতে পাই। তিনি আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় মনের তিনটি অবস্থার ক্রম-

বিকাশের কথা আমাদের বলেছেন। তাঁর মতে আমরা প্রথম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি কোন একটী সুন্দর বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে; তারপরে ক্রমে আমরা সক্ষম হই নানাবিধ সুন্দর বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে। এবং বহুতে সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের মনোজগতে যত সুদৃঢ় ও বিস্তৃত ভাবে জাগরিত হয় ততই আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তুর অন্তরালে এক শাশ্বত সুন্দর-সত্তার জ্ঞানলাভ হতে থাকে। এই সত্তাই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের আকার (Form of Beauty)। তিনি তাঁর রিপাব্লিক্ (Republic) নামক গ্রন্থে এই আকারের সম্যক্ জ্ঞান আমাদের কি করে হতে পারে তারও উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন– যে জ্ঞান আমাদের অজ্ঞানান্ধকার (illusion) দূর করে সেই জ্ঞানের চর্চ্চা ও উপলব্ধিতে এই আকারের উপলব্ধি বা জ্ঞান আমাদের হতে পারে। এই জ্ঞান হচ্ছে সংখ্যা-গণনা বিদ্যা। সংখ্যা-বিজ্ঞান (Theory of Numbers,) জ্যামিতি (Theory of Geometry), ঘনমিতি বিদ্যা (Theory of Solids বা Stereo-metry) এবং জ্যোতির্বিদ্যা (Theory of Astronomy) প্রভৃতির সম্যগ্‌জ্ঞান। সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগত (abstract and universal) আকারের জ্ঞান হতে হলে এই সব বিদ্যার সম্যগ্‌-জ্ঞান দরকার। তিনি আরও বলেন যে এই আকারের জ্ঞান তর্কবিচার বা বুদ্ধি চালনার দ্বারা আমরা পাবো না –পাবো যোগজ প্রত্যক্ষ বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ (Intuition) দ্বারা। এই জ্ঞান একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় শিল্পীর মনে হঠাৎ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে—এ এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানালোক (a mystical flash)। প্লেটো ফীড্রাস্ (Phaedrus) গ্রন্থে আরও বলেন যে মানব জীবনে জীবের সম্যগ্‌ জ্ঞান বা পূর্ণপ্রজ্ঞা কোনটাই পূর্ণমাত্রায় অর্জ্জিত না হতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্য সত্তার বিশুদ্ধ জ্ঞান তার হওয়া সম্ভবপর। অর্থাৎ সমুচিত শিক্ষালাভ হলে আমরা এই সর্ব্বগত (universal) আকারকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি এবং সেই জ্ঞানানুরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধের মধ্যে সুন্দরকে পুনঃপ্রকাশও করাতে পারি। সুতরাং প্লেটোর মতে সৌন্দর্য্য উপলব্ধির তারতম্য শুধু বিষয়ীগত তারতম্য বা রুচির বিভিন্নতার ওপরই নির্ভর করে না, জ্ঞানের তারতম্যের ওপরও যথেষ্ট নির্ভর করে।

প্লেটো সৌন্দর্য্য বোধবৃত্তির (aesthetic process) ব্যাখ্যায় মনের যে

তিনটী অবস্থার ক্রমবিকাশের কথা বলেছেন আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাহা সমর্থন করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে চিন্তা জগতে সৌন্দর্য্যের প্রথম অনুপ্রাণন (first inspiration of Beauty) হতে হলে মনের চার প্রকার অবস্থান্তর ঘটে—প্রথমতঃ মনকে অভিমুখী করে প্রস্তুত করতে হবে (Preparation) তারপর মনে সৌন্দর্য্যানুভূতি অঙ্কুরিত হবে (Incubation) তারপর তাহা জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে (Illumination) এবং পরিশেষে উহা মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে (Verification)।

শুধু মনোবিজ্ঞানে কেন আধুনিক পাশ্চাত্য আর্ট-সমালোচকদের প্রতিপাদ্য বিষয়েও প্লেটোর মতবাদ যথেষ্ট সহায়তা করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্লাইভ্ বেলের 'আর্ট' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটীর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বেল্ যদিও প্লেটোর মতাবলম্বী নন তবুও তিনি এই গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে তৎপর হয়েছেন সে সিদ্ধান্ত যে প্লেটোর সৌন্দর্য্যতত্ত্বেরই প্রকারান্তর এ কথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। বেল্ বলেন যে প্রত্যেক সৌন্দর্য্য অনুভূতির অন্তরালে রয়েছে এক ব্যক্তিগত অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস (peculiar emotion)। সুন্দর বস্তুগুলোর মধ্যে প্রকারতার এবং প্রগাঢ়তার যতই পার্থক্য থাকুক না কেন তারা সবই এক জাতিভুক্ত, কারণ তারা সকলেই সৌন্দর্য্যস্রষ্টা এবং সৌন্দর্য্য-বোদ্ধা সবারই অন্তরে এই অপূর্ব্ব সৌন্দয্য-ভাবোচ্ছ্বাস (aesthetic emotion) আনয়ন করে। প্রত্যেক কলা-শিল্পই এই ভাবের উন্মেষ করাতে সক্ষম কেন না এরা সকলেই কোন এক তাৎপর্য্যপূর্ণ সত্তায় সত্তাবান—এই সত্তাকে বেল্ বলেছেন 'Significant form' বা অর্থপূর্ণ আকার।' এই আকার বা সত্তার উপলব্ধির প্রকাশই হচ্ছে কাব্য, সঙ্গীত-কলা ইত্যাদি।

আমরা সাধারণতঃ জাগতিক পদার্থ নিচয়কে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় বলে দেখে থাকি। কিন্তু কবি বা শিল্পী তা দেখেন না—তিনি প্রকৃতিকে উপায়রূপে (as means) না দেখে আত্মনিষ্ঠ উদ্দেশ্য (end in itself) রূপে উপলব্ধি করে থাকেন। এখানেই সাধারণ মানব থেকে কবি বা শিল্পীর পার্থক্য। আমরাও যে এ দৃষ্টিতে জগৎকে না দেখি তা

নয়, কিন্তু দেখলেও ক্ষণিকের জন্য দেখে থাকি এবং সেই ক্ষণিকের দেখাতেই সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি আমাদের হয়ে থাকে। কিন্তু শিল্পী বা কবির পক্ষে দৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন ও পলকশূন্য—অর্থাৎ তাঁর মনটি দৃষ্টিতে নিয়ত নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তিনি প্রতি বস্তুতে সৌন্দর্য্য সত্তার উপলব্ধি করেন। একটী সুন্দর ছবিকে কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে না দেখে যদি আমরা ছবিটীর সৌন্দর্য্যকেই একমাত্র লক্ষ্য বস্তু বলে গ্রহণ করি তবে যেমন আমরা এক অভিনব অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সত্তার উপলব্ধি করে থাকি, শিল্পীও তেমনি প্রকৃতিতে উপলব্ধি করেন। তিনিও প্রকৃতিকে একটী ছবির মতই উপলব্ধি করে থাকেন। তাঁর এই উপলব্ধিতে আছে এক অলৌকিক অনুভূতি। এই অলৌকিক অনুভূতি আছে বলেই প্রকৃতির অতি সাধারণ ও তুচ্ছ দৃশ্য বা ঘটনাও কবির ছন্দে মধুর সঙ্গীতে স্পন্দিত হয়ে ওঠে, শিল্পীর লেখনীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুটে ওঠে। সাধারণ মানবের দৃষ্টিকে যে সব ঘটনা (phenomenon) আকৃষ্ট করতে পারে না সে সব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শিল্পীর জ্ঞানালোকে। জগতের যে কোন মহাকবি বা শিল্পীর রচনায় আমরা এর পরিচয় এত বেশী পাই যে এখানে কোন দৃষ্টান্ত না দিলেও আমাদের বাক্যটী (Judgment) অগ্রাহ্য হবে না। আর এই অনুভূতি কোন ভাব বা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, এ শুধু অনুভবসিদ্ধ। যাঁর জীবনে এ অনুভূতি হয় নাই, তাঁর কাছে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন যে এই অলৌকিক অনুভূতি আর অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদীর দর্শন (mystic vision) এক। এই অনুভূতি অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সামিল হলেও একেবারে এক কিনা বলা যায় না—কারণ এ দুয়ের মধ্যে প্রকারগত ভেদ না থাকলেও প্রগাঢ়তার তারতম্য রয়েছে। শিল্পীর অনুভূতি এই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের (mystic vision) তুলনায় স্বল্পকাল স্থায়ী। তবে এই দর্শনে শিল্পীও বিষয়বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যান—এ অনুভূতিতে আছে পূর্ণানন্দের আভাস, এই জন্য হিন্দু দার্শনিকগণ এ আনন্দকে বলেছেন ব্রহ্মানন্দের সহোদর। একেই বলে রস। সুতরাং শিল্পীর এই ভাবোচ্ছ্বাসের বা রসের অনুভূতি এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের (Transcendental world) আভাস দেয় বলে কলাকে (art) পরমতত্ত্বের দ্বার-স্বরূপ (window of reality) বলা যায়। কাব্য, সঙ্গীত,

ললিতকলা (fine arts) সমস্তই যুগে যুগে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করে আসছে যদিও যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সৌন্দর্য্যবোধশক্তি বা অভিব্যক্তিপ্রকারের পরিবর্ত্তন হচ্ছে।

প্লেটো এবং তৎপ্রবর্ত্তিত আধুনিক মতবাদ সৌন্দর্য্যকে বিষয়গত (objective) বলে ধার্য্য করলেও সম্পূর্ণরূপে বস্তুতন্ত্রবাদের মত পোষণ করে না। তত্ত্ববিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বরং অধ্যাত্মবাদই প্রতিপাদন করে। কিন্তু এখানেও মস্ত একটা সমস্যা যে বস্তুর অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত আদর্শ বা আকার বা ছাঁচ এক না বহু এবং চিন্ময় না জড় ?—অর্থাৎ এই স্বয়ংসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় আকার আত্মার অতিরিক্ত এক অচেতন সত্তা কি না ? যদি তাই হয় তবে চেতন আর জড়ের সম্বন্ধে যে চির-জটিল অমিমাংসিত সমস্যা দার্শনিক জগতে রয়েছে তারই পুনরুত্থাপন করা হয়। তবে এর সমাধান কি ? যুক্তির জগতে এর প্রকৃত সমাধান নেই—সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। নদীশাখা যেমন মরুপথে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বুদ্ধি ঠিক তেমনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এসে এক বুদ্ধির অগোচর তত্ত্বের (alcgical principle) সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করে। তবে একটা মোটামুটি সমাধান হয়ত হতে পারে। সুতরাং যে সিদ্ধান্তের উল্লেখ আমরা করবো সে সিদ্ধান্ত একটা সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হতে পারে—এবং এই সাম্প্রতিক সমাধান (provisional solution) মানব জীবনে একটা আপোষ-চুক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এখন আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের প্রত্যক্ষ-বিষয় জ্ঞানগত, বিষয়গত নয়। কিন্তু তা বলে আমরা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করি না। আমাদের সম্মুখস্থ টেবিলটীর প্রত্যক্ষজ্ঞান হতে হলে যদি আমার মনের থাকা প্রয়োজন হয় অথবা আমি যদি বলি যে এই টেবিলের জ্ঞান আমার কতকগুলি মনোবৃত্তি সাপেক্ষ তা হলে এটা আমরা বুঝবো না যে টেবিল-বস্তুটীর অস্তিত্ব না থাকলেও আমার মনোবৃত্তিই টেবিলের জ্ঞান দেবে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বে আমরা এই সিদ্ধান্ত করবো যে সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃ (intrinsically) বহির্জগতে থাকে না ; এবং এ কথা বললে কেউ যেন মনে না করেন যে তাহলে সূর্য্যাস্ত বা সূর্য্যোদয় অথবা কোন মধুর সঙ্গীত বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না

করলেও প্রকৃতির ঐ অপরূপ রংএর ছটা বা ছন্দের আদর্শ আমাদের মনোজগতে সুদৃঢ় হয়ে বসে আছে। বিভিন্নতা ও নানাত্ব হচ্ছে এই জগতপ্রপঞ্চের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই নানাত্বের মধ্যেও আনুমানিক একটা আদর্শের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করে থাকি। বিচারের দিক থেকে এটাই বরং বলা চলে যে বিভিন্নতাটাই আদর্শের বিশেষ একটী অত্যাবশ্যক উপাদান। ভ্রমের প্রতীতি যেমন সত্যের অস্তিত্বই প্রমাণ করে তেমনি রুচির বিভিন্নতাই এই আদর্শের উপলব্ধিতে সহায়ক হয়। এবং এই আদর্শ বস্তুসাপেক্ষ। প্রত্যক্ষবাদীর মত আমরা এই আদর্শের উৎপত্তি প্রথা বা রীতিতে স্বীকার করবো না। তুষারাবৃত পর্ব্বতশিখরকে আমরা সুন্দর বলি কেননা সবাই সুন্দর বলে আসছে। সঙ্গীত ভাল যেহেতু ভাল বলাটা প্রথা রয়েছে এরকম সিদ্ধান্ত মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। সৌন্দর্য্যের এই বিষয়গত বাস্তব আদর্শের বিরুদ্ধে জ্ঞানের আপেক্ষিকতার (relativity of knowledge) দিক থেকে যে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে তার উত্তর হবে এই যে আমাদের এই জ্ঞানের আপেক্ষিকতার দোষে এই পরম আদর্শ (absolute standard) দোষযুক্ত হয় না। কারণ আমরা সবই আপেক্ষিকভাবে জানি—প্রত্যেক জ্ঞানই জ্ঞাতৃসম্পর্কীয় বা বৃত্তিসাপেক্ষ সুতরাং সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটাই তার পূর্ণ জ্ঞান—অর্থাৎ পূর্ণের এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানেতেই ব্যক্তিগত সম্পূর্ণত্ব প্রকাশ পাচ্ছে ;—অসম্পূর্ণতাটাই তার ব্যক্তিগত পূর্ণত্ব। আর এই অসম্পূর্ণতার গণ্ডিও সে অতিক্রম করে যেতে পারে না যেহেতু সসীমত্ব বা অপূর্ণত্বটাই তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ। অথচ এটাও বলা যায় না যে এই ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতাটাই পরম পূর্ণতা—কারণ পারমার্থিক তত্ত্বের পূর্ণতা এক পূর্ণসত্তাই (একমেবাদ্বিতীয়ম্) হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি নানা বা বহু এবং সেই হেতু পরম-পূর্ণতাও (Absolute whole) বহু হবে—এরকম বাক্য স্ববিরুদ্ধ পদবিন্যাস (contradiction in terms) হয়ে পড়ে। আরও বিশেষ কথা এই যে অসীম পূর্ণের অনুভূতিও আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কেন না পরম-তত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে আমরা আপেক্ষিকতার কথাই বা বলি কি করে—পূর্ণকে না জানলে ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতার সংবাদই বা পাই কি করে? সুতরাং মানব রুচির একরূপতা (uniformity) আছে বললে

তাহা পারমার্থিক (absolute) অর্থে মোটেই বুঝবো না, আপেক্ষিক (relative) অর্থেই বুঝবো। বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে জড়-প্রকৃতির একরূপতা বা একবিধত্বই (the law of the uniformity of nature) যখন আপেক্ষিকবাদের (theory of relativity) দ্বারা প্রকারান্তরিত হয়েছে তখন মানবের সচেতন প্রকৃতিতে পারমার্থিক একবিধত্ব কি করে সম্ভব? সত্য, শিব ও সুন্দর যাই বলি না কেন সবই এই আপেক্ষিক জগতের ব্যাপার। কিন্তু এই ব্যাপারের অন্তরালে সর্ব্বময় হয়ে আছে এক চৈতন্য সত্তা। বিশিষ্ট চৈতন্যের (individual consciousness) সমাবেশ যে সমষ্টি চৈতন্য (Universal Consciousness) সেটিও এই নিরুপাধিক সত্তারই উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য। অধিষ্ঠান (locus) এক কিন্তু আরোপিত চৈতন্যের পৃথক ধারা অনুসারে পৃথক প্রকারের দৃষ্টি। চিন্তা (thought) থেকে সত্য (Truth) প্রযত্ন (volition) থেকে শিব (Goodneas) এবং বেদনা (emotion) থেকে সুন্দরের (Beauty) উৎপত্তি। তিনই সেই এক জ্ঞানের ধারা। কিন্তু সবই এই অধ্যস্ত জগতে সীমাবদ্ধ বা অবিদ্যাজনিত। সুতরাং সবই এই আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক জগতের কথা।

আর একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যের আদর্শের বিষয়ীগত বা বিষয়গত গুণের কোনটাকেই আমরা সৌন্দর্য্যের এক মাত্র উপাদান বলে স্বীকার করবো না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে দুয়েরই সমান দান এবং প্রয়োজনীয়তা। এখানে হেগেলীয় মতাবলম্বীদের মত মধ্যপন্থী হয়ে দুয়ের সামঞ্জস্য করাটাই যৌক্তিক বলে মনে হয়। এ দুটী অনুবন্ধী বা পরস্পর সাপেক্ষ (correlatives) এবং এই অর্থেই আমরা বলবো যে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে সংজ্ঞা ও প্রজ্ঞা দুয়েরই সংমিশ্রণের প্রয়োজন। প্রকৃতির আকার, গতি, শব্দ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারে অসংখ্য বস্তুতে ব্যাপ্ত এবং এদের ছন্দোময় মিলনে (harmonic adjustment) হচ্ছে সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব। কিন্তু এই মিলন (adjustment) সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে না—শুধু প্রকাশ করে। আবার প্রকাশও স্বয়ং হয় না, প্রয়োজন হয় একজন প্রকাশকের এবং এই প্রকাশকই হচ্ছে শিল্পীর অনুভূতি। সুতরাং শিল্পী সৃষ্টিক্ষম বটে কিন্তু এই প্রকাশন অর্থেই সৃষ্টির মানে বুঝতে হবে। কিন্তু তা বলে আর্টকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির প্রতিকৃতি বলে মনে

করার যথেষ্ট হেতু নেই। কবি শুধু অনুকরণই করেন না, তিনি কিছু সৃষ্টিও করেন। শিল্পী শুধু অনুলিপিকর (copyist) বা অনুকারীই (imitator) নন, তিনি স্রষ্টাও বটে।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে সুন্দর বলতে যে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝি তা আমরা জানি না, সুন্দরের প্রকৃত উপাদানের সম্যগ্ জ্ঞান আমাদের নেই, অথবা থাকলেও তা ভাব বা ভাষার অতীত—অবাঙ্মনসোগোচরম্। দার্জ্জিলিংএর টাইগার-হিলে দাঁড়িয়ে সেই সুদূর আকাশ গহ্বর থেকে যখন আমরা প্রভাতের রবিকে প্রথম উঠতে দেখি তখন শুধু এটুকুই জানি যে আমাদের এক অভিনব অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও আনন্দের অনুভূতি হলো, দেহ মন ও প্রাণ ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্যের ছটায় যেন এক অসীম পুলক-স্পন্দনে উদ্বেল হয়ে উঠলো! কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্যের সঙ্গে শাশ্বত চৈতন্য-সত্তার কোন অবিচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কি? আমরা উত্তরে বলবো—জানি না, যদিও যুক্তিতর্কে আমাদের মানতেই হবে যে আমাদের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিমূলক বাক্যটীর সত্য নিরূপণ করতে হলে এরূপ কোন সম্বন্ধের অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক। এটা আমরা বেশ বুঝি যে এই দৃশ্যের বাস্তবতা আমাদের এই বিশিষ্ট জ্ঞানের একটী প্রকৃত উপাদান বটে, কিন্তু এই বাস্তবতাটাই এই জ্ঞানের সত্য নিরূপণে যথেষ্ট বা একমাত্র উপাদান (sufficient condition) নয়।

বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তি *

অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস চক্রবর্ত্তী, এম. এ, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

বেদান্তে উক্ত হইয়াছে—"অবস্থাত্রয়হীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।" যে ব্যক্তি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বিরহিত তিনিই বিদেহমুক্ত বলিয়া খ্যাত। বেদান্ত মত ও অধ্যারোপ বাদের ব্যাখ্যার জন্য নিম্নে অবস্থাত্রয়ের একটু বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

রজ্জুর জ্ঞান তিরোহিত হইলে যেমন উহাতে মানুষের ক্ষণকালের জন্য সর্পভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাহাতে জীবের জগদ্‌ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যে অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান ইহারই নাম অধ্যারোপ। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের উপরই এই অধ্যারোপ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত এই অবস্থাত্রয় বর্ত্তমান থাকে সেই পর্য্যন্তই অধ্যারোপের অবকাশ থাকে; অবস্থাত্রয়ের অপগমে অধ্যারোপেরও অবসান হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে অবস্থা ত্রিবিধ। যে অবস্থাতে বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহার নাম জাগ্রদবস্থা। যে অবস্থাতে একমাত্র মনোবৃত্তির দ্বারা এ জন্মের বা জন্মান্তরের জাগ্রদবস্থায় অনুভূত ও মনঃ কল্পিত বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা এবং যে অবস্থাতে মনের সহিত সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিলীন হইয়া যায়, কেবল বুদ্ধির সূক্ষ্মবৃত্তিদ্বারা অজ্ঞানাবৃত সুখরূপ আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে তাহার নাম সুষুপ্তি অবস্থা। জাগ্রদবস্থাতে স্থূল, স্বপ্নাবস্থাতে সূক্ষ্ম এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে কারণ শরীর বর্ত্তমান থাকে।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। অজ্ঞান বা মায়া সৎও নহে অসৎও নহে, ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত, অনির্বাচ্য, জ্ঞানের বিরোধী কিন্তু ভাবরূপ। বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান এই অজ্ঞান সমষ্টিরূপে এক পদবাচ্য হইয়া থাকে। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" ইত্যাদি শ্রুতির 'এক' শব্দ

* মহাকাব্যরত্নাবলীর প্রভাটীকা অবলম্বনে লিখিত।

এই অজ্ঞান বা মায়াকেই বিষয় করিয়া থাকে। আবার মলিন সত্ত্বপ্রধান এই অজ্ঞান ব্যষ্টিরূপে 'ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে" এই শ্রুতি কথিত মায়াপদকে অধিকার করে।

মায়োপাধি ঈশ্বরই শ্রুতিতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, পরোক্ষ, নিয়ামক, সর্বেশ্বর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। অবিদ্যোপাধি জীব শ্রুতিতে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, অপরোক্ষ, নিয়ম্য, আনন্দভুক্, চেতোমুখ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমষ্টিরূপ অজ্ঞান অখিল প্রপঞ্চের কারণ ও ঈশ্বরের কারণ শরীর আনন্দময় বলিয়া, এবং কোষের ন্যায় ঈশ্বরকে আবৃত করে বলিয়া, আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত। স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর এই আনন্দময় কোষে লীন হয় বলিয়া এবং ইহাতেই ঈশ্বরের অনুভব হয় বলিয়া ইহার নাম সুষুপ্তি। আবার ব্যষ্টিরূপ অজ্ঞান জীবের অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়া কারণশরীর, আনন্দময় বলিয়া এবং কোষের ন্যায় আবরক বলিয়া আনন্দময় কোষ নামে কথিত। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটি শক্তি আছে। ঈশ্বর বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা লিঙ্গ হইতে ব্রাহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমুদয় প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"বিক্ষোপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।" তমপ্রধান, বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত ও অজ্ঞানোপহত ঈশ্বরচৈতন্য হইতে সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত আকাশাদি তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন— "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি। এই ভূতপঞ্চক হইতে সূক্ষ্মশরীর এবং স্থূলভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও মনের সমবায়ে গঠিত। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সাত্ত্বিকাংশ হইতে ক্রমে আকাশাদি ভূতপঞ্চকের উদ্ভব হইয়াছে। বুদ্ধির ধর্ম্ম অধ্যবসায়, মনের ধর্ম্ম সংকল্প ও বিকল্প, অনুসন্ধান ও অভিমানাত্মক চিত্ত ও অহঙ্কার ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এই মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ সমূহ আকাশাদিগত ব্যস্ত রজোংশ হইতে জাত। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু আকাশাদিগত মিলিত রজোংশ জাত। সূত্রাত্ম চৈতন্য এই সকল সূক্ষ্মভূতের সমষ্টিরূপ উপাধিদ্বারা উপহিত। এই সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চ হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া ইহাকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় জাগ্রদ্‌বাসনাময় বলিয়া স্বপ্নাবস্থার অন্তর্গত। এই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল সূক্ষ্মভূতের ব্যষ্ট্যুপহিত

তৈজস চৈতন্যে ও ব্যষ্টিভূত সূক্ষ্মভূত সমূহ স্থূল শরীরাপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর বলিয়া কথিত। এবং বিজ্ঞান মায়াদি কোষত্রয় জাগ্রদ্‌বাসনা-ময় বলিয়া স্বপ্ন।

প্রথমতঃ ভূত সমূহকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অর্দ্ধকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিবে। এই বিভক্ত অংশগুলি স্ব-ব্যতিরিক্ত অন্য ভূতের অর্দ্ধেকের সহিত মিলাইতে হইবে। ইহারই নাম পঞ্চীকরণ। অপঞ্চীকৃত ভূত পঞ্চক পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ক্রমে আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতির গুণ। ইহাদের মধ্যে যে যে স্থানীয় তাহার তত গুণ অর্থাৎ আকাশের একটী গুণ শব্দ ; বায়ুর দুইটী গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; তেজের তিনটী গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; অপের চারিটী গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; এবং ক্ষিতির পাঁচটী গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। স্বকীয় গুণের প্রাধান্য হেতু ভূত সমূহকে তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট বলা হয়। এই পঞ্চীকৃত ভুতপঞ্চক হইতে ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্গত চতুর্বিধ স্থূল শরীর,[১] অন্ন ও পানাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈশ্বানর চৈতন্য এই চতুর্বিধ স্থূল শরীরের সমষ্টি দ্বারা উপহিত। এই চতুর্বিধ শরীরের সমষ্টিই তাহার স্থূল শরীর। এই সমষ্ট্যাত্মক স্থূল শরীর অন্নের বিকার বলিয়া অন্নময় কোশ এবং স্থূল ভোগের আয়তন বলিয়া জাগ্রদ্রূপে প্রসিদ্ধ। এই চতুর্বিধ স্থূল শরীরের ব্যষ্টি দ্বারা উপহিত বিশ্ব চৈতন্যের এই সমষ্টি স্থূল শরীর এবং অন্নবিকার বলিয়া অন্নময় কোশ নামে অভিহিত। স্থূল ভোগের আয়তন বলিয়া ইহা জাগ্রৎ। এপর্য্যন্ত অবস্থাত্রয়রূপ অধ্যস্ত প্রপঞ্চের কথা বলা হইল। অবস্থাত্রয়াবগাহী পঞ্চ কোশেরও সাধারণ বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। এখন এই কোশ সমূহের একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পাঁচটী কোশ। মাতা ও পিতার ভুক্ত অন্ন হইতে জাত শুক্র ও শোণিতের পরিণামরূপ যে আকার তাহার নাম অন্নময় কোশ। ইহা প্রারব্ধের ভোগায়তন। অপরিচ্ছিন্ন, জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকার বিবর্জ্জিত, ও তাপত্রয় বিরহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্নাদি গুণযুক্তের ন্যায় আপাদিত করে বলিয়া ইহার নাম কোশ

১। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।

অর্থাৎ আচ্ছাদক। পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়যুত প্রাণবিকার প্রাণময় কোশ নামে অভিহিত। ইহা ক্ষুৎপিপাসামনাদি রহিত আত্মাকে তদ্বন্তরূপে প্রকাশিত করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত বর্ত্তমান মনের বিকারের নাম মনোময় কোশ। ইহা সংশয়শোকমোহাদি বিরহিত আত্মাকে তদ্বন্তরূপেতে উপস্থাপিত করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত বর্ত্তমান বুদ্ধির বিকারের নাম বিজ্ঞানময় কোশ। ইহা কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানরহিত আত্মাকে তদ্বন্তরূপে আচ্ছাদিত করে। এই কোশই ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে এবং জীবরূপে অভিহিত হয়। প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ বৃত্তিযুক্ত, অজ্ঞান প্রধান, আনন্দের বিকার অন্তঃকরণ আনন্দময় কোশ নামে অভিহিত। এই পঞ্চকোশযুক্ত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরই প্রকৃত প্রস্তাবে জাগ্রদাদি তিনটী অবস্থা। সমষ্ট্যাত্মক কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর বন ও জলাশয়ের সহিত এবং ব্যষ্ট্যাত্মক কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর বৃক্ষ ও জলের সহিত তুলিত হইতে পারে। বৃক্ষ ও বন এবং জল ও জলাশয়ে যেরূপ ভেদ নাই সমষ্ট্যাত্মক ও ব্যষ্ট্যাত্মক শরীরও তেমনি অভিন্ন।

এইরূপে কারণব্যষ্টি ও কারণ সমষ্টি দ্বারা উপস্থিত ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞের; সূক্ষ্ম ব্যষ্টি ও সূক্ষ্ম সমষ্টুপহিত সূত্রাত্মা ও তৈজসের এবং স্থূল ব্যষ্টি ও স্থূল-সমষ্টি দ্বারা উপহিত বিশ্ব এবং বৈশ্বানরের অভিন্নতা বর্ত্তমান। বনের বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত আকাশ যেরূপ জলাশয়গত জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ হইতে অভিন্ন, এইরূপ ঈশ্বর প্রাজ্ঞাদিও পরস্পর অভিন্ন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনের সমষ্টি যেমন একটী মহাবন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের সমষ্টি যেমন এক মহা-জলাশয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম ও কারণ প্রপঞ্চের সমষ্টি এক মহাপ্রপঞ্চ। অথবা যেমন অবান্তর বনাবচ্ছিন্ন আকাশ এবং অবান্তর জলাশয়বচ্ছিন্ন প্রতি-বিম্বাকাশ একই মহাকাশ, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উপাধিযুক্ত ঈশ্বর হইতে বৈশ্বানর পর্য্যন্ত সকলই এক অভিন্ন চৈতন্য। অয়ঃ পিণ্ডোস্থিত অগ্নির ন্যায় মহৎপ্রপঞ্চোপহিত চৈতন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বমস্যাদি মহা-বাক্যের দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া থাকে।

তাদাত্ম্যাধ্যাসরহিত ব্রহ্মই নিত্য, নিরঞ্জন পরব্রহ্ম। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই

জীবের লক্ষ্য। ইহাকেই শ্রুতি "শিবং শান্তং চতুর্থম্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অবস্থাত্রয় রাহিত্যের নাম অপবাদ[২]।

কার্য্যসর্গ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে এবং প্রতিসর্গ (প্রলয়) স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পর্য্যবসিত হয়। অজ্ঞানাধ্যস্ত, রজ্জুবিবর্ত্ত সর্প যেরূপ জ্ঞানোদয়ে তিরোহিত হইয়া রজ্জু মাত্রে স্থিত হয়, অজ্ঞানাধ্যস্ত, ব্রহ্মবিবর্ত্ত জগৎও সেইরূপ জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মেতে পর্য্যবসিত হয়। প্রকৃত স্বরূপ হইতে অন্যত্বই বিকার এবং তত্ত্ববিরহিত অন্যত্বই বিবর্ত্ত বলিয়া খ্যাত[৩]। জগতের যে প্রকৃত সত্তা নাই, ব্রহ্ম সত্তাই যে জগৎ সত্তার প্রতিভাসক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর-বিগ্রহ-ভূত, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থারহিত-স্বরূপ, অবস্থাত্রয়হীন আত্মা অনধ্যস্ত ও অপবাদরহিত হইয়া নির্বিশেষ কেবল ব্রহ্ম মাত্রে স্থিত হন। এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই বিদেহমুক্ত বলিয়া কথিত। সহজ কথায় বলিতে গেলে দেহ অর্থাৎ সংসার বন্ধন। যাহার দেহ অর্থাৎ সংসার বন্ধন বিমুক্ত হইয়াছে তিনি বিদেহমুক্ত। কণ্ঠগত হারের বিস্মৃতির ন্যায় নিত্যপ্রাপ্ত স্বরূপের বিস্মৃতির নামই সংসার। শুদ্ধচৈতন্য, নিত্যব্রহ্মই নিজের স্বরূপ। সংসারী জীব এবং সর্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের দ্বারা বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ ও অবিরুদ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই জীবের স্বরূপ। বস্তু-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অনাদি সান্ত অবিদ্যাই স্বরূপবিস্মৃতিরূপ সংসারের কারণ।

এই অবিদ্যা কর্ম্মানুগ এবং ঈশ্বরানুশাস্য। কর্ম্ম কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ব্যাপারবিশেষ। এই কর্ম্ম প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মানভেদে ত্রিবিধ। পূর্ব্বশরীর সম্পাদিত ও বর্ত্তমান শরীরোপভোগ্য কর্ম্মের নাম প্রারব্ধ। পূর্ব্ব শরীরের দ্বারা সম্পাদিত কিন্তু বর্ত্তমান শরীরের দ্বারা অনুপভোগ্য কর্ম্মের নাম সঞ্চিত। বর্ত্তমান শরীর সম্পাদিত, উভয়বিধ

২। তৎসত্ত্বেতৎসত্ত্বাৎ তদসত্ত্বেতদসত্ত্বাচ্চ অপবাদো নাম।

৩। "সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

কর্ম্মের নাম ক্রিয়মাণ। এই কর্ম্ম আবার নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তভেদে পঞ্চবিধ। যাহা না করিলে পাপ হয় তাহার নাম নিত্য, যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি। বুদ্ধি শুদ্ধির নিমিত্ত পুত্রজন্ম, গ্রহণ প্রভৃতি নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া জাতকর্ম্ম ও স্নানদানাদি যাহা করা হয় তাহার নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কোন কিছুর কামনা করিয়া যাহা করা হয় তাহার নাম কাম্য, যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি। যাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা নরক-গমনাদিরূপ অনিষ্ট সংসাধিত হয় তাহার নাম নিষিদ্ধ, যেমন ব্রাহ্মণ-হননাদি। পাপক্ষয়মাত্র সাধন চান্দ্রায়ণাদির নাম প্রায়শ্চিত্ত।

নিত্য, নৈমিত্তিক, ফলানপেক্ষ্য কাম্য এবং পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম ও অনুষ্ঠেয়, অন্য সকল কর্ম্ম বর্জ্জনীয়। বিহিত কর্ম্মদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। সাধক বিশুদ্ধান্তঃকরণে দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে শমদমাদি সাধনের অভ্যাস করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে আর কর্ম্ম করার আবশ্যকতা থাকে না। অতএব ভাগবতে উক্ত হইয়াছে "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥"

বেদে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, এই ত্রিবিধ কাণ্ড রহিয়াছে। চিত্ত বিশুদ্ধির জন্য কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন। উপাস্যনিষ্ঠ চিত্তৈকাগ্রতা অর্থাৎ ভক্তি উৎপাদনের জন্য উপাসনা কাণ্ডের প্রয়োজন। প্রারব্ধাদি কর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্যকতা। কর্ম্মের প্রকার পূর্ব্বে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে উপাসনার স্বরূপ ও তাহার ফল সংক্ষেপে বলা হইতেছে। সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপারের নাম উপাসনা, যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যাদি। উপাসনা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গভেদে দ্বিবিধ। সুবিধার নিমিত্ত উপাসনাকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—সম্পৎ, আরোপ, সম্বর্গ এবং অধ্যাস। তাই উক্ত হইয়াছে—"সম্পদারোপ সম্বর্গাধ্যাসা ইতি মনীষিভিঃ। উপাসাবিধয়স্তত্র চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ[৪]।" নিত্যাদি কর্ম্ম এবং উপাসনা এই উভয়েরই ফল

৪। কেহ কেহ উপাসনাকে, অহংগ্রহ, অপ্রতীক, প্রতীক, সম্পৎ, সম্বর্গ, যজ্ঞাঙ্গ ও কর্ম্মাঙ্গ ভেদে সাত প্রকার বলিয়া থাকেন। উপাস্য পরমাত্মার আত্ম-অভেদে উপসনার

পিতৃদেবলোকাদি প্রাপ্তি। শ্রুতি বলিতেছেন—"কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ।" গীতার মতে অনিষ্ট. ইষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল। কর্ম্মভোগপর্য্যবসায়ী বলিয়া সংসার বন্ধনের কারণ। অতএব প্রারব্ধাদি কর্ম্মক্ষয় অবশ্য কর্ত্তব্য। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই ইহা সম্ভব। ভগবান্ বলিয়াছেন—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন! অপিচ—ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" এই শ্রুতির বলে কর্ম্মের দ্বারাও কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্মের আত্যন্তিকক্ষয় একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। এই মর্ম্মে স্মৃতিতে আছে—"কর্মণা কর্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিকঐষ্যতে। অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তস্বিমর্শনম্॥" এখন অবিদ্যার ক্ষয় কি করিয়া করিতে পারা যায় তাহাই কথিত হইতেছে। জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়। স্মৃতি বলিতেছেন—"বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ।" অতএব দেখা যাইতেছে জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম ও অবিদ্যা উভয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্মানুযায়ী অবিদ্যা হইতে সংসার হয় বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা সংসারও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সংসারনিবৃত্তিই মুক্তি।

নাম অহংগ্রহ উপাসনা অর্থাৎ আমিই পরমাত্মা এই যে পরমাত্মাতে আমিত্বের অধ্যারোপ ইহারই নাম অহংগ্রহ উপাসনা। শ্লোকে উল্লিখিত অধ্যাসই এই অহংগ্রহ। এই অহংগ্রহ উপাসনা আবার সগুণ, নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। পর্য্যঙ্ক বিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোসল বিদ্যা, মধু বিদ্যা, শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মের বিকারোপাসনা অপ্রতীক উপাসনা বলিয়া খ্যাত। শ্লোকের আরোপ উপাসনাই এই অপ্রতিক উপাসনা। নাম রূপ প্রভৃতি উপাসনার আলম্বনের নাম প্রতীক। শীলাতে বিষ্ণু দর্শন. আদিত্যে ব্রহ্ম দর্শন প্রভৃতি প্রতীক উপাসনা। যথা কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য হেতু উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর অভেদ জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা তাহার নাম সম্পৎ উপাসনা। মনোবৃত্তি অসংখ্য, বিশ্বেদেবও অসংখ্য, সুতরাং মনকে বিশ্বেদেব কল্পনা করিয়া যে উপাসনা তাহা সম্পৎ উপাসনা। ক্রিয়ার সাদৃশ্যে অভেদ জ্ঞান করিয়া উপাসনার নাম সম্বর্গ উপাসনা। সংহার ক্রিয়া সামান্যে বায়ু ও প্রাণের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া উপাসনা করার নাম সম্বর্গ উপাসনা। প্রণব প্রভৃতি আলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করার নাম যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা। হবিঃসংস্কার যেরূপ যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ, সেইরূপ আত্মার সংস্কারের জন্য তাহাকে ব্রহ্মভাবে অনুধ্যান করার নাম কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা।

ভট্টৈকদেশী ও প্রভাকর মতাবলম্বীগণ নিষ্কাম কর্ম্মই মুক্তির সাধন বলিয়া বলেন। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি কর্ম্মসমুচ্চিত উপাসনাকে মুক্তির সাধন বলেন। নিরুক্তৈকদেশিগণ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কেই মুক্তির সাধন বলিয়া থাকেন। এই সকল আচার্য্যগণ নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা গূঢ় বেদার্থ এইরূপ বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কর্ম্মাদি নিরপেক্ষ জ্ঞানই মোক্ষসাধন। কৈবল্যোপনিষৎ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"জ্ঞাত্বাতং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।" স্মৃতিতেও আছে—"জ্ঞানাদেবামৃতত্বং নহি শশকবধূঃ সিংহপোতং প্রসূতে।"

রজ্জুবিবর্ত্ত সর্প যেরূপ রজ্জুজ্ঞান বিনা মন্ত্র ও ওষধি প্রভৃতির প্রয়োগে বিনিবৃত্ত হয় না ব্রহ্মবিবর্ত্ত প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধির হেতু কর্ম্ম ও উপাসনা পরম্পরাক্রমে মোক্ষ আনয়ন করে কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। জ্ঞান হইতেই সাক্ষাৎ মোক্ষ হয়।

এই জন্মে এবং জন্মান্তরে বেদবেদাঙ্গাদির অধ্যায়ণ জ্ঞানের প্রথম সোপান। তৎপর সাধক নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিবে। এক মাত্র ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, তদ্ব্যতীত প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত পদার্থ সমূহ অনিত্য। তৎপর ইহকাল ও পরকালে ফলভোগ হইতে বিরত হইতে হইবে। এই পৃথিবীতে স্রক্, চন্দন, বনিতা প্রভৃতির দোষ দর্শন করিয়া এবং পরকালে নন্দনকাননবিহার ও রম্ভা প্রভৃতির সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া বিষয় ভোগে বীততৃষ্ণ হইতে হইবে। অনন্তর বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের ন্যায় মনের ও নিগ্রহ করিতে হইবে। কর্ম্মের সংন্যাস, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, লক্ষ্যে চিত্তের ঐকাগ্র্য, এবং গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসরূপ সাধন সম্পত্তি আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহারাই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা নামে অভিহিত। তৎপর কি করিয়া আমার এই নানা দুঃখবহুল শরীর হইতে মোক্ষ হইবে, কখন আমার মোক্ষ হইবে, এইরূপ তীব্র ইচ্ছার উদ্রেক করিতে হইবে। ইহারই নাম মুমুক্ষুত্ব। সর্বশেষ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধিরূপ সাধন অবলম্বন করিবে।

সমুদয় বেদান্ত বাক্যের অদ্বয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণের নাম শ্রবণ। শ্রুত অদ্বয় ব্রহ্মের বেদান্তের অবিরোধী যুক্তির দ্বারা নিরন্তর ভাবে চিন্তনের নাম মনন। বিজাতীয় দেহ হইতে অহংত্ব পর্য্যন্ত জড়বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের

নিরোধপূর্ব্বক সজাতীয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়ের প্রবাহীকরণের নাম নিদিধ্যাসন। ব্যুত্থান ও নিরোধসংস্কারের অভিভব ও প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত চিত্তের একাগ্রতারূপ পরিণামের নাম সমাধি।

সমাধি সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে দ্বিবিধ। চিত্তের নিরোধ পরিণামকে বিকল্পরহিত বা নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়। এখানে সমাধি শব্দের অর্থ যোগ।

হঠযোগ ও রাজযোগ ভেদে যোগ দ্বিবিধ। রাজযোগরূপ সৌধে আরোহণ করিবার জন্য হঠযোগ সোপানরূপে পরিকল্পিত। হঠযোগ ও রাজযোগকে সাধন ও সিদ্ধিরূপ মনে করিতে হইবে। সিদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে সাধনের অভ্যাস নিষ্ফল। আবার সাধন বিনা সিদ্ধি প্রাপ্তি অসম্ভব। এই জন্যই স্বাত্মারাম বলিয়াছেন—হঠম্বিনা রাজযোগো রাজযোগম্বিনা হঠঃ। পূর্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা নিখিল প্রপঞ্চের লয় হইলে স্বস্বরূপাবস্থানরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মুক্তি হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ শোধনোপযোগি ব্যাপারপূর্বক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে মুক্তি দ্বিবিধ। এক্ষণে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তির ভেদ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। প্রারব্ধ শরীর বর্ত্তমান থাকা কালীন দেহ হইতে অহংত্ব পর্য্যন্তের অভিমান রহিত হইয়া নির্বিশেষ কেবল ব্রহ্মরূপে যে স্থিতি, যাহাতে ঘট প্রস্তুত হওয়ার পরেও কুলাল চক্রের ভ্রমণের ন্যায় প্রারব্ধপ্রবৃত্ত শরীর যাত্রার অনুকূল প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নাম জীবন্মুক্তি। প্রারব্ধের অবসানে স্বীয় কল্পিত সমুদয় প্রপঞ্চের বিনাশপূর্বক নির্বিশেষ কেবল ব্রহ্মরূপে স্থিতির নাম বিদেহ-মুক্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে বিদেহমুক্ত সংসারীদের নিকট মৃত, জীবন্মুক্তেরাই তাহাদের উপদেষ্টা বলিয়া বেশী উপকারক।

উপনিষদের আলোচ্য বিষয়

২

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস্।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী।[১] দার্শনিক হিসারে এই যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতি ছিল সুদূর-প্রসারী। বাস্তবিক বল্‌তে কি উপনিষদের যুগে তাঁর মত নামকরা দ্বিতীয় দার্শনিক আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি ঠিক করলেন যে তিনি প্রব্রজিত হবেন। সেই কারণে তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বল্‌লেন যে তিনি প্রব্রজন কর্‌বেন ঠিক করেছেন, অতএব তাঁর যা সম্পত্তি আছে তা তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে যেতে চান। এ দিকে মৈত্রেয়ী ছিলেন বাস্তবজীবনে উদাসীন এবং পরাবিদ্যায় আসক্ত। তাই তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন—যদি এই সমগ্র পৃথিবী বিত্তে পরিপূর্ণ হয়ে আমার হত তা হলে কি আমি অমৃতা হতাম? তিনি উত্তর দিলেন যে তা কখনই হয় না, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা আদৌ নাই তখন মৈত্রেয়ী যে দৃপ্ত বাক্যটি বলেছিলেন সেই উক্তিটিই আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি বল্‌লেন—"যা পেয়ে আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কি কর্‌ব? আপনি যা জানেন তাই আমাকে বলে যান।"[২] তা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং মোটামুটি তাঁর যা দার্শনিক মত তাই তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। সে বিষয় আমরা যথাস্থানে আলোচনা কর্‌ব। মোটামুটি এখনেও আমরা সেই নচিকেতার বাণীর সমর্থন পাই। মৈত্রেয়ীর মত সংসারবাসিনী নারীও মানুষের তৃপ্তি পার্থিব ভোগবিলাসে হয় না কিন্তু পরাবিদ্যা আহরণেই হয় এ তথ্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে প্রিয়বাদিনী বলে পরিগনিত হয়েছিলেন।

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

২। যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে বিব্রূহীতি॥ বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৪

এই সুন্দর গল্প হতে আমরা সহজেই ধারণা করে নিতে পারি যে সেকালে পরাবিদ্যার কত বেশী আদর ছিল। পার্থিব ভোগ বিলাসের মোহ, ব্যবহারিক জগতে যা কাজে লাগে এমন বিদ্যার আকর্ষণ, এমন কি যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যাপারের দাবীও সে কালের মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতেন, পরাবিদ্যাকে বরণ করে নেবার জন্য। নিছক জ্ঞানলাভের জন্যই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। যে জ্ঞানের কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা নাই কিন্তু যে জ্ঞান সৃষ্টির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে আমাদের সাহায্য করবে সেই জ্ঞানই তাঁদের কাছে বরণীয়তম ছিল।

এখন তা হলে আমরা মোটামুটি এই ধারণা করতে সমর্থ হয়েছি যে পরাবিদ্যাই উপনিষদের মূল এবং একমাত্র আলোচনার বিষয়। এই পরাবিদ্যা অর্থে আমরা যাকে আজকাল দার্শনিক বিদ্যা বলি সাধারণভাবে তাই বোঝায়। সমগ্র বিশ্বের যা মূলগত বস্তু তার আলোচনা করা, তার স্বরূপ কি, তার সৃষ্টি হয় কিরূপে ইত্যাদি বিষয়ই হল দর্শনের সাধারণ আলোচনার বিষয়। পরাবিদ্যার অর্থও তাই। সৃষ্টির মৌলিক বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা এবং তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহই হল পরাবিদ্যা সঞ্চয় করা। এখন যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা বিশেষ করে উপনিষদ্‌গুলিতে আলোচিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

দর্শনের আলোচনার বিষয় হল সমগ্র সত্য[৩] অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি। এইখানেই দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের পার্থক্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন সৃষ্টির এক একটি বিশিষ্ট অংশ নিয়ে এবং সেই বিশিষ্ট অংশের বস্তুনিচয়ের সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করেন তাকেই সুসংবদ্ধ আকারে প্রকাশ করেন। যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধেই জ্ঞান আহরণ, রসায়নশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল মৌলিক বস্তু ও তাদের মিশ্রণে যে মিশ্র বস্তুগুলি গঠিত হয় তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা। দর্শনের আলোচনার বিষয় বলতে জগতের কিছু বাদ পড়ে না, সমস্ত বিষয়ই এক ভাবে না একভাবে

৩। সত্য শব্দটি দার্শনিক পরিভাষায় যাকে reality বলে তার সমর্থবোধক হিসাবে ব্যবহার করা হল। উপনিষদে ইহা এই অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সত্যের অর্থ মিথ্যার উল্টো নয়, কারণ ব্রহ্মকে সত্য এবং মিথ্যা দুই বলেও নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

তার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ে। অবশ্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে একত্র করলেই আমরা দর্শন পাই না। সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে বিশ্বের মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংবদ্ধ আকারে জ্ঞান আহরণ করাই হল দর্শনের বিশেষ কর্ত্তব্য।

উপনিষদে এই মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা আমরা যথেষ্ট পাই এবং তাই হল তাকে দর্শন বলে গ্রহণ করবার সব থেকে বড় কারণ। উপনিষদের মধ্যে তাদের আলোচনা সুসংবদ্ধ আকারে পাবার আশা আমরা আদৌ করতে পারি না। সেই প্রাচীন যুগে বৈজ্ঞানিক ধরণে আলোচনার পদ্ধতি প্রচার লাভ করে নি। এক কথায় বলতে গেলে তখন ছিল মানব সভ্যতার শৈশবের যুগ, তখন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় নি। উপনিষদ্‌কার যে আলোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা কোন বিশেষ পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা সংবদ্ধ নয়। উপনিষদ্‌গুলি একই মনীষীর রচিত নয় বা অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। তার কারণ এই যে তার উৎপত্তি বেদের এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণের অংশ হিসাবেই। সেই কারণেই অনেক উপনিষদে যাগ যজ্ঞাদির আলোচনার কথাও আমরা বহুল পরিমাণে পাই। সব থেকে বড় এবং প্রাচীন যে দুখানি উপনিষদ্ আছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—তাদের উভয়েরই বহুল পরিমাণ অংশ আমরা এই যজ্ঞ উদ্‌গীথ ইত্যাদির আলোচনায় পরিপূর্ণ দেখতে পাই। তারই মাঝখানে কোন কোন ঋষি সুগভীর চিন্তা ও সাধনার ফলে কোন মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে যখন কোন জ্ঞান আহরণ করেছেন তখন তাকে উপনিষদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই ভাবেই উপনিষদের মধ্যে নানা তত্ত্বের আলোচনা খণ্ড খণ্ড আকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আমরা পেয়ে থাকি। সেইগুলিকে সংগ্রহ করে পরস্পর সুসংবদ্ধ আকারে গ্রথিত করলে তবেই আমরা তাকে একটি বিশেষ দার্শনিক মতের আকার দিতে সমর্থ হব। এই রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য হল সেই প্রচেষ্টা করা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিশেষ বিষয় হল উপনিষদে যে সমস্ত মৌলিক সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া। এখন সেই বিবরণ আরম্ভ করবার উপযুক্ত সময় হয়েছে।

উপনিষদে প্রথমতঃই একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে জ্ঞানের

আকাঙ্ক্ষা সব থেকে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে সেই বিষয়টি সম্পর্কে যাকে জানা হয়ে গেলে আর কিছু জানবার থাকে না। মোটামুটি একেবারে নিছক সত্যটি, নামরূপের অতীত সত্যের আসল রূপটি আবিষ্কার কর্‌বার আগ্রহই সব থেকে বেশী। এ আগ্রহের গভীরতা উপনিষদে প্রচলিত প্রার্থনার বাণীতে আমরা বেশ উপলব্ধি কর্‌তে পারি। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।"

সত্যের মুখকে অনাবৃত করে তার আসল রূপটীকে জান্‌বার ব্যাকুলতাই এই প্রার্থনাটির মর্ম্মকথা। সত্যের মূলতম প্রকাশটির নাগাল পাওয়াই এই তীব্র আগ্রহের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। সেই জন্যই আমরা দেখি উপনিষদ্ বলেন ঋগ্‌বেদ যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি অপরাবিদ্যা আহরণ কর্‌লেই সব জানা হল না। তা হল বাহিরের জিনিষ, অন্তরের নয়। এমন সত্যকে উপলব্ধি কর্‌তে হবে যাকে জানা হয়ে গেলে আর কিছু জান্‌বার থাকবে না, আর সকল জিনিষ আপনিই জানা হয়ে যাবে। যেমন মাটীতে গড়া সকল জিনিষের উপাদান কারণ মাটীকে যখন চেনা হয়ে যায়, তখন মাটীতে নির্ম্মিত সকল বস্তু সম্বন্ধে আসল তত্ত্বটীর জ্ঞান সঞ্চয় করা হয়ে যায়। তেমনি এই দৃশ্যমান বিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের সকলের মূলগত কারণ যা, উপাদান যা, তাকে জানা, তাকে উপলব্ধি করা, তাই হল উপনিষদের আকাঙ্ক্ষা। ছান্দোগ্য উপনিষদের দুই স্থলে দুটী ছোট গল্পের ভিতর দিয়ে এই কথাটিকে অতি সুন্দরভাবে বুঝান হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা পাই যে আরুণির পুত্র ছিলেন শ্বেতকেতু। পিতা ছিলেন বিশেষ পণ্ডিত তাই তাঁর আদেশে পুত্র শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষকাল গুরুগৃহে থেকে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করে গর্ব্বিত হয়ে পিতার কাছে ফিরে এলেন। তখন তাঁর পিতা তাঁকে প্রশ্ন কর্‌লেন—"গুরুর কাছেত সব শিক্ষা করে পণ্ডিত হয়ে এসেছ, তাঁকে কি সেই আদেশটী জিজ্ঞাসা করেছিলে?" পুত্র ত সে কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন, সেই আদেশের অর্থ পিতার নিকটই জান্‌তে চাইলেন। তখন পিতা তাকে বুঝালেন যে যাকে জান্‌লে অজ্ঞাত কিছু

থাকে না, যাকে শুন্‌লে অশ্রুত কিছু থাকে না তাই হল 'আদেশ'। অর্থাৎ সকল বস্তুর সকল বিষয়ের সম্বন্ধে যা মূলগত তত্ত্ব তাই হল 'আদেশ'। সেই মূলগত তত্ত্বের জ্ঞান ভিন্ন সকল শিক্ষাই অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। আরও তিনি উপমা দিয়ে এই কথাটী বুঝালেন। তিনি বললেন লৌহকে চেনা হয়ে গেলে যেমন যা কিছু লৌহনির্ম্মিত বস্তু আছে তাদের চেনা হয়ে যায়, তাদের যে রূপের বিভিন্নতা তা কেবল নামেতেই এবং মানুষের চিন্তাধারাতেই সে নামের উৎপত্তি, লৌহত্বই তাদের সম্বন্ধে মূল সত্য। তেমনি হল সেই আদেশ। সুতরাং আদেশের এখানে একটী বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে। তার অর্থ এই যে সমগ্র সৃষ্টির সম্বন্ধে যা মূলগত তত্ত্ব তারই নির্দ্দেশ।

এই মূলগত তত্ত্বের জ্ঞান যে বিদ্যা দিতে পারে তাই হল খাঁটী পরাবিদ্যা, আর সকল বিদ্যাই বাহ্যিক তাদের বাহাদুরী কেবল মাত্র শব্দ যোজনা দিয়েই। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভেই আমরা পাই যে নারদ মুনি একদিন ঋষি সনৎ কুমারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ কর্‌লেন যে তাঁকে পড়াতে হবে। তখন সনৎ কুমার বললেন যে তা বেশ উত্তম প্রস্তাব, তবে কতদূর অবধি নারদ পড়েছেন সেটা বলে দিলে সুবিধা হবে, তিনি তার পর থেকে পড়াবেন। নারদ তখন যত বিদ্যা অর্জ্জন করেছিলেন তার যা লম্বা তালিকা দিলেন তা হল এই ঃ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব, ইতিহাস, পুরাণ, পিতৃ-পুরুষ সম্বন্ধে বিদ্যা, দেবতা সম্বন্ধে বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষাকল্পাদি), ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন সনৎকুমার বললেন যে তুমি এ পর্য্যন্ত যা পড়েছ সব কিছুই হল নাম। অর্থাৎ এই সকল অপরা বিদ্যা তাঁকে আসল মূল তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারে নি, তারা কেবল বাহিরের বিদ্যা। সেই মূলগত তত্ত্ব কি তার অনুসন্ধানে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেছেন। সে বক্তৃতায় তিনি সেই মূলগত তত্ত্বের অন্বেষণে বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়কে পরীক্ষা করে যে বিষয়টী সবার মূলে আছে বলে নির্দ্দেশ করেছেন তা হল 'ভূমা'। এই ভূমাই হল সবার মূলে এবং তাকে জান্‌লেই বিশ্বের মূল সত্যকে জানা হয়ে যায়।[৪]

৪। ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥
ছান্দোগ্য ।।৭।।২৩

এই ভূমা হল আর কিছুই নয়, ইহা হল যা সব থেকে বড়, সব থেকে বিরাট, যা সকল বস্তু এবং বিষয়ের আধার তাই। ভূমা শব্দের ধাতুগত অর্থই হল:তাই। অপর পক্ষে আমরা দেখি 'ভূমা'র যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হতে অনায়াসে এই ধারণা করা যায় যে উপনিষদ্‌কার ব্রহ্ম অর্থে যা বুঝেন ভূমার অর্থও.তাই। এদিকেও এটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ব্রহ্মের ধাতুগত অর্থও হল যা অতি বৃহৎ তাই, অর্থাৎ উভয় শব্দেরই অর্থ এক। পারিভাষিক অর্থও যে উভয়েরই এক তাও একটি উদাহরণ দিলে বেশ সহজেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। ব্রহ্ম যে উপনিষদ্-দর্শনে সর্ব্ব বস্তু ও সর্ব্ব বিষয়ের মূল এবং অবলম্বন তাতে কোথাও মতদ্বৈধ নাই। যা কিছু আছে তা.সমস্তই ব্রহ্ম, ·তাতেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এই হল উপনিষদের মূল বাণী[৫] অপর পক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভূমার যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা এই একই অর্থে। ভূমা হল তাই যা সকল বিষয়ের আধার স্বরূপ। "তাই হল নীচে, তাই উপরে, তাই পশ্চাতে, তাই সামনে, তাই দক্ষিণে, তাই উত্তরে—তাই হল বিশ্বে যা কিছু আছে সমস্ত।"[৬] সুতরাং যাকে ভূমা বলা হয়েছে এবং যাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে উভয়েই যে এক তাতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

এই ব্রহ্ম শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে এবং এই একই অর্থে আর একটি শব্দেরও বহুল পরিমাণে ব্যবহার আমরা উপনিষদে পেয়ে থাকি। এই শব্দটি হল 'আত্মন্'। এই আত্মা শব্দের পরবর্ত্তী কালে এবং এখন একটা বিশেষ অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে তা ব্যক্তি বিশেষের আত্মাকে (ইংরেজী পরিভাষায় যাকে Soul বলে তাকেই) নির্দ্দেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে আবার আত্মন্ শব্দকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং মানুষের আত্মাকে নির্দ্দেশ কর্তে তাকে জীবাত্মা বলা হয় এবং ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ কর্তে তাকে পরমাত্মা বলা হয়। উপনিষদে কিন্তু তার একটু ব্যতিক্রম ঘটেছে। এইটা বিশেষ করে মনে রাখবার বিষয় যে

৫। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৩।১৪।১

৬। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি। ছান্দোগ্য॥৭।২৫।১॥

আত্মন্ শব্দে সাধারণতঃই সেখানে ব্রহ্ম অভিহিত হয়ে থাকেন। ব্রহ্ম ও আত্মা প্রতিশব্দরূপে ব্যবহারের বহু উদাহরণ আমরা উপনিষদে পাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা পাই—উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করছেন —যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষচৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তরস্থ আত্মা, তাই আমাকে বুঝিয়ে দিন।[৭] অন্যত্র এই উপনিষদেই আমরা পাই মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।"[৮] ছান্দোগ্য উপনিষদেও আমরা এইরূপ আত্মা ও ব্রহ্মের একই অর্থে ব্যবহার দেখিতে পাই। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে মহাশ্রোত্রিয়গণ এসে মীমাংসা করতে প্রবৃত্ত হলেন "কো নু আত্মা কিং ব্রহ্মেতি।"[৯] মাণ্ডূক্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে বিবেকীরা ব্রহ্মকে চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় মনে করিয়া থাকেন; তাঁকেই আবার আত্মা বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে।[১০] সুতরাং উপনিষদের মতে আত্মা বা ব্রহ্ম হলেন বিশ্বের মূলগত তত্ত্ব এবং তাঁর সম্যক্ উপলব্ধি হল উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মোটামুটী দার্শনিক আলোচনায় যে সকল বিষয় সাধারণতঃ আলোচিত হয় এবার তাদের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয়েছে। তা হলে পরে সেই দার্শনিক বিষয়গুলির কোন্ কোন্টী উপনিষদে আলোচিত হয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা করবার আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। দার্শনিক সমস্যাগুলিকে সাধারণতঃ দুটী প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে – প্রথম যা কিছু সত্য, যা কিছু ভাব বা অভাব পদার্থ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন; এ সম্বন্ধে জ্ঞানকে আমরা তত্ত্ববিজ্ঞান (Ontology) বলতে পারি। দ্বিতীয়, জ্ঞান সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগতে পারে; এ বিষয়ে জ্ঞানকে আমরা প্রমাবিজ্ঞান (Epistemology) এই আখ্যা দিতে পারি। এই দুই শ্রেণীর সমস্যাগুলির আর একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলে বোধ হয় সুবিধা হবে।

৭। অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্ব ইতি ॥ বৃহদারণ্যক ৩।৪।১

৮। বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫

৯। ছান্দোগ্য, ৫॥১১॥১

১০। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ মাণ্ডূক্য, ৭

পদার্থ সম্পর্কিত প্রশ্ন সাধারণতঃ দুটী হয়ে থাকে—প্রথম বাস্তব জগতের সৃষ্টি হল কিরূপে? এখানে বাস্তব জগত অর্থে জড় এবং চেতন সকল পদার্থকেই ধর্তে হবে। দ্বিতীয় তাদের প্রকৃতি ও গঠন কিরূপ? তারা মূলে এক না বহু, তারা চেতন না অচেতন পদার্থ? এই প্রথম প্রশ্নটীর যা আলোচনা সম্ভব তাকে দার্শনিক পরিভাষায় সৃষ্টিতত্ব (Cosmogony) বলা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটী সমাধানের যে চেষ্টা তাকে বিশ্ববিজ্ঞান (Cosmology) এই পারিভাষিক নাম দেওয়া যেতে পারে। মোটামুটী দেখা যেতে পারে যে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন মূলতঃ এই দুই ধরণেরই হতে পারে। অপর পক্ষে দার্শনিক আলোচনার কতক অংশ জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়েই হয়ে থাকে। এই জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন নানারূপ হতে পারে। জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়. জ্ঞানের সামগ্রী কি কি, জ্ঞান অর্জ্জনের সব থেকে উপযোগী পদ্ধতি কি কি হতে পারে ইত্যাদি। এই জাতীয় সকল প্রশ্নকেই প্রমাবিজ্ঞানের বিষয় বলে আমরা নির্দ্দেশ কর্তে পারি। সকল দার্শনিক আলোচনার প্রধান বিষয় হল এই সমস্যাগুলি। এখন উপনিষদে এই সমস্যাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী আলোচিত হয়েছে তারই পরিচয় আমরা এখানে দেব।

এই বিশ্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন সর্ব্বপ্রথম মানুষের মনে স্বতঃই এবং স্বভাবতঃই জাগে তা হল এই যে এই সৃষ্টি কি করে হল, সৃষ্টির ধারা কিরূপ? এই প্রশ্ন বোধ হয় যে কোন মানুষ বিশ্ব সংসার সম্বন্ধে একটু ভাবতে চেষ্টা করে তার মনেই সর্ব্বপ্রথম জাগে। সুতরাং মানব দর্শনের ইতিহাসে এই প্রশ্নটীই যে সর্ব্বপ্রথম জেগেছিল তা দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। ঋগবেদ যদিও প্রধানতঃ নানা দেবদেবীর স্তুতিতে পরিপূর্ণ তার শেষ ভাগে, বিশেষ করে দশম মণ্ডলেই আমরা দেখি যে ঋষি কবিরা কেবলমাত্র নানা দেবদেবীর স্তব রচনা করেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা সময় সময় নানা দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা কর্ছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে প্রশ্নের সমাধান করবার ইচ্ছায় উত্তরও দিতেছেন। উদাহরন স্বরূপ এই সম্পর্কে দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তের উল্লেখ আমরা কর্তে পারি। পুরুষ সূক্তই মানুষের প্রথম দার্শনিক গবেষণার উদাহরণ। এই ঋগ্‌বেদের মধ্যেই আমরা দেখি যে ঋষির মনে এই সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে।

এই সম্পর্কে আমরা একটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। শ্লোকটি এইরূপ—

ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গং বেদ যদি বা ন বেদ ॥[১১]

শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ—এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।

পশ্চিম দেশেও আমরা দেখি যে দার্শনিকের মনে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথম যে প্রশ্ন জেগেছিল তাও ঠিক একই। গ্রীশ্ দেশেই পাশ্চাত্য দর্শনের জন্ম হয়। এ দেশের আদিম দার্শনিক হলেন থেলেস্, এনেক্সিম্যাণ্ডার, এনেক্সি-মেনেস প্রভৃতি। দেখবার বিষয় এই যে তাঁদের দার্শনিক আলোচনা এই সৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশেই সীমাবদ্ধ। কেউ ঠিক কর্‌লেন জল হতেই সকল বিশ্বের উৎপত্তি, কেউ বল্‌লেন বায়ু হতেই সকল জিনিষ উদ্ভূত হয়েছে, কেউ বা বল্‌লেন বিশ্বের সকল বস্তুর আদিমতম রূপ হল অগ্নি।

উপনিষদের দার্শনিক আলোচনাতেও আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রশ্ন একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে এবং তা উপনিষদের আলোচনাগুলির একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। একাধিক উপনিষদে আমরা এই প্রশ্নের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাই এবং সমাধানের চেষ্টাও দেখতে পাই।

১১। ঋগ্‌বেদ—১০৷১২৯৷৭

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 'দর্শনের' দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক-মণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদের মনে বিশেষ আনন্দ ও আশার উদ্রেক হইয়াছে। দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ে অনুরাগসম্পন্ন সাধারণ পাঠকবর্গও যে এই পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বহু গণ্যমান্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তি পরিষদের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে সাধারণ পাঠকপাঠিকার সংখ্যা অত্যল্প নহে। প্রথম সংখ্যার সব খণ্ডই বিতরিত বা বিক্রীত হইয়া যাওয়ার পর যে সব বিদ্বজ্জন একখণ্ড পত্রিকার জন্য আমাদের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি এবং তাঁহাদের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। এ ত্রুটী আমাদের ইচ্ছাকৃত নহে এবং বর্ত্তমান সংখ্যা সম্বন্ধে যাহাতে তাহা পুনরায় না ঘটে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে মনে হয় 'দর্শন' পত্রিকা শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের একটি চিরানুভূত ও সুস্পষ্ট অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইবে। সমালোচনামুখে এ সব পত্রিকায় 'দর্শনের' উন্নতিসাধনকল্পে যে সকল সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সাদরে গৃহীত ও অনুসৃত হইবে। আশাকরি দর্শনানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রেই এই পত্রিকার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে বাধিত ও কৃতার্থ করিবেন।

* * *

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার মহামহোপাধ্যায় ডক্টর স্যার গঙ্গানাথ ঝা বিগত কার্ত্তিক মাসের ২৩শে তারিখে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিশারদের মৃত্যুতে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের যে গুরুতর ক্ষতি

হইল তাহা সুদূর ভবিষ্যতেও পূরণ হইবার আশা কম। ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা তাঁহার ছাত্রজীবনের প্রথমভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স ও এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম.এ পাস করিবার পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট এবং এল-এল. ডি উপাধি লাভ করেন। প্রথমোক্ত উপাধিলাভের সময়েই তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি কয়েক বৎসর দ্বারভাঙ্গা রাজগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাহার পর বহুবৎসর যাবৎ এলাহাবাদের মুইর কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে কাজ করেন। তারপর তিনি বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বৎসর ঐ পদে বিশেষ দক্ষতার সহিত কাজ করেন। তৎপরে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেচারের পদে উপরর্যুপরি তিনবার নির্ব্বাচিত হন এবং উক্ত কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি "কমলা লেক্চার" প্রদান করেন এবং তাঁহার ঐ বক্তৃতাবলী "ফিলজফিক্যাল ডিসিপ্লিন্" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে "সাধোলাল লেক্চার" প্রদান করেন এবং ঐ বক্তৃতাবলী 'গৌতমের ন্যায়দর্শন' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত "প্রভাকর স্কুল অব্ পূর্ব্ব-মীমাংসা" নামক গ্রন্থখানি মৌলিক তথ্যপূর্ণ এবং সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তিনি ভারতীয় দর্শনের পঠনপাঠন ও প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্লোকবার্ত্তিক, জৈমিনির মীমাংসাসূত্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ন্যায়সূত্র, ভাষ্য ও বার্ত্তিক, পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ ও ন্যায়কন্দলী প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁহার যে সব অমূল্য অবদান আছে তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ও কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধেয় কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত অগ্রহায়ণ মাসের ১৯শে

তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের এক প্রাচীন পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোকগত রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান্ ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজী, দর্শন ও সংস্কৃত এই তিনটি বিষয়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের কাম্য অথচ সুদুর্লভ 'জন্ লক্' বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য যে সব ভারতবাসী অদ্যাবধি অক্সফোর্ডে গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র। গ্রীক্, ল্যাটিন্ ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে ব্যবহারজীবীর কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ বিভাগে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনায় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রীক্ সাহিত্য ও দর্শনের জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁহার নিকট যে আলোক ও সদুপদেশ পাওয়া যাইত তাহা আর অন্যত্র পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। তাঁহার চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সহিত সরলতার যে অপূর্ব্ব সমাবেশ আমরা দেখিয়াছি তাহা খুব কম স্থানেই দেখা যায়। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকাচ্ছন্ন পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের প্রবীণতম সদস্য মান্যবর প্রকাশচন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগীশ মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ২০শে কার্ত্তিক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদ্ একজন অশীতি-পর বৃদ্ধ ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য হারাইল এবং বঙ্গমাতা তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও ভক্ত সন্তান হারাইলেন। দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত বাল্য-জীবনেই প্রকাশচন্দ্রের অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যা-লয়ের সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বরিশাল জিলা-স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ও সুবর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে এফ-এ এবং বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ হারের বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এম-এ উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে ঐ পদে নিযুক্ত হন। পঁচিশ বৎসরের উপর তিনি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারীর পদে গৌরবের সহিত কাজ করিয়াছেন। চাকুরী জীবনে অনেক প্রলোভন ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াও তিনি কখনও সত্যভ্রষ্ট হন নাই বা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করেন নাই। যাহা সত্য বা ন্যায্য বলিয়া তিনি নিজে বুঝিতেন তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকার সময়েই তাঁহার মনে ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রবল বাসনা জাগে এবং তিনি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। "আমার সাহিত্য সাধনা" নামক পুস্তিকাতে তিনি নিজে এ বিষয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন। রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইবার পর তিনি যুগপৎ ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চ্চায় ও বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকাল নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি ধর্ম্ম এবং ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সুগভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহার সম্যক্ পরিচয় তাঁহার গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত তর্কবিজ্ঞান, ন্যায়-সোপান, দর্শন-সোপান, বেদান্ত-সোপান, গীতা-সোপান, ধর্ম্মযোগ নামক গ্রন্থগুলি যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়নে তিনি পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অশীতি-পর মনীষী জরাগ্রস্ত দেহে শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় যে উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদের আদর্শস্থল। তিনি বিশেষ আস্তিক্য-বুদ্ধি সম্পন্ন অথচ বিচার-শীল লেখক ছিলেন। এজন্য তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও আত্মীয়দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের অন্যতম প্রবীণ সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় গত ১৩ই মাঘ সজ্ঞানে কাশীলাভ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনে ভারতীয় দার্শনিক-মণ্ডলের আর একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইল। তর্কবাগীশ মহাশয় যশোহরের এক সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ন্যায়, বেদান্তাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই বিবিধ দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। প্রাচীন যুগের আচার্য্যদের সুমহান্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি পাবনার সুবিখ্যাত দর্শন টোলে বহুবৎসর ধরিয়া বহু ছাত্রকে স্বগৃহে অন্নদান করতঃ বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন। এই সময় হইতেই তিনি প্রাচীন ন্যায়ের অন্তর্গত বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া কতিপয় পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সমগ্র বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদ লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি ও টিপ্পনীর সহিত সম্পূর্ণ বাৎস্যায়ন ভাষ্যের বিস্তৃত অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার "ন্যায়দর্শন" নামক এই অমূল্য ও অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক সুবৃহৎ পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের "প্রবোধচন্দ্র বসু-মল্লিক" বৃত্তিপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে তিনি "ন্যায়-পরিচয়" নামে আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দুইটি গ্রন্থ তাঁহার অমর কীর্ত্তি এবং দুরূহ ন্যায়দর্শনের সুগম প্রবেশপথ।

তর্কবাগীশ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বীরভূম অধিবেশনের দর্শন শাখার সভাপতি মনোনীত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, বৈষ্ণব সম্মেলনী প্রভৃতি বিবিধ সৎ-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তদ্‌বিধায় তিনি নানাভাবে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন তেমনই সরল প্রকৃতি ও ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের

সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাঁহারা সকলেই তাঁহার সদালাপ ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। বাংলার এই বরেণ্য মনীষী ও মহামতি দার্শনিকের পরলোক-গমনে যে আদর্শ জীবনের অবসান ঘটিল তাহার পুণ্যস্মৃতি আমাদিগকে উন্নত ও অনুপ্রাণিত করুক ইহাই কামনা করি।

ভারতীয়-দর্শন-মহাসভা (Indian Philosophical Congress)

১৯২৫ সালে কলিকাতা-দর্শন-সমিতির (Calcutta Philosophical Society) উদ্যোগে এই মহাসভা প্রথম স্থাপিত হয় এবং ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে কবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি প্রতি বৎসর ঐ সময়ে (বড়দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে) ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে মহাসভার অধিবেশন তিন দিনের জন্য হইয়া থাকে। বিগত ডিসেম্বর মাসের ২০শে, ২১শে ও ২২শে তারিখে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার এক অধিবেশন হইয়া গেল। এবার মূল সভাপতি ছিলেন লাহোর ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জি. সি. চাটার্জি, আই, ই, এস্। তর্ক ও তত্ত্ব বিজ্ঞান (Logic and Metaphysics), ধর্ম্ম ও নীতি-বিজ্ঞান (Religion and Ethics), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ভারতীয় দর্শন এবং মুস্লিম্-দর্শন এই পাঁচটি শাখাতে মহাসভায় প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া যুক্ত অধিবেশনে মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিদের অভিভাষণ পাঠ হইয়াছিল এবং দুইটি পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় দুইটির একটি ছিল 'যাহা অপ্রমেয় তাহাই কি অর্থহীন ?' (Is the Unverifiable meaningless ?), এবং অন্যটি ছিল, 'সমষ্টি-মনের অস্তিত্ব আছে কি ?' (Is there a group-mind ?).

কলিকাতার আতঙ্ক ও অশান্তির জন্য এইবার বাংলা দেশ হইতে মাত্র একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন; তিনি ভারতীয় দর্শন শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম। ধর্ম্ম ও নীতি-বিজ্ঞানের নির্ব্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর অপরিহার্য্য কারণে যাইতে পারেন নাই। অন্যান্য বারের তুলনায় এইবার সমাগত প্রতিনিধি এবং

পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই অল্প হইয়াছিল। কিন্তু আলিগড়ের কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরিক আদর আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনার প্রাচুর্য্য বিশেষ লক্ষণীয় হইয়াছিল।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার গণিতজ্ঞ ডাঃ স্যার্ জিয়াউদ্দিন, সি, আই, ই, মহোদয় মহাসভার উদ্বোধন করেন এবং সেই প্রসঙ্গে গণিত ও বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে দর্শনের অপরিহার্য্যতার বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ-পাঠ করেন।

মূল-সভাপতি মিঃ চাটার্জির অভিভাষণের বিষয় একটু নূতন রকমের ছিল। তিনি কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা না করিয়া দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিবিড় সম্পর্কের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার মতে জীবন-যুদ্ধে দর্শনের উপযোগিতা অসন্দিগ্ধ। কিন্তু মানবজাতির শৈশবকালে যে সকল দর্শন উপযোগী ছিল. আধুনিক বয়ঃপ্রাপ্ত মানবের পক্ষে তাহা উপযোগী নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি গীতার ও অন্যান্যের সর্ব্বাত্মবাদ, যোগদর্শন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদ ইত্যাদি প্রাচীন দর্শনের অনুপযোগিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। উপসংহারে তিনি বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) এবং প্রাকৃতবাদের (Naturalism) অনুসরণ করিয়া মানবজীবন ও মানবের আদৃতবস্তু সকলের (Values) ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে এই প্রকার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই কালোপযোগী ও বাস্তব জীবনের পক্ষে সহায়ক।

ভারতীয় দর্শনের সভাপতি ডাঃ ব্রহ্ম বেদান্তের সর্ব্বাতিশয়িত্ব (Vedantic Transcendence) সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তর্ক ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টি. আর্. ভি. মূর্ত্তি এবং মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি. এস্. নাইডু এই উভয়ের অভিভাষণও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতির অধিবেশনও এই উপলক্ষ্যে হইয়াছিল। তাহার বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইল।

পুস্তক পরিচয়

হিন্দু প্রমাবিজ্ঞান বা ন্যায়-সোপান—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ বি. এ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক পি, ২০৫ ল্যান্সডাউন রোড এক্স্‌টেন্‌সন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥৶০ আনা।

প্রমাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি খুব কমই আছে। যাহা আছে তাহা ন্যায় বা অন্য কোন দর্শনের কোন প্রামাণিক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত হওয়ায় অতি বৃহৎ হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র সহজবোধ্যও হয় নাই। প্রমা ও প্রমাণ বিষয়ে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনেব বিভিন্ন শাখায় যে সব মৌলিক তথ্য-পূর্ণ মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলির সারসংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষায় কোন সহজ ও সাধারণের পাঠোপযোগী গ্রন্থ এযাবৎ রচিত হয় নাই। আবার অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেরই বিচার করিয়াছে, কিন্তু প্রমা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন আলোচনা করে নাই। এ ধারণা যে কতটা ভ্রমাত্মক তাহা যে কোন ভারতীয় দর্শনের সম্যক্ আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ভারতীয় দর্শনগুলির প্রত্যেকটিকেই একাধারে তত্ত্ববিজ্ঞান ও প্রমাবিজ্ঞান বলিলে ভুল হইবে না। কোন ভারতীয় দর্শনে প্রমা ও প্রমাণের বিচার না করিয়া কেবল পারমার্থিক তত্ত্বসম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রমাবিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তিতেই তাঁহাদের নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার স্থাপনা করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় প্রকাশ চন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগিশ মহাশয়ের হিন্দু প্রমাবিজ্ঞান বা ন্যায়-সোপান একদিকে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিবে এবং অপর দিকে একটি প্রচলিত ভ্রান্তধারণা দূর করিবে। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় দর্শন সকলের প্রমা ও প্রমাণ বিষয়ক তথ্যগুলির সারসংগ্রহ করিয়া অতি সরল ও সহজভাবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করিয়াছেন। পরিশিষ্ট ভাগে তিনি ভারতীয় দর্শন সকলের পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে বিভিন্ন মতের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিও ভারতীয় দর্শনের প্রমাবিজ্ঞান ও তত্ত্ববিজ্ঞান এতদুভয়েরই পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন এবং ভারতীয় দর্শন যে তত্ত্ববিজ্ঞানমাত্র নহে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রমা ও প্রমাণের ব্যাখ্যা করিতে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রায় নির্ভুল ও যথার্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুই এক স্থলে তাঁহার প্রদত্ত ও অনুমোদিত ব্যাখ্যায় সন্দেহের অবকাশ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ একটি প্রমাণ। ইহার লক্ষণ ব্যাখ্যা

করিতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সংবেদন (sensation) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু সংবেদনকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে তাহার প্রমেয় কি হইবে? কেবল সংবেদন হইতে আমাদের কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। রজ্জু প্রত্যক্ষ ও রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষস্থলে আমাদের সংবেদন একরূপ। সুতরাং ইহাদের কোনটিকেই প্রত্যক্ষ বলা যায় না। প্রত্যক্ষদ্বারা কোন বস্তুরূপ প্রমেয় সিদ্ধি না হইলে তাহাকে প্রমাণ বলার সার্থকতা থাকে না। সূত্রে প্রদত্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ খণ্ডন করিতে গ্রন্থকার ঈশ্বর প্রত্যক্ষের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতেও আপত্তি হইতে পারে। কারণ, এখানে জীবের ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না বুঝিয়া নব্যনৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়াজন্য নিত্য প্রত্যক্ষ বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গৌতমের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমেয় বলিয়া গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন সূত্রে ঠিক তাহা পাওয়া যায় না। সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলিতে গ্রন্থকার যাহা বুঝিয়াছেন তাহাও বিচারণীয়। ইহা সামান্যের অলৌকিক প্রত্যক্ষ নহে, পরন্তু সামান্যজ্ঞানজন্য জাতির প্রত্যক্ষ। উপমান প্রমাণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা মৌলিক হইলেও কিন্তু কোন প্রাচীন বা নব্য নৈয়ায়িকের গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা নাই। বিশ্বনাথ তাঁহার ন্যায়সূত্রবৃত্তিতে উপমান সূত্রের ব্যাখ্যায় শেষে যে দৃষ্টান্তটি দিয়াছেন তাহা ঠিক উপমা (analogy) নহে। গ্রন্থকার যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কোথায় আছে আমার জানা নাই। যদি গ্রন্থকারের মতে উপমান অনুমান বা শব্দ প্রমাণের ন্যায় নিশ্চয়াত্মক না হয় তবে তাহাকে প্রমাণ বলিবার সার্থকতা কি? সে যাহা হউক, মোটের উপর গ্রন্থখানি তথ্যপূর্ণ এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। প্রমাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। এই পুস্তক দর্শনানুরাগী ও বাংলা-ভাষাভাষী সুধীজনমাত্রেরই আদরণীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।—সম্পাদক।

Continence and Its Creative Power—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। সিন্ধুপ্রদেশস্থ করাচীর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা।

গ্রন্থকার "ব্রহ্মচর্য' ও ইহার সৃষ্টি-শক্তি" সম্বন্ধে 'বেদান্ত কেশরীতে' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা পরে করাচীর 'ডেলি গেজেটে' প্রকাশিত হয়। ইহাই এখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে বর্তমান যুগে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ এবং পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করিলে আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে

সুখ ও শান্তির আশা নাই। গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় মনোবিজ্ঞান, শরীর-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দিক্ হইতে বিচার করিয়া সমর্থন করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ ও হিন্দুশাস্ত্র হইতেও বিশেষ বিশেষ বাক্য ও নীতি উদ্ধৃত করিয়া তিনি স্বমতের পোষকতা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত এইপুস্তকে তাহার সম্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে গ্রন্থকার নব্যভারতকে লক্ষ্য করিয়া একটি আবেগময়ী বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বাণী ছাত্রসমাজের হৃদয়স্পর্শ করিলে এবং তাহারা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীগণ বিশেষ উপকৃত হইবে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার পথ সুগম হইবে ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

এই ইংরেজী পুস্তিকার একটা বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইলে দেশের তরুণ সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। স্বামীজি মহারাজকে এসম্বন্ধে বিবেচনা করিতে আমাদের বিনীত অনুরোধ জানাইছি।—সম্পাদক।

ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতি

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম. এ, পি-এচ্. ডি।

মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদানের নিয়ম ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এখন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী, এই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় সমস্যাও দেখা দিয়াছে। এতদিন ইংরেজীর দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাব-বিনিময় হইত, ইহাদ্বারা পরস্পরের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন চিন্তা ও ভাবের ধারা রক্ষা করার সুবিধা হইত। প্রত্যেক প্রদেশেই নিজ মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইলে এবং উচ্চাঙ্গ পুস্তক রচিত হইলে ভাষাগত ঐক্যের অভাবে প্রদেশগুলি পরস্পর হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। সংস্কৃতি বা ভাবের ঐক্য লুপ্ত হইলে, রাষ্ট্রগত ঐক্যের মূলও বহুলাংশে শিথিল হইয়া যাইবে; ভারতের অখণ্ডতা বোধ স্তিমিত হইয়া আসিবে। এই সমস্যার প্রতিবিধান আবশ্যক।

ইংরেজী ত্যাগ করিয়া মাতৃভাষায়ই যদি সকল বিষয়ে চর্চ্চা করা উচিত হয়, তবে ঐক্য ও সংযোগ রক্ষার এক প্রধান উপায় হইবে বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ-গুলিকে যথাসম্ভব এক করা। প্রত্যেক প্রদেশেই এখন মাতৃভাষায় নূতন নূতন পরিভাষা-সঙ্কলনের চেষ্টা হইতেছে। এখন দেশব্যাপি একটা আন্দোলন হওয়া উচিত যাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা সঙ্কলকগণ সম্মীলিত চেষ্টা দ্বারা এক সাধারণ পরিভাষার সৃষ্টি করিতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দিক্ হইতে চেষ্টা খুব সামান্যই হইয়াছে। এক পরিভাষা সৃষ্টি করার পথে অবশ্য অসুবিধা কিছু কিছু আছে; কিন্তু তাহা একেবারে দুরপনেয় নহে। এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে পরিভাষা সংস্কৃত-মূলক হইবে, না আর্ব্বীমূলক না দ্রাবিড়ভাষা-মূলক হইবে। ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা কবে হইবে জানি না। তবে এই প্রকার মীমাংসার অপেক্ষায় ঐক্যের চেষ্টা স্থগিত রাখিলে, অনৈক্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। কারণ অসংহত চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ গড়িয়া উঠিতেছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে অল্পাধিক কাল বাস করার এবং মারাঠী, গুজরাতী, হিন্দী, বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, প্রভৃতি সংস্কৃত-মূলক ভাষার সহিত পরিচয় ঘটারও আমার সৌভাগ্য হইয়াছে। দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি, এই সকল ভাষার ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ সংস্কৃত

হইতে গঠিত হইতেছে, অথচ এক ভাষার পরিভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পরিভাষার অনেক স্থলেই ঐক্য বা সাদৃশ্য নাই। যেমন, একই অর্থে বিভিন্ন ভাষায়, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ব্যবহার হইতেছে; সেইরূপ সম্পাদক ও মন্ত্রী, বিপ্লব ও ক্রান্তি, সভাপতি ও অধ্যক্ষ্য ইত্যাদি একই অর্থে চলিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার প্রায় বিশ বৎসর হইতেই মনে প্রশ্ন হইতেছিল, যে সব ভাষা সংস্কৃত হইতেই পরিভাষা সৃষ্টি করিতেছে অন্ততঃ সেইগুলির মধ্যে কি এক পরিভাষার প্রবর্ত্তন করা যায় যায় না? তাহা হইলেও ত' বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অনেকটা ঐক্য স্থাপন সম্ভবপর হয়? সব বিষয়ে এক পরিভাষা করার আন্দোলনের জন্য বহু শক্তি ও সময়ের আবশ্যক। আপাততঃ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই ঐক্য স্থাপন করার চেষ্টা করার ইচ্ছা হইল। দর্শনের পরিভাষা সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা করার বিশেষ কতকগুলি সুবিধার কথা মনে হইল। ভারতীয় দর্শনের চর্চ্চা সংস্কৃত ও তন্মূলক পালি-প্রাকৃত ভাষায় ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই বহু শতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে দর্শনের বহু পারিভাষিক শব্দ সর্ব্বত্র একই অর্থে প্রচলিত আছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন সাধারণ পরিভাষা সঙ্কলন ও গঠন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। এই চেষ্টা করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্মীলিত আলোচনা ও পরামর্শের অবশ্য প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশন উপলক্ষ্য প্রতি বৎসর দার্শনিকদের বিভিন্ন প্রদেশে একত্র সমাগম হয়। উক্ত কাজ করার পক্ষে ইহা এক বড় সুযোগ বলিয়া মনে হইল।

বিগত ইং ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এডিয়ার এ ভারতীয় দর্শন মহাসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। সেখানে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এই সম্বন্ধে প্রথম আলাপ হইল। ইঁহাদের কয়েকজন পূর্ব্ব হইতে নিজ নিজ ভাষায় দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ করিতেছিলেন। সংস্কৃত-মূলক পরিভাষাগুলির মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে ইঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি পাওয়া গেল। কিছু আলোচনার পর সেখানেই কয়েকটি প্রদেশের উৎসাহী ব্যক্তিদিগকে নিয়া একটা অস্থায়ী সমিতি গঠিত হইল। মহারাষ্ট্রের সাংলী কলেজের অধ্যাপক ডি. ডি. বাড়েকর এই সমিতির সাময়িক আহ্বায়ক নিযুক্ত হইলেন। আলোচনান্তে স্থির হইল যে প্রথমবৎসর বিভিন্ন প্রদেশে দর্শনের পরিভাষা সম্পর্কে কি কি কাজ হইয়াছে তাহার তথ্য-সংগ্রহ করিতে হইবে এবং দর্শন মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশনের সময় ইহার পর কি কর্ত্তব্য স্থির করা হইবে।

গত ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সময় অস্থায়ী পরিভাষা সমিতিরও অধিবেশন হইল। উহাতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত তথ্য আলোচিত হয়। দেখা যায় যে কোন

প্রদেশেই এখনও দর্শনের পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে কোন কোন স্থানে প্রাদেশিক ভাষায় দর্শনের কিছু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং পরিভাষার কাজ আংশিক ভাবে করা হইয়াছে। ইহাও দেখা গেল যে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে বিভিন্ন ভাষায় যে সব পরিভাষা প্রস্তুত হইতেছে তাহা প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতেই গৃহীত বা উহার সাহায্যেই গঠিত। আলোচনার পর ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতি স্থায়ী-ভাবে গঠিত হইল।

এই সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে স্থির হইল প্রথমতঃ তত্ত্ব-বিজ্ঞান (Metaphysics), নীতি-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি দর্শনের শাখায় প্রচলিত ইংরেজী শব্দের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ভিন্ন ভিন্ন শাখার জন্য তিন চারিজন সভ্য নিয়া এক একটি উপসমিতি গঠিত হইল। আগামী ডিসেম্বর মাসে লাহোরে দর্শন মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপর্য্যুক্ত সভ্যগণ সংগৃহীত তালিকা উপস্থিত করিবেন। ইহার পর সংগৃহীত ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ-গুলির প্রতিশব্দ পূর্ব্ব-প্রচলিত ভারতীয় দর্শনের সংস্কৃত বা পালি-প্রাকৃত গ্রন্থ হইতে কি কি পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান ও সঙ্কলন বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। তাহার পরে অবশিষ্ট শব্দের প্রতিশব্দ প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন সংস্কৃত-মূলক ভাষায় সংগৃহীত আধুনিক পরিভাষা হইতে গ্রহণ করা হইবে অথবা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

এই পরিভাষা-সমিতির তিন প্রকার সদস্য থাকিবেন। যাঁহারা সমিতির কার্য্যে আর্থিক সাহায্য করিবেন তাঁহারা পৃষ্ঠপোষক সদস্য হইবেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত অমলনের নগরের তত্ত্ব-জ্ঞান-মন্দির নামক দর্শন-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা বদান্যবর শ্রীযুক্ত প্রতাপশেঠ মহোদয় ইতিমধ্যেই সমিতির প্রারম্ভিক কার্য্যের সাহায্যার্থ একশত টাকা দিয়াছেন। তাঁহাকে প্রথমই পৃষ্ঠ-পোষক শ্রেণীভুক্ত করা হইল। যাঁহারা সমিতির পরিভাষা সঙ্কলনের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা হইবেন কর্ম্মী সদস্য। ইহাছাড়া যাঁরা কোনও কারণে নিয়মিত ভাবে সমিতির কার্য্য করিতে অক্ষম, অথচ যাঁরা দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ কৃতবিদ্য তাঁহাদিগকে উপদেষ্টা সদস্য করা হইবে। পরিভাষা সংগ্রহের কাজে জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সংগৃহীত পরিভাষার দোষ-গুণ বিচারের জন্য তাঁহাদের পরামর্শ লওয়া হইবে।

'দর্শন' এর পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যের প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁহারা অর্থ ও উপদেশ দিয়া অথবা কোনও কাজের ভার লইয়া ইহাতে সাহায্য করিবেন এই উদ্দেশ্যেই উক্ত সমিতির সম্বন্ধে জ্ঞতব্য বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। এই সম্পর্কে যে যতটুকু সহায়তা করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। 'দর্শন' এ যে পরিভাষা সংগৃহীত হইবে তাহাও সেই

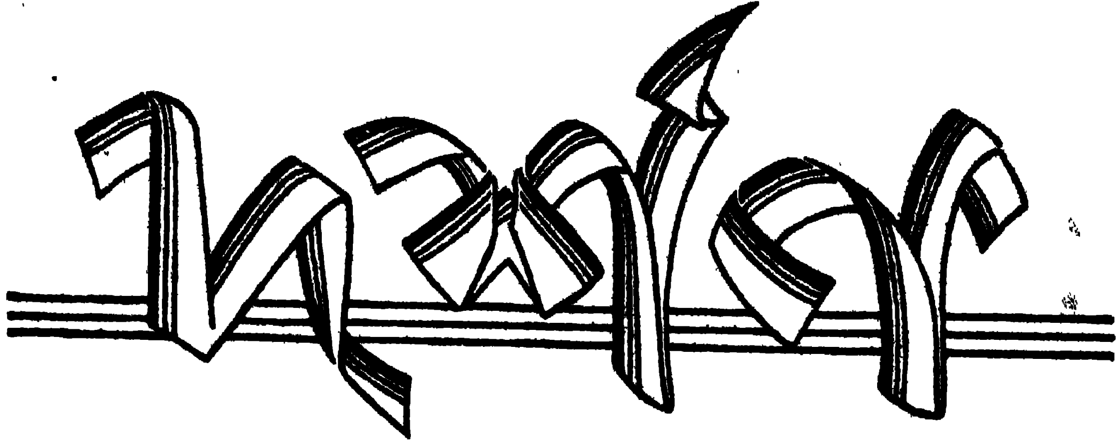
ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতির কাজের সহায়ক হইবে। এই সম্বন্ধে 'দর্শন' এর সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করিলেই চলিবে। পরিভাষা-সংগ্রহের বৃহৎ কার্য্যে সমর্থ সুধীবৃন্দের সমবেত চেষ্টা অত্যন্ত আবশ্যক। কেহ বেশী কাজ না করিতে পারিলেও অন্ততঃ কয়েকটি ভাল পারিভাষিক শব্দ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া বা নিজে নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইলেও অনেক উপকার হইবে। তিনি ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

আরিষ্টটল্ এবং মিলের তর্কবিজ্ঞানের পরিভাষা

[অধ্যাপক শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য তর্ক-বিজ্ঞানের পরিভাষার যে তালিকা দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের বিবেচনার্থ প্রকাশ করা হইল। তাঁহারা তাঁহাদের অভিমতসহ নূতন প্রতিশব্দ এবং তর্কবিজ্ঞানের অন্যান্য ইংরেজী শব্দ লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তালিকার অবশিষ্টাংশ ক্রমশঃ উপস্থাপিত করা হইবে। পরে এগুলির চূড়ান্তভাবে গৃহীত ও অনুমোদিত তালিকা প্রকাশিত হইবে—সম্পাদক।]

১। Logic – তর্কশাস্ত্র বা তর্কবিজ্ঞান
২। Definition—লক্ষণ
৩। Province—নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তু
৪। Thought—মনন
৫। Thing - বস্তু
৬। Science—বিজ্ঞান
৭। Art—প্রয়োগবিজ্ঞান
৮। Truth—প্রমা
৯। Formal—জ্ঞাতৃতন্ত্র বা ভাবতন্ত্র
১০। Material—জ্ঞেয়তন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র
১১। Deduction—বিশেষানুমান
১২। Induction—সামান্যানুমান
১৩। Universal—সামান্য
১৪। Particular—বিশেষ
১৫। Deductive Logic—বিশেষানুমান-ন্যায়
১৬। Inductive Logic—সামান্যানু-মানন্যায়
১৭। Consistency—সঙ্গতি
১৮। Fact—ঘটিত
১৯। Phenomenon—ঘটনা
২০। Process—ব্যাপার
২১। Term—পদ
২২। Word—শব্দ
২৩। Name—নাম
২৪। Proposition—বচন
২৫। Sentence—বাক্য
২৬। Judgment—সঙ্কল্প
২৭। Subject – উদ্দেশ্য
২৮। Predicate—বিধেয়
২৯। Copula—সংযোজক
৩০। Object—জ্ঞেয়
৩১। Positive—অস্তিত্ববাদী
৩২। Normative—আদর্শবাদী
৩৩। Affirmative—বিধ্যর্থক
৩৪। Negative—নিষেধার্থক
৩৫। Law—নিয়ম
৩৬। Method—প্রণালী
৩৭। Rule—অনুশাসন
৩৮। Principle—মূলসূত্র
৩৯। Postulates—প্রতিজ্ঞা বা সিদ্ধান্ত
৪০। Axioms—স্বতঃসিদ্ধান্ত
৪১। Nature—স্বরূপ
৪২। Law of Identity—স্বারূপ্য- বা তাদাত্ম্য-সাধকনিয়ম
৪৩। Law of Non-Contradiction—বিরোধ-বাধক নিয়ম
৪৪। Law of Excluded Middle—মধ্যকোটি নিরাসক নিয়ম
৪৫। Law of Sufficient Reason—আত্যন্তিক কারণসাধক নিয়ম
৪৬। Conceptualism—প্রকারাস্তিত্ববাদ
৪৭। Nominalism—নামাস্তিত্ববাদ
৪৮। Realism—বস্তু-অস্তিত্ববাদ
৪৯। Concept—প্রকার বা কল্পনা
৫০। Idea—ভাব
৫১। Connotation or Intention—সারার্থ বা সারধর্ম্ম
৫২। Denotation or Extension—বিস্তৃতি বা ক্ষেত্র
৫৩। Inverse Variation—প্রতি-লোমভেদ
৫৪। Psychological or Subjective Connotation—জ্ঞাতৃতন্ত্র ধর্ম্ম

৫৫। Metaphysical or Objective Connotation—জ্ঞেয়তত্ত্ব-সারধর্ম
৫৬। Logical or Conventional Connotation—ব্যবহারিক সারধর্ম
৫৭। Genus—জাতি
৫৮। Species—উপজাতি
৫৯। Summum Genus—পরাজাতি
৬০। Infima Species—কোনিষ্ঠ উপজাতি
৬১। Proximate Genus—নেদিষ্ঠ জাতি
৬২। Co-ordinate Species—সহোপজাতি
৬৩। Subordinate Species—অনুপজাতি
৬৪। Differentia—উপজাত্যবচ্ছেদক ধর্ম
৬৫। Proprium—উপলক্ষণধর্ম
৬৬। Accident—আগন্তুকধর্ম
৬৭। Generic Property—জাত্যু-পলক্ষণধর্ম
৬৮। Specific Property—উপজাত্যুপলক্ষণধর্ম
৬৯। Separable Accident—বিযোজ্যাগন্তুকধর্ম
৭০। Inseparable Accident—অবিযোজ্যাগন্তুকধর্ম
৭১। Categorematic word—স্বয়ং-পদগ্রাহ্যশব্দ বা পদাধিকার শব্দ
৭২। Syncategorematic word—পরাধীন শব্দ
৭৩। Acategorematic word—অপদ শব্দ
৭৪। Simple term—একশাব্দিক পদ
৭৫। Composite term—বহুশাব্দিক পদ
৭৬। Singular term—বিশেষ পদ
৭৭। General term—সামান্য পদ
৭৮। Univocal term—একার্থক পদ
৭৯। Equivocal term—অনেকার্থকপদ
৮০। Concrete term—দ্রব্যবাচক পদ
৮১। Abstract term—গুণবাচক পদ
৮২। Collective term—সমষ্টিবাচক পদ
৮৩। Distributive term—ব্যষ্টিবাচক পদ
৮৪। Definite term—নির্দিষ্ট পদ
৮৫। Indefinite term—অনির্দিষ্ট পদ
৮৬। Relative term—সাপেক্ষ পদ
৮৭। Absolute term—নিরপেক্ষপদ
৮৮। Positive term—ভাববাচক পদ
৮৯। Negative term—অভাববাচক পদ
৯০। Privative term—সাময়িক গুণাভাব-বাচক পদ
৯১। Connotative term—সারধর্মবাচক পদ
৯২। Non-Connotative term—বিজ্ঞপ্তিমাত্রবাচক পদ
৯৩। Infinite term—অসীমপদ
৯৪। Contrary term—অসঙ্গত পদ
৯৫। Contradictory term—বিরুদ্ধপদ
৯৬। Ambiguous term—সন্দিগ্ধ পদ
৯৭। Too narrow definition—অব্যাপ্ত লক্ষণ
৯৮। Too wide definition অতিব্যাপ্ত লক্ষণ



বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা]　　বৈশাখ　　[সন ১৩৪৯ সাল

সম্পাদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ, পি-এচ্‌. ডি

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

-:০:-

সূচীপত্র

বৈশাখ সংখ্যা

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা] দর্শন [বৈশাখ, ১৩৪৯ সাল

স্বয়ংসৎ বস্তু ও অবভাস

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীরাসবিহারী দাস, এম্. এ. পি-এচ. ডি.

যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় কাণ্টীয় দর্শনের আলোচনা, অধ্যাপনা বা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা থিঙ্গ্ ইন্ ইটসেল্ফ্ কথাটার সঙ্গে খুবই পরিচিত। কিন্তু এই কথাটার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও, তাহা দ্বারা কি বুঝায়, বা কি বোঝা উচিত, সে বিষয়ে সকলের খুব স্পষ্ট, অন্ততঃ একই, ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ থিঙ্গ্ ইন্ ইট্সেল্ফ্ বলিতে কি বোঝা উচিত, এই বিষয়ে মতানৈক্য থাকাতেই কাণ্টের টীকাকারদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব টীকাকারদের মধ্যে যাঁহারা আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যাঁহাদিগকে এক কথায় বস্তুতন্ত্রবাদী (ইংরাজিতে রিয়্যালিষ্ট্) বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া, থিঙ্গ্ ইন্ ইট্সেল্ফ্ এবং তৎসংসৃষ্ট ফেনোমেনন্, য়্যাপিয়ার‍্যান্স্ বা অবভাস সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

থিঙ্গ্ ইন্ ইট্সেল্ফ্ কে বাংলাতে স্বগতসত্তাক বস্তু বলিতে পারা যায়। স্বগতসত্তাক বস্তু বলিতে এই রকম পদার্থই বুঝায়, যার সত্তা তার নিজের মাঝেই আছে। আমাদের মনে হইতে পারে, সকল বস্তুর সত্তাই ত তাহাদের নিজেদের মধ্যে থাকে; এবং তাহা হইলে স্বগতসত্তাক বস্তু বলিয়া বিশেষ কি বলা হইল? এই কথার বিশেষ অর্থ বুঝিতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ বোঝা উচিত যে, এ রকম বস্তুও থাকিতে পারে,

যার সত্তা তার নিজের মধ্যে নাই। অর্থাৎ যে রূপে সে বস্তু আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, সেরূপে তার নিজস্ব কোন সত্তা নাই, অন্যের সত্তায় সে সত্তাবান। সূর্য্য বাস্তবিক অস্ত যাওয়ার অব্যবহিত পরে পশ্চিমাকাশে যে সূর্য্যের প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হয়, তার নিজস্ব কোন সত্তা নাই। অস্তগত সূর্য্য এবং বিশিষ্ট প্রকারের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানব মনের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। যে কোন আপেক্ষিক বা সম্বন্ধমূলক গুণধর্ম্মযুক্ত বস্তুর অস্তিত্ব এই রকম পরগত দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিসংযোগে রক্তীভূত লৌহপিণ্ডকে কি রকম উষ্ণ বলিয়াই না মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক লৌহ-পিণ্ড নিজের কাছে বা নিজের মধ্যে মোটেই উষ্ণ হইতে পারে না: আমাদের সংবেদনার কাছেই, আমাদের স্পার্শন প্রত্যয়ের কাছেই শুধু উষ্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, উষ্ণরূপে লৌহপিণ্ড স্বগতসত্তাক নহে। অন্য কিছুর উপর কোনরূপে নির্ভর না করিয়া আপনার মধ্যে বস্তু যে রূপে থাকে, সেরূপেই তাহাকে স্বগতসত্তাক, অথবা অল্প কথায়, স্বয়ংসৎ বা স্বরূপসৎ বলিতে পারা যায়। বস্তুর যে রূপ অন্যের উপর নির্ভর করে, সেরূপে তাহা স্বয়ংসৎ, স্বরূপসৎ বা স্বগত-সত্তাক নহে।

আমরা সাধারণ জ্ঞানে যে সব বিষয় জানিয়া থাকি, তাহা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। সুতরাং যেরূপে বিষয় আমাদের দ্বারা জ্ঞাত হয়, সেরূপে তাহা স্বগতসত্তাক বা স্বয়ংসৎ নহে। কাণ্টের মতে স্বরূপ সৎ বস্তু বা বস্তুর স্বয়ংসৎ রূপ আমাদের মানবীয় জ্ঞানে কখনই প্রতিভাত হয় না। তবে কাণ্ট্ বস্তুর এ রকম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় এক রূপ মানিলেন কেন?

যে রকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া কাণ্ট্ জ্ঞানবিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে রকম বিচারধারার দ্বারা তাঁহার দার্শনিক মত প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহাতে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বয়ংসৎবস্তু না মানিয়া কাণ্টের উপায়ান্তর ছিল না। কাণ্ট্ নিজে দৃষ্টিবাদী (এম্পিরিসিষ্ট্) ছিলেন না বটে; অর্থাৎ একথা সত্য যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুধু দেখিলে শুনিলেই জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তবে এ কথাও সত্য যে, দৃষ্টিবাদের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানবিচার বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। শুধু দেখিলে শুনিলেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ না হইলেও কাণ্টের মতে দেখা শোনা

ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব না থাকিলে আমাদের কোন প্রত্যয়ই জ্ঞানপদবাচ্য হয় না। কাণ্টীয় জ্ঞানশাস্ত্রের এই মূলমন্ত্র কাণ্ট্ দৃষ্টিবাদীদের কাছ হইতে শিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর (ইউরোপীয়) দৃষ্টিবাদীদের মতে আমাদের জ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা বাহির হইতে পাইলেও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে যে ছাপ পড়ে, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে যে সব প্রতীতির (আইডিয়া) উদয় হয়, সেইরূপ বা সেই সব প্রতীতিই সাক্ষাৎভাবে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হয়, বাহ্যবস্তু যে স্বরূপতঃ কি, তাহা বাস্তবিক আমরা জানি না। আমরা যাহা জানি, তাহা আমাদের মনের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার এক প্রকার পরিণাম মাত্র। কাণ্টের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বয়ংসৎবস্তুর কল্পনার বীজ হয়ত এইখানেই ছিল।

আগেই বলা হইয়াছে, কাণ্ট্ দৃষ্টিবাদী ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন না যে মন বা বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় থাকিলেও, শুধু ইন্দ্রিয়ানুভব দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। তাঁহার মতে বাহ্য পদার্থোৎপাদিত মানস প্রতীতিমাত্রই জ্ঞানের বিষয় নয়। (এখানে 'বাহ্য' শব্দের দ্বারা 'আমাভিন্ন' বুঝিলেই চলিবে।) প্রতীতিনিচয়কে বিশিষ্ট প্রকারে সুসম্বদ্ধ করিয়াই আমাদের বুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের বিষয় নির্ম্মাণ করে। কাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞানশক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার, অথবা জ্ঞানশক্তির প্রধানতঃ দুই রূপ। একরূপে ইহাকে সংবেদনশক্তি (সেন্সিবিলিটি) এবং অন্যরূপে বুদ্ধিশক্তি (আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং) বলা যায়। সংবেদনরূপে ইহা পরতঃক্রিয় (রিসেপ্টিভ্) এবং বুদ্ধিরূপে স্বতঃক্রিয় (স্পণ্টেনিয়াস্)। সংবেদনরূপে ইহা অন্যের প্রভাবে, অর্থাৎ পরবশ হইয়া, ক্রিয়া করে; বুদ্ধিরূপে নিজেই আপনা হইতে ক্রিয়া করিয়া থাকে। সংবেদনাতে আমরা যাহা পাই, যাহা শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি, তাহা অন্যের কাছ থেকে পাওয়া; আর বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকারে বুঝি, সে প্রকার বুদ্ধিরই নিজের। কাণ্টের মতে উভয় শক্তির ক্রিয়ার ফলেই জ্ঞানলাভ হয়। শুধু সংবেদনের দ্বারা কিংবা শুধু বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না।

জ্ঞান ব্যাপারে আমাদের কিছু পাইতে হয় (সংবেদনার দ্বারা) এবং কিছু দিতেও হয় (বুদ্ধির দ্বারা)।

সংবেদনার উপাদান বাহির হইতে পাইলেও তাহা গ্রহণ করিবার প্রকার আমাদের নিজস্ব। সংবেদনজন্য বোধকে যদি পারিভাষিক অর্থে অনুভব (ইনটুইশন্) বলি, তাহা হইলে দেশ ও কালকে কাণ্টের মতে, অনুভবের আকার (ফর্ম্‌স্ অব্ ইনটুইশন্) বলিয়া মানিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের কিছু অনুভব করিতে হইলে শুধু দেশে ও কালেই অনুভব করিতে হয়। আমাদের অনুভবের দৈশিক ও কালিক আকার আমাদের জ্ঞানেরই আকার মাত্র, বস্তুনিষ্ঠ কোন ধর্ম্ম নহে; কাণ্ট্ দেখাইয়াছেন, দেশ ও কাল বাস্তব কোন পদার্থ নয়, আমাদের অনুভবেরই আকার মাত্র।

আমাদের সংবেদনজন্য প্রতীতিকে বিভিন্নভাবে সুসম্বদ্ধ করিয়া বিষয়রূপে পরিণত করাই আমাদের বুদ্ধির কাজ। এই বিষয়গত সুসম্বদ্ধতা বুদ্ধি কয়টী নির্দ্দিষ্ট প্রকারেই সম্পাদিত করিতে পারে। দ্রব্যগুণ-ভাব, কার্য্যকার ভাব প্রভৃতি যে ১২টি নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সংশ্লেষিত বা সুসম্বদ্ধ হইয়া আমাদের সংবেদনজন্য প্রতীতিনিচয় বিষয়াকারে পরিণত হয়, তাহাদিগকে বৌদ্ধিক প্রকার (ক্যাটিগরিস্ অব্ দি আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং) বলা হয়। দেখা যাইতেছে, বিষয়রূপে আমাদের জ্ঞানে যে পদার্থ পাই, তাহা স্বরূপসৎ কোন বস্তুই নহে। তাহা মূলতঃ আমাদের মানস প্রতীতি মাত্র এবং অনেকাংশে আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মিত। আমাদের জ্ঞানগম্য বিষয় প্রথমতঃ আমাদের বিশিষ্ট আকারের (দৈশিক ও কালিক) সংবেদনার উপর, এবং মুখ্যতঃ আমাদের বৌদ্ধিক প্রকারের উপর নির্ভর করে; সেই জন্য তাহাকে স্বয়ংসৎ বা স্বরূপসৎ বলা যায় না। কাণ্ট্ তাহাকে অবভাস বলিয়াছেন। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহাতেই আনুভবিক আকার (দেশ ও কাল) ও বৌদ্ধিক প্রকার (দ্রব্যত্বাদি) প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহাকে স্বয়ংসৎ বলিয়া মানিতে পারা যায় না, অবভাস বলিয়াই মানিতে হয়।

আমাদের জ্ঞানে বিষয়রূপে যাহা ভাসে, তাহাকেই অবভাস বলা হইতেছে। এই অবভাস যে স্বয়ংসৎবস্তু নয়, বা তাদৃশ বস্তু সদৃশও কিছু নয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। অবভাসের মূল উপকরণ ত আমাদের মানস প্রতীতি মাত্র। এই প্রতীতিগুলি অবশ্য আমাদের (জ্ঞানশক্তির)

উপর স্বয়ংসৎবস্তুর ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু স্বয়ংসৎবস্তুর ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হইলেই তাহারা যে তৎসদৃশ হইবে, এমন কথা বলা যায় না। অগ্নির সংস্পর্শে আমাদের দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখ ও অগ্নি একই পদার্থ বা একই রকমের পদার্থ বলিতে পারা যায় না। তার উপর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্বয়ংসৎবস্তুজন্য প্রতীতিও শুদ্ধরূপে আমরা জ্ঞানে পাই না। এই সব প্রতীতি আমাদের জ্ঞান-শক্তির নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত হইয়া বিষয়রূপে আমাদের জ্ঞানে ভাসে। স্বয়ংসৎবস্তুর স্বরূপের সঙ্গে এই সব আকারের কোন সম্পর্কই নাই। এরকম স্থলে আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মিত বিষয় ও স্বয়ংসৎবস্তুর মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে একথা কেমন করিয়া বলা যাইবে ?

আমরা বলিলাম, স্বয়ংসৎবস্তু আমাদের প্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকে ; তাহা আমাদের (জ্ঞানশক্তির) উপর স্বয়ংসৎবস্তুর ক্রিয়ার ফলেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। স্বয়ংসৎবস্তু সম্পর্কে এ রকম ভাষা প্রয়োগ অনেকের মতে অসমীচীন। কেননা এ রকম ভাষায় কার্য্যকারণভাবের কথা, এক বস্তুর উপর অপর বস্তুর ক্রিয়ার কথা ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এই রকম কথা আমরা জ্ঞানীয় বিষয় আবভাসিক বস্তু সম্বন্ধেই বুঝিয়া থাকি ও বুঝিতে পারি, স্বয়ংসৎবস্তু সম্বন্ধে এরকম কথার কি অর্থ হইতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্যই হয় না। কিন্তু এ রকম ভাষা আমাদের পক্ষে অনেকটা অপরিহার্য্য। আমাদের জ্ঞানের এক বিষয়ের উপর অন্য বিষয়ের যেরূপভাবে ক্রিয়া হইয়া থাকে, অথবা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর যে রকম ভাবে উৎপন্ন হয়, স্বয়ংসৎবস্তুর রাজ্যে সে রকম কিছু হয় না বা হইতে পারে না সত্য, কিন্তু তথাপি আমাদের জ্ঞান সম্পর্কে স্বয়ংসৎবস্তু কিছুই করে না, অথবা আমাদের উপর তাহার কোন ক্রিয়াই হয় না, এ কথাও ঠিক বলিতে পারা যায় না। স্বয়ংসৎবস্তু একেবারে নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় হইলে, স্বয়ংসৎবস্তু বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা বলিবারও অবসর হইত না। যাহা হউক, অবভাসের বা আমাদের বিষয় জ্ঞানের মূলে যে স্বয়ংসৎবস্তু রহিয়াছে, তাহা না মানিয়া পারা যায় না। এখন এই অবভাস বস্তুটী যে কি সে বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করা যাক্।

অবভাস বলিতে জ্ঞানে যাহা ভাসে, যাহা প্রতীত হয়, তাহাই আপাততঃ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ জ্ঞানের সঙ্গে বা কোন জ্ঞাতার সঙ্গে অবভাসের সম্বন্ধ আছে বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে, কোন না কোন বস্তুর অবভাস জ্ঞানে প্রকাশ পায়। মূলে কিছুই নাই, অথচ অবভাস হইতেছে, এরকম কল্পনা আমরা করিতে পারি না। সুতরাং অবভাস বলিতেই বুঝিতে হইবে কোন কিছুর কারো কাছে অবভাস। এখানে জ্ঞাতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, আরো দুইটী পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, মূলবস্তু এবং তার অবভাস। এখানে অবভাত বস্তু ও তার অবভাসের মধ্যে আমরা নানা প্রকার সম্বন্ধের কথা কল্পনা করিতে পারি। প্রথমতঃ অবভাস ও অবভাত বস্তুকে আমরা এক বলিয়াই অনেক স্থলে ধরিতে পারি। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা কোন ভৌতিক পদার্থ (যথা ঘট পটাদি) এবং ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানলব্ধ তাহার অবভাসের মধ্যে কোন ভেদের কল্পনা করি না। দ্বিতীয়তঃ বিচারের ফলে ভৌতিক পদার্থ ও তাহার অবভাসের মধ্যে ভেদ কল্পনা করিলেও, ভৌতিক পদার্থকে অবভাস হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোঝা যায় না ; জ্ঞানের দিক্ দিয়া ভৌতিক পদার্থকে তৎসম্পর্কিত অবভাসরাশির সমষ্টি বলিয়াও বুঝিতে পারা যায় ; অর্থাৎ অবভাসকে বস্তুর এক অংশ বা অবয়ব বলিয়াও ধারণা করিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ, যখন সরল যষ্টিখণ্ড জলে অর্দ্ধমগ্ন অবস্থায় আমাদের কাছে বক্র বলিয়া প্রতিভাত হয়, অথবা শ্বেত বস্তু পীত বলিয়া প্রতীত হয়, তখন বস্তু ও তাহার অবভাসকে আমরা ভিন্ন বলিয়াই বুঝিতে বাধ্য হই। সরলের মধ্যে বক্রের কিংবা শ্বেতের মধ্যে পীতের সমাবেশ কখনই করিতে পারা যায় না। কিন্তু এরকম স্থলেও অবভাসের মধ্যে মূল বস্তুর কোন জ্ঞানই হয় না, তাহা বলিতে পারা যায় না। সরল যষ্টিকে যখন বক্র বলিয়া দেখি, তখনও তাহা যে যষ্টি ও নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট, সে সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ থাকি না। শ্বেত শঙ্খকে পীত বলিয়া বুঝিলেও অবভাত বস্তুর শঙ্খত্বের কোন শঙ্কা থাকে না। মূল বস্তু যদি আংশিক ভাবেও অবভাসের মধ্যে প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে সেই অবভাস যে তাহার অবভাস এ কথা বলা যাইত না।

এখানে অবভাসের যে তিন প্রকার কল্পনার কথা বলা হইল, সেগুলি হইতে কান্টীয় দর্শনের অবভাসের কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরের দৃষ্টান্ত-

গুলিতে যে সব বস্তুকে মূলবস্তু বলিয়া ধরা হইয়াছে, কাণ্টের মতে সে সবই অবভাস বলিয়া গণ্য হইবে। আগেই বলা হইয়াছে, অবভাস বলিতে কোন বস্তুর জ্ঞানীয় রূপ বুঝায়। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানে কোন বস্তু যেরূপে প্রতিভাত হয়, সেই প্রাতীতিক রূপই ঐ বস্তুর অবভাস। অবভাসের এই কল্পনা কাণ্টীয় অবভাসেও প্রয়োজ্য। আমাদের জ্ঞানে বিষয়রূপে যাহা ভাসে, তাহাই অবভাস। কিন্তু কাহার অবভাস? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, স্বয়ংসৎবস্তুর অবভাস। কিন্তু কাণ্টীয় অবভাস যদি স্বয়ংসৎবস্তুর অবভাস হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইহা প্রাতিভাসিক (ভ্রান্ত) অবভাসের চেয়েও নিকৃষ্টতর, কেননা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের বিষয় বাস্তব না হইলেও, তাহা হইতে মূলভূত বস্তুর কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যায়। আমরা যখন শুক্তিতে রূপ্য দর্শন করি, তখন রূপ্য-অবভাস শুক্তি-বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বটে, কিন্তু শুক্তির চাক্‌চিক্যাদি গুণ দৃষ্ট রূপ্যেতেও ভাসিয়া থাকে। অন্ততঃ যে স্থানে বস্তু থাকে, সেই স্থানেই ভ্রমের বিষয় প্রত্যক্ষ হওয়াতে, সেই ভ্রান্ত অবভাসের দ্বারা মূলভূত বস্তুর দৈনিক অবস্থান অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কাণ্টীয় অবভাস হইতে মূলভূত স্বয়ংসৎবস্তু সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, মূলভূত বস্তুর সঙ্গে অবভাসের সাদৃশ্য বা অন্য কোন জ্ঞেয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ আছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি না। তাহা হইলে অবভাসকে মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া নিতে আপত্তি কি? মূলভূত বস্তু যখন স্বরূপতঃ জানা যাইতেছে না, তখন অবভাসকে এক অর্থে মিথ্যা হয়ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু কাণ্ট নিজে অবভাসকে মিথ্যা কিংবা ভ্রান্ত বলিতে সম্মত নন, এবং সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট যুক্তিও রহিয়াছে। যেখানে আমাদের ভ্রম হয়, সেখানেই বিচার করিলে দেখা যাইবে, সেই ভ্রমের মূলে আমাদের ব্যক্তিগত বা বৈয়ক্তিক অবস্থাগত কোন দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের পিত্তের কোন বিশেষ বিকার হইলে শ্বেত বস্তুকে আমরা পীত বলিয়া দেখি। শুক্তিকে রূপ্যরূপে দেখিবার বেলায় আমাদের অর্থলোভ প্রভৃতি দোষও বর্ত্তমান থাকে। যে অবস্থায় আমরা মিথ্যাবস্তু দেখিয়া থাকি সে অবস্থাতে উপযুক্ত আলোকের অভাবাদি কারণও বিদ্যমান থাকে। এই সবই দ্রষ্টার নিজের বা বিশেষ অবস্থার দোষ। কিন্তু যে কারণে আমরা মূলভূত স্বয়ংসৎবস্তু না দেখিয়া শুধু

অবভাসই প্রত্যক্ষ করতে পারি, সে কারণ আমাদের ব্যক্তিগত কোন দোষ নয়। সব মানবের সাধারণ বুদ্ধিধর্ম্মই আমাদের অবভাস প্রত্যক্ষের কারণ। ব্যক্তিগত বা বৈয়ক্তিক অবস্থাগত দৈহিক বা ভৌতিক কারণে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সার্ব্বভৌম বৌদ্ধিক কারণে অবভাস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সেইজন্য অবভাস মিথ্যা বা ভ্রান্ত নয়। আরও এক কথা কোন ভ্রম প্রত্যক্ষকে ভ্রম বলিয়া আমরা তখনই বাস্তবিক বুঝিতে পারি, যখন মিথ্যাবস্তুর স্থানে সত্য কোন বস্তু দেখিতে পাই। সত্যবস্তু না দেখা পর্য্যন্ত মিথ্যাবস্তুই আমাদের কাছে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। সত্যবস্তু জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়াই অধম মিথ্যাবস্তুকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। উত্তম সত্যবস্তুর দর্শনেই মিথ্যাবস্তুর অধমতা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং অবভাসকে যদি আমাদের মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলিতে হয়, তাহা হইলে অবভাস হইতে কোন উচ্চতর বিষয় আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা যাহা কিছুই জানি না কেন, তাহাই অবভাস হইবে। মানুষ মানবীয় বুদ্ধির সীমা কখনই অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং মানুষ যাহা কিছু জানে তৎসমস্তই তাহার বুদ্ধি সাপেক্ষ অবভাস রূপে জানে। অবভাস অপেক্ষা কোন উচ্চতর বিষয় কখনই আমাদের জ্ঞানগম্য না হওয়াতে অবভাসকে মিথ্যা বলিবার কোন কারণই কখনও উপস্থিত হয় না। অতএব অবভাস স্বয়ংসৎবস্তু না হইলেও, এবং সর্ব্বথা আমাদের বুদ্ধি সাপেক্ষ হইলেও, কখনই ভ্রান্ত বা মিথ্যা নয়।

অবভাস জ্ঞাতার স্বরূপ মাত্রই নয়, জ্ঞান মাত্রও নয়; অথচ স্বয়ংসৎবস্তুও নয়। ভ্রান্ত বিষয় মূলভূত সত্য বস্তু হইতে যতটা ভিন্ন নয়, অবভাস স্বয়ংসৎবস্তু হইতে তদপেক্ষা বেশী ভিন্ন, একথা আগেই বলা হইয়াছে। ইহাকে এক ভিন্ন রকমের বস্তু বলিয়াই আমাদের মানিতে হয়। যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে হয়ত বলিতে পারিতাম, অবভাস কোন বস্তুই নয়। আমি কি তবে বলিতে চাই, স্বয়ংসৎ এক রকমের বস্তু, আর অবভাস অন্য রকমের বস্তু? আমার অভিপ্রায় যেন এই রকমই। আমি জানি, একথা বলাতে কাণ্টের কোন কোন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারদের সঙ্গে মতদ্বৈধ হইতেছে। অধ্যাপক প্যাটন বলেন, ঠিক ঠিক বলিতে গেলে, দুই বস্তু নয়, একই বস্তু, দুই ভাবে দেখা যাইতেছে মাত্র, (১) নিজের

মাঝে যেমন আছে, (২) এবং যেমন আমাদের কাছে ভাসিতেছে। অর্থাৎ তাঁহার মতে একই বস্তু, একরূপে স্বয়ংসৎ এবং অন্যরূপে অবভাস।[১] অধ্যাপক প্যাটনের আগে প্রসিদ্ধ কান্টীয় পণ্ডিত আডিকেস্‌ও এই রকম কথা বলিয়াছেন। কেবল একটাই কিছু আছে, যাহা একদিকে যেমন আমাদের জ্ঞানানুরূপে আমাদের কাছে ভাসে, তেমনি অন্যদিকে নিজস্ব সত্তাবান্‌ও বটে।[২]

একথা অবশ্য আমি বুঝি, স্বয়ংসৎবস্তু ও অবভাস একই অর্থে দুই বস্তু নয়, অর্থাৎ যে অর্থে স্বয়ংসৎ পদার্থকে বস্তু বলা যায়, সেই অর্থে অবভাসকে বস্তু বলা যায় না। কিন্তু বস্তু (থিঙ্গ্) কথা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বয়ংসৎ পদার্থ ত এক বস্তু বটেই, এবং অবভাসকেও যদি বস্তু বলা যায় এবং অবভাস যদি স্বয়ংসৎ বস্তু হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে এখানে দুই বস্তু পাইতেছি একথা বলিতে পারিব না কেন ? আমি বলিতে চাই, অবভাসও এক রকম বস্তু বটে। ঘটপটাদিকে বস্তু বলিতে আমরা সাধারণতঃ কোন আপত্তি করি না, ঐ গুলিই ত অবভাস। এবং কাণ্টের মতে দ্রব্যত্ব সত্তা প্রভৃতি বৌদ্ধিক প্রকার অবভাসেই প্রয়োজ্য। এই সব প্রকার প্রয়োগ করিতে পারি বলিয়াই অবভাসকে বিষয়রূপে জানিতে পারি। দ্রব্যত্ব সত্তা প্রভৃতি ধর্ম্ম যদি অবভাসের থাকে, তাহা হইলে তাহা বস্তু-পদবাচ্য হইবে না কেন বুঝিতে পারা যায় না।

আমার পুরোবর্ত্তী টেবিল যে একটী বস্তু সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করে না, এবং এই টেবিল স্বয়ংসৎ বস্তু নয়, ইহাও কাণ্টের মত ; সুতরাং

১। Strictly speaking, there are not two things, but only one thing, considered in two different ways : the thing as it is in itself and as it appears to us. *Kant's Metaphysics of Experience.* Vol. I, p. 61.

২। es ist jedesmal nur ein Etwas, das einerseits uns erfahrungsmässig gegeben ist......andererseits aber auch ganz unabhängig davon ein Dasein an und für sich hat.

Kant und Das *Ding an sich*, p. 20.

স্বয়ংসৎ পদার্থ বস্তন্তর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি টেবিল ও তৎসম্পর্কিত স্বয়ংসৎ পদার্থ দুই বস্তু না হয়, তাহা হইলে তাহারা একই বস্তু; এবং আমাদের বলিতে হয়, একই বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত; কেন না কাণ্টের মতে আমরা স্বয়ংসৎ বস্তুকে জানিতে পারি না এবং টেবিলকে নিশ্চয়ই জানি। একই বস্তুকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলাতে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহা আর পৃথক করিয়া দেখাইয়া দিতে হয় না। বস্তুর একত্ব রক্ষা করিয়া এই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বলিতে হয়, বস্তু এক হইলেও তাহার দুইটী রূপ, এবং একরূপে তাহা জ্ঞাত এবং অন্যরূপে অজ্ঞাত। কিন্তু এই স্বয়ংসৎ বস্তুই যদি কোন একরূপে আমাদের দ্বারা জ্ঞাত হইল, তাহা হইলে ইহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, একথা কাণ্ট কি করিয়া বলিলেন? এই কথা বলিলেই ত হইত যে, তাহা আমরা সম্পূর্ণ-রূপে জানি না। তাহাই কি কাণ্টের অভিপ্রায়? দ্বিতীয়তঃ স্বয়ংসৎ ও অবভাসকে যদি দুই বস্তু বলা না যায়, তাহা হইলে তাহা একই বস্তুর দুই রূপ, ইহাই বা কি করিয়া বলা যায়? নিশ্চয়ই যেই অর্থে স্বয়ংসত্তা বস্তুর রূপ, সেই অর্থে অবভাসত্ব তাহার রূপ নয়। তার উপর জ্ঞাত ও অজ্ঞাতকে সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া উভয়কেই সমানভাবে এক বস্তুর রূপ বলিয়া ভাবা নিশ্চয়ই খুব সহজ নয়। তার চেয়ে স্বয়ংসৎ পদার্থও অবভাসকে দুই পৃথক্ বস্তু বলিয়া ভাবাই ত সহজ।

স্বয়ংসৎ ও অবভাসের মধ্যে যদি ঐক্য রাখিতে হয়, তাহা হইলে ত বলিতে হয়, যত স্বয়ংসৎ, তত অবভাস। যদি কোন অবভাস থাকে এবং তদভিন্ন স্বয়ংসৎ না থাকে, তাহা হইলে ত অবভাস স্বয়ংসৎ হইতে পৃথক বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। তবে কি বলিব, প্রত্যেক অবভাসেরই তদভিন্ন একটী স্বয়ংসৎ আছে? একটী ঘটের অনুরূপ কয়টী স্বয়ংসৎ আছে? এক না বহু? ঘটের বিভিন্ন অবয়ব ও ত এক একটী অবভাস। এই বহু অবয়বের জন্য কি বহু স্বয়ংসৎ মানিব? ঘটের মধ্যে যতগুলি অণু আছে, ঘটানুরূপ স্বয়ংসৎও কি ততগুলি? অন্ততঃ অবভাস যে বহু তাহা আমাদের মানিতে হয়, এবং স্বয়ংসৎ যদি অবভাসের সঙ্গে তাদাত্ম্যা-পন্ন হয়, তাহা হইলে স্বয়ংসৎকেও বহু বলিয়া আমাদের ধরিতে হয়। সেই রকম অবস্থায়, কাণ্ট যে এক যায়গায় বলিলেন, এই অবভাসিক দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে, আত্মা ও অনাত্মারূপে দুই বস্তু না থাকিয়া, মূলতঃ

একই বস্তু থাকিতে পারে, সে কথার কি অর্থ হইবে? আমি একথা বলিতেছিনা যে, কাণ্ট্ নিশ্চিতভাবে মনে করিবেন, সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে এক অদ্বিতীয় স্বয়ংসৎ বস্তু রহিয়াছে। তবে তিনি নিশ্চয়ই মনে করিতেন, এই রকম হইতে পারে। অর্থাৎ একই স্বয়ংসৎ বস্তু সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে থাকিলেও তাঁহার অন্য কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুপপত্তি হইবে না। সুতরাং আমি বলিতে চাই, কাণ্টীয় দর্শন সম্মত পদার্থের এরকম ব্যাখ্যা করিতে হইবে না, যাহাতে কাণ্ট এখানে যে সম্ভাবনার কথা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমরা অসংখ্য অবভাস অনুভব করিতেছি। তাহাদের এক একটি (প্রত্যেকটাই) যদি (কোন) এক একটি স্বয়ংসৎবস্তুর দৃশ্যরূপ হয়, তাহা হইলে ত অসংখ্য স্বয়ংসৎ বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। তাহাই কাণ্টের মত হইলে সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে একই স্বয়ংসৎ বস্তু থাকিতে পারে, একথা তিনি বলিতে পারিতেন না। সুতরাং আমাদের স্বীকার করিতে হয়, আবভাসিক জগতের মূলে এক স্বয়ংসৎবস্তু আছে, না বহু স্বয়ংসৎ বস্তু আছে সে সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিক কিছুই বলিতে পারি না। স্বয়ংসৎ বস্তুর সঙ্গে দৃশ্যমান অবভাসের যে সাদৃশ্যাদি কোন সম্বন্ধের কল্পনা করা যায় না, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। এখন বলিতে চাই, অবভাসকে স্বয়ংসৎ-বস্তুর একরূপ বলা ত দূরের কথা, স্বয়ংসৎ ও অবভাসের মধ্যে কোন সাক্ষাৎ তাত্ত্বিক সম্বন্ধই নাই। দৃশ্য সর্পের যেরকম তাহার মূলভূত রজ্জুর সঙ্গে বাস্তব কোন কোন সম্বন্ধ নাই, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। একথা সত্য যে, মূলে স্বয়ংসৎবস্তুর কোন প্রকার উত্তেজনা না থাকিলে আমাদের জ্ঞানশক্তির কোন ক্রিয়াই হইত না এবং অবভাস রূপ বিষয় ও নির্ম্মিত হইত না। কিন্তু এই বুদ্ধিনির্ম্মিত বিষয়ই যে আমাদের জ্ঞানশক্তির উত্তেজক (স্বয়ংসৎ) পদার্থের একরূপ, তাহা বলিতে যাওয়া সাহস মাত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধিনির্ম্মিত বিষয় হইতে, জ্ঞানশক্তির উত্তেজক স্বয়ংসৎ পদার্থ কিরূপ, এমন কি, এক না বহু, সে বিষয়ে আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারি না। সুতরাং এই আবভাসিক বিষয়কে স্বয়ংসৎ বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া কল্পনা করাই সমীচীন মনে হয়।

এখনই বলিলাম, স্বয়ংসৎবস্তুর সঙ্গে অবভাসের কোন বাস্তব, অন্তত: সাক্ষাৎ, সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অবভাসের কল্পনার সঙ্গে স্বয়ংসতের কল্পনা

ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত বলিয়া মনে হয়। অবভাসের কল্পনা ব্যতিরেকে স্বয়ংসতের কল্পনা করা কঠিন। অবভাস বলিতে কি বুঝায়, যদি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্বয়ংসৎবস্তু বলিতে কি বোঝা উচিত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। আমাদের জ্ঞানব্যাপারে কল্পনা শক্তি যে অনেক কিছু কাজ করে, সে কথা কাণ্ট খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়া ছিলেন। আমাদের মন বা বুদ্ধি যে নিজ থেকে অনেক কিছু দিয়া জ্ঞানের বিষয় নির্ম্মিত করে, সে বিষয়ে কাণ্টের কোন সন্দেহ ছিলনা। তাই যদি হয়, তবে ত আমাদের বলিতে হয়, জ্ঞানের বিষয় আমাদের মনগড়া রূপেই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের আদিম উপাদান প্রথমতঃ মানবীয় অনুভবের বিশিষ্ট আকারে (দেশ ও কালে) গৃহীত হইয়া, বৌদ্ধিক প্রকার পরিচ্ছেদ ধারণ করিয়া আমাদের জ্ঞানে বিষয়রূপে ভাসে। প্রকারপরিচ্ছেদরহিত বিষয়ের নগ্নরূপ কখনই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, আমাদের জ্ঞানীয় বিষয় কোন বস্তুর ঠিক ঠিক প্রতিকৃতি নয়। জলে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়; কিন্তু তরঙ্গ কখনই প্রস্তরের স্বরূপ প্রকাশ করে না। সেই রকম, যে বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমাদের জ্ঞানশক্তি বিষয় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, বুদ্ধিনির্ম্মিত বিষয় কখনই সেই বস্তুর প্রতিকৃতি হইতে পারে না। সুতরাং কাণ্ট্ বিবৃত জ্ঞান প্রক্রিয়া মানিতে হইলে জ্ঞানীয় বিষয়কে অবভাসমাত্রই বলিতে হয়। আর শুধু অবভাসই যদি জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে অবভাসের মূলে যে স্বয়ংসৎ স্বতন্ত্র বস্তুর কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য হই, সে বস্তু সর্ব্বদা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ই থাকিবে। স্বয়ংসৎবস্তু যখন অবভাস নয়, অর্থাৎ অবভাস হইতে ভিন্ন বলিয়াই যখন স্বয়ংসতের কল্পনা করিয়া থাকি, তখন তাহাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়াই ভাবিতে হয়। কাণ্ট্ যখন বলিলেন, স্বয়ংসৎবস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তখন তিনি আমাদিগকে নূতন কোন তথ্য জ্ঞাপন করিলেন না; স্বয়ংসৎ কথাটারই অর্থ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন মাত্র।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা যদি শুধু অবভাসই জানি, তাহা হইলে শুধু অবভাস নিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকি না কেন? তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র স্বয়ংসৎবস্তু মানিবার প্রয়োজন কি?

আমাদের জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বিষয় মাত্রই অবভাস, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; এবং এই বিষয় যে অনেকাংশে বুদ্ধি নির্ম্মিত তাহাও না মানিয়া পারা যায় না। কিন্তু আমাদের জ্ঞানশক্তি একেবারে নিজের থেকেই বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে না, বিষয়ের আকার জ্ঞানশক্তি নিজে দিলেও বিষয়ের উপাদান অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হয়। জ্ঞানশক্তি কিয়ৎ-পরিমাণে স্বতঃক্রিয় হইলে ও কিয়ৎপরিমাণে তাহা পরতঃক্রিয়। আমাদের বুদ্ধি নিজ থেকে বিষয়সৃষ্টি করিতে পারে না, তজ্জন্য জ্ঞানশক্তির উত্তেজক স্বয়ংসৎবস্তুর সাহায্য দরকার, একথা স্বীকার করিয়া কাণ্ট্ জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। 'আমি জানিতেছি' বা আমার জ্ঞান হইতেছে' আমাদের এই রকম বোধ হইতে হইলে জ্ঞান-শক্তিকে পরবশ হইয়া প্রবর্ত্তিত হইতে হয়। যাহা হইতে আমাদের জ্ঞানশক্তি জ্ঞানব্যাপারে এই প্রবর্ত্তনা বা উত্তেজনা পাইয়া থাকে, তাহাকেই স্বয়ংসৎবস্তু বলা হইয়াছে।

তার উপর আমাদের আরও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, শুধু সাপেক্ষ বা পরতন্ত্রবস্তু নিয়া আমাদের কাজ চলে না। অবভাস যে নিতান্ত আমাদের বুদ্ধি সাপেক্ষ, তাহা অনেকবার বলা হইয়াছে। শুধু অবভাসই আছে, স্বয়ংসৎ কিছু নাই, এই কথা বলিলে বলিতে হয় সব কিছুই পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র কিছু নাই। কিন্তু একথা আমরা ভাবিতেই পারি না। সাপেক্ষের মূলে নিরপেক্ষ, পরতন্ত্রের মূলে স্বতন্ত্র আছে বলিয়া আমরা ভাবিতে বাধ্য। সেইজন্য অবভাসের মূলে স্বয়ংসৎবস্তু আছে, একথা আমরা না ভাবিয়া পারি না। তবে স্বয়ংসৎবস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন ভাবাত্মক বোধ আমাদের নাই। আমরা জানি, আমাদের জ্ঞান ব্যাপারের মূলে স্বতন্ত্র স্বয়ংসৎবস্তু কিছু আছে, এবং তাহা অবভাস নয় ; কিন্তু তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। যে অর্থে অবভাসকে জানি, সেই অর্থে স্বয়ংসৎবস্তুকে মোটেই জানি না। কিন্তু না জানিলেও, স্বয়ংসৎবস্তু যে কিছু আছে, তাহা আমরা ভাবিতে বাধ্য। কাণ্ট্ যে তাঁহার পরবর্ত্তী ভাবপ্রবণ দার্শনিকদের মত স্বয়ংসৎবস্তুকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া শুধু অবভাস নিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তাহাতে তাঁহার দার্শনিক মহত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

অভাব প্রত্যক্ষে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য, এম. এ, বেদান্ততীর্থ।

আজ একটী অপ্রচলিত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। আশাকরি, পাঠকবর্গ এই প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়াই ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। অভাব বিষয়ক বিচারই আমরা সচরাচর পড়ি না। এই প্রবন্ধে এই অভাববিষয়ক বিচারের অতি অপ্রচলিত একাংশের আলোচনা করা হইবে। আমরা যখন যে কোন পদার্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি তখন সেই পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। এই সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়-বিষয়-সম্বন্ধের নামান্তর। এই সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের নাম লৌকিক সন্নিকর্ষ। এই ছয় প্রকার বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের আপত্তি হইতে পারে না। ন্যায় বৈশেষিক দর্শন মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ। যেমন দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্র পদার্থ সেইরূপ অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা কাল্পনিক পদার্থ নয়। ইহা অধিকরণ হইতে অভিন্ন নয়। 'ভূতলে ঘট নাই' এই বাক্যের অর্থ ভূতলে ঘটাভাব আছে। 'ভূতল একাকী আছে' এইরূপ অর্থ নয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ভূতলের দুইটী রূপ আছে। একটী ইহার সদ্রূপ ও অপরটী ইহার অসদ্রূপ। ইহার অসদ্রূপ ই অভাব পদার্থ। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তানুসারে আমরা যদি নৈয়ায়িক মত বুঝিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে দেখিব যে ভূতল একটী ভাবপদার্থ ও ঘটাভাব অভাব পদার্থ। এই ভূতল ঐ অভাবের অধিকরণ। ঘটাভাব ভূতলে আশ্রিত হইয়া থাকে। 'ঘটাভাব বিশিষ্ট ভূতল' এই স্থলে ঘটাভাব বিশেষণ ও ভূতল বিশেষ্য। ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ভূতলের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। এই ঘটাভাব বিশেষণরূপে ভূতলে থাকে। সুতরাং এই অভাবের সহিত চক্ষুর সংযুক্তবিশেষণতা সম্বন্ধ হয়। নানারূপ বিশেষণতার সাহায্যে

আমাদের অভাবের সাধারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। কোন প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় নৈয়ায়িকদের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে সাধারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা অভাবকে জানিতে পারি না। তাঁহাদের মতের বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হইবে।

অভাবের প্রত্যক্ষ বিষয়ক আলোচনা করিতে হইলে অভাব সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমরা যখনই অভাবের কথা বলি অথবা আমরা যখন অভাব প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা এই অভাবকে কোন পদার্থের অভাব বলিয়া বলি অথবা জানি। শুধু অভাবের কোন কালেই আমাদের জ্ঞান হয় না। আমাদের ঘটাভাব পটাভাব প্রভৃতির জ্ঞান হয় কিন্তু অবিশেষিত অভাবের কোন দিনই জ্ঞান হয় না। আমরা কোন দিনই বলি না যে আমরা অভাব দেখিতেছি অথবা ওখানে অভাব আছে। অভাব সব সময়েই বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হইয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। এখন দেখা যাক্ এই অভাবের বিশেষণ কোন্ পদার্থ হইয়া থাকে। 'অভাব বলিলে' এই অভাবটী কাহার অভাব তাহা বলিতেই হইবে, তাহা না বলা পর্য্যন্ত অভাবের পরিচয়, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যাহার অভাব তাহাকে অভাবের প্রতিযোগী বলা হয়। 'ঘটের অভাব' এই স্থলে ঘট এই অভাবের প্রতিযোগী ; এই প্রতিযোগী অভাবের বিশেষণ। এই প্রতিযোগীর সাহায্যে একটী অভাবকে অন্য অভাব হইতে পৃথক করিয়া আমরা বুঝিতে পারি। এই প্রতিযোগীই অভাবের সব সময়ে (নিয়ত) বিশেষণ হয় এবং অভাব ব্যক্তি সমূহের পার্থক্য জানাইয়া দেয়। প্রতিযোগিতে ধর্ম্মের নাম প্রতিযোগিতা। ঘটাভাবের অভাব ঘট। ঘটাভাবের অভাবত্ব প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার উল্লেখ করিয়া অভাবের পরিচয় দেওয়া হয় বলিয়াই এখানে প্রতিযোগিতার কথা বলিলাম। ঘট যেখানে থাকে ঘটাভাব সেখানে থাকেনা। ঘট ও ঘটাভাব পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। এখন সকলের মনেই এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ঘট যদি তাহার অভাবের বিরোধি পদার্থ হয় তাহা হইলে ঘট কিরূপে ঘটাভাবের বিশেষণ হয়, কারণ, বিশেষণ বিশেষ্যের সহিত সম্বদ্ধ হয় ইহাই হইল সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ঘট ও ঘটাভাবের বিরোধ কিরূপ স্থলে হয় তাহা বুঝিতে হইবে। তাহার পরে দেখিতে হইবে তাহাদের বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ হয় কি না।

ঘটাভাবের সহিত ঘটের বিরোধ বলিলে আমাদের বক্তব্য বিষয়টী অতি স্থূল ভাবে বলা হইল। ঘট ও তাহার অভাবের বিরোধ হয় কোন সম্বন্ধ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া। ঘট ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে এবং তাহার অবয়ব কপাল ও কপালিকাতে এই ঘটই সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ঘট সংযোগ সম্বন্ধে কপালে থাকে না। সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের অভাব কপালে আছে। নৈয়ায়িক পরিভাষানুসারে বলা হয় সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক—কপালবৃত্তি—ঘটাভাব। এর সরল অর্থ কপালে একটী অভাব ব্যক্তি আছে। এই অভাবের প্রতিযোগী ঘট। এবং এই প্রতিযোগীর সম্বন্ধ সংযোগ। এই সংযোগ সম্বন্ধ এই প্রতিযোগীর বিশেষণ এবং এই সম্বন্ধ এই প্রতিযোগীকে অন্য প্রতিযোগী হইতে পৃথক করিয়া দেয়। সমবায় সম্বন্ধে ঘট কপালে থাকিলেও সেই ঘটাভাব এই কপালে থাকিতে পারে যে ঘটাভাবের প্রতিযোগী সংযোগসম্বন্ধ দ্বারা বিশেষিত। সুতরাং ঘটের সহিত ঘটাভাবমাত্রের বিরোধ নাই। নৈয়ায়িকদের মতে অভাব তাহার প্রতিযোগীতে প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে থাকে এবং প্রতিযোগী তাহার অভাবে প্রতিযোগিতাকত্ব সম্বন্ধে থাকে। অতএব প্রতিযোগী তাহার অভাবের বিশেষণ হইতে পারে।

এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করি। অভাবের প্রত্যক্ষ কেমন করিয়া হইয়া থাকে তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে করিব না। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অভাবের প্রত্যক্ষ সাধারণ সন্নিকর্ষের দ্বারা হয় না, অসাধারণ সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা আছে, যদি থাকে তাহা হইলে সেই অসাধারণ সন্নিকর্ষটী কি? কোন একটী ব্যক্তির অভাবকে আমরা বিশেষাভাব বলি। এক জাতীয় সকল ব্যক্তির অভাবকে আমরা সামান্যাভাব বলি। ক এর বাটীতে খ এর বাটীতে যে ঘট আছে সেই ঘট নাই। ক এর বাটীতে অন্য ঘট থাকিলেও খ এর বাটীর ঘট নাই। ক এর বাটীতে উক্ত ঐ ঘটের অভাব আছে। ইহা ঘটের বিশেষাভাব, অর্থাৎ বিশিষ্ট ঘটের অভাব। গ এর বাটীতে যদি কোন ঘটই না থাকে তাহা হইলে এই ঘটাভাব ঘটসামান্যের অভাব। ইহার নাম ঘটসামান্যাভাব। নৈয়ায়িক মতে ঘটের সামান্যাভাব প্রত্যেক ঘট ব্যক্তির যত অভাব আছে তাহার সমষ্টি নয়, ইহা একটী অতিরিক্ত অভাব। ঘটের সামান্যাভাবকে কেন অতিরিক্ত বলা হয় তাহা এ প্রবন্ধে আলোচিত

হইবে না। এখন আমরা ধরিয়া লইব যে ঘটের সামান্যাভাব একটী অতিরিক্ত অভাব। এই ঘটসামান্যাভাবের প্রতিযোগী কে? এরং প্রতিযোগীর অন্য কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, শুধু এই কথা বলিলেই চলিবে যে ইহার প্রতিযোগিমাত্রই ঘটত্বের দ্বারা বিশেষিত। সকল ঘট ব্যক্তির সামান্য ধর্ম্ম ঘটত্ব। এই ঘটত্বের দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তি মাত্রই এই ঘটাভাবের প্রতিযোগী। প্রতিযোগীকে না জানিলে অভাব জানা হয় না। ঘটত্বের দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তি অসংখ্য। তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যখন 'এই ঘট' এইরূপে একটী ঘটকে জানি তখন ঘট ব্যক্তি এবং ঘটত্ব জাতি জানি। এই ঘটত্ব জাতি পরম্পরা সম্বন্ধে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই ঘটত্ব জাতির সহিত সকল ঘটব্যক্তির সম্বন্ধ আছে। কারণ ঘট ব্যক্তিকে ঘট রূপে বুঝিতে হইলেই তাহার সহিত ঘটত্ব জাতির সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। এই ঘটত্বের সাহায্যে আমরা সকল ঘট ব্যক্তিকে জানিয়া থাকি। এস্থলে ঘটত্বই সন্নিকর্ষের কাজ করিয়া থাকে। এই সন্নিকর্ষের নাম সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ। ইহারই সাহায্যে আমাদের সকল ঘটব্যক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে। এইভাবে সকল ঘটব্যক্তি জ্ঞাত হইলে আমাদের ঘটাভাব জ্ঞান সম্ভবপর হয়। অতএব ঘটাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা আছে। ইহাই প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে একদল নব্যনৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন যে সকল প্রতিযোগীর জ্ঞান না হইলে যে সামান্যভাবের জ্ঞান হয় না একথা বলা চলে না। প্রতিযোগীর যে ধর্ম্ম সকল প্রতিযোগিতেই থাকে এবং এবং প্রতিযোগি ভিন্ন অপর কোথাও থাকেনা তাহাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলে। যেমন ঘট-সামান্যাভাবের প্রতিযোগী সকল ঘটব্যক্তি। সমস্ত ঘটব্যক্তিতেই ঘটত্ব থাকে। এই ঘটত্ব ঘট ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিতে থাকে না। এই ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব। এই ঘটত্বের দ্বারা বিশেষিত যে কোন ঘটজ্ঞান ঘটাভাব প্রত্যক্ষের কারণ। অতএব ঘটের সামান্যাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সকল ঘট ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সকল ঘটব্যক্তির সামান্যাকারে প্রত্যক্ষের নাম ঘটের অলৌকিক প্রত্যক্ষ। অতএব ঘটের

সামান্যাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই।

রঘুনাথ শিরোমণি বলেন যে অভাব প্রত্যক্ষের হেতুরূপে প্রতিযোগি-জ্ঞানের কোনই আবশ্যকতা নাই। অভাবজ্ঞানটীর আকার কিরূপ তাহা দেখা যাক্। অভাবজ্ঞানে অভাব বিশেষ্য হয়। এই অভাবের প্রতিযোগী এই অভাবের বিশেষণ হয়। এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এই প্রতিযোগীর বিশেষণ হয়। এই অভাবজ্ঞানে বিশেষ্যের বিশেষণ আছে এবং এই বিশেষণেরও বিশেষণ আছে। এখন একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়টী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ ইহা একটী জ্ঞান। এই জ্ঞানে অভাব বিশেষ্য। ঘট এই অভাবের প্রতিযোগী। ইহা এই অভাবের বিশেষণ। এবং ঘটত্ব এই প্রতিযোগীর বিশেষণ। এইস্থলে ঘটত্বই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। যে জ্ঞানের বিশেষ্য বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হয় এবং এই বিশেষণের বিশেষণ থাকে তাহাকে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বোধ বলে। বিশেষণের বিশেষণকে বিশেষণতা-বচ্ছেদক বলে। যে জ্ঞানের যেটী বিশেষণ হয় তাহাকে সেই জ্ঞানের প্রকার বলে। যে জ্ঞানের ঘট বিশেষণ হয় তাহাকে ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞান বলে। যে জ্ঞানে বিশেষণতাবচ্ছেদক বিশেষণ হয় তাহাকে বিশেষণতা-বচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান বলে। বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান কারণ। ঘটাভাব জ্ঞান বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রতি ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞান কারণ। এই ঘটত্ব জ্ঞানই বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান। এই স্থলে ঘটত্ব বিশেষণ ঘটের বিশেষণ। এই ঘটপ্রকারকজ্ঞানই ঘটাভাব জ্ঞানের প্রতি হেতু। ঘটাভাব প্রত্যক্ষের কারণ ঘটজ্ঞান নয় কিন্তু ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞান। অতএব সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। এখন আপত্তি উঠিতে পারে অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগিজ্ঞান যদি কারণ না হয় তাহা হইলে প্রতিযোগিশূন্য অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? অর্থাৎ আমরা ঘট নাই একথা বলি কেন, আমাদের বলা উচিত শুধুই 'নাই'। এর উত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি বলিতে পারেন যে অভাবের প্রতিযোগিদ্বারা অবিশেষিত হইয়া যে প্রত্যক্ষ হয় না তাহার অন্য কারণ আছে। অভাবপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবিশেষ যে কারণ তাহা সকলকেই

স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞানেও ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বিশেষের সাহায্যে এই অভাবের প্রত্যক্ষ উৎপাদিত হইয়া থাকে, এই জন্যই কেবলমাত্র অভাবের জ্ঞান হয় না।

এই মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বকথিত নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শিষ্যেরা অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। সেই দোষগুলির এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব না, কারণ, এই দোষগুলি উভয়পক্ষের সাধারণ দোষ এবং এই দোষগুলির উদ্ধারের পথও একই ধরণের। কিন্তু তাঁহারা একটা বিশেষ দোষ দেখাইয়াছেন। সেই দোষটীর আলোচনা এই প্রবন্ধে করিব। রঘুনাথ শিরোমণির মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ এই মত গ্রহণ করিলে আমাদের বড় দীর্ঘাকারের কার্য্য ও কারণ মানিতে হয়। তাঁহার অভাব জ্ঞান বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধ। অর্থাৎ এই জ্ঞানটী এমন একটী কার্য্য যাহার বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি অনেকগুলি অংশ আছে। এই জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে। এই জ্ঞানের কারণ বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান। এই জ্ঞানের আকারও বেশ বড়। এই জ্ঞানও সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে। এই কার্য্যজ্ঞান ও ও কারণজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মারূপ একই আধারে থাকে। কার্য্য ও কারণের অন্য কোন দোষ নাই বটে কিন্তু এই পথটী বড়ই দীর্ঘ। যাঁহারা প্রতিযোগিজ্ঞানকে অভাব জ্ঞানের কারণরূপে বলেন তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের পথটী আরও স্বল্প।

তাঁহাদের মতে অভাবপ্রত্যক্ষকে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান বলিয়া বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। অভাবপ্রত্যক্ষকে শুধু বিশিষ্ট জ্ঞানরূপে বুঝিলেই চলিবে। অভাব বিশেষ্য ও প্রতিযোগী বিশেষণ। প্রতি-যোগীর বিশেষণ অভাবের জ্ঞান কালে জ্ঞাত হয় কি না তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। যে জ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণ প্রতীয়মান হয় তাহাকে বিশিষ্ট জ্ঞান বলে। এই অভাব জ্ঞানের বিষয় অভাব। সকল জ্ঞান যেরূপ বিষয়তা সম্বন্ধে স্বীয় বিষয়েতে থাকে এই জ্ঞানও সেইরূপ বিষয়তা সম্বন্ধে অভাবেতে থাকে। এই অভাব জ্ঞানের প্রতি কারণ জ্ঞান। এখন দেখা যাক্ কিরূপ জ্ঞান কারণ। তাঁহারা বলেন যে জ্ঞান পরম্পরা সম্বন্ধে অভাবে থাকে সেই জ্ঞান কারণ। সেই পরম্পরা সম্বন্ধটী হইতেছে স্বপ্রকারীভূত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব সম্বন্ধ। এখন এই সম্বন্ধটীর

বিশেষ বিবরণ প্রয়োজনীয়। প্রত্যক্ষের বিষয় যে অভাব সেই অভাবে প্রতিযোগিতাকত্ব সম্বন্ধে প্রতিযোগী থাকে। এবং এই প্রতিযোগী প্রতিযোগিজ্ঞানের বিষয়। এবং এই প্রতিযোগী প্রতিযোগিজ্ঞানের বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হয়। এই জ্ঞানর প্রতিযোগীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে এবং প্রতিযোগীর সহিত অভাবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এই জ্ঞানের প্রতিযোগীকে দ্বার করিয়া অভাবের সহিত সম্বন্ধ ভালভাবেই স্থাপিত হইতে পারে। এখানে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধ মিশিয়া একটী জটিল সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে শুধু জ্ঞান ও এই সম্বন্ধের কথা বলিলেই আমরা প্রতিযোগিজ্ঞানকে পাইব। কারণ অন্য কোন জ্ঞান এই সম্বন্ধে অভাবের সহিত সম্বদ্ধ হয় না। কার্য্য ও কারণের অবয়ব ক্ষুদ্র করিয়া আমরা সম্বন্ধের আকার যতই বড় করিনা কেন তাহাতে দোষ হয় না। ইহারই নাম সম্বন্ধ মুদ্রা। এই প্রক্রিয়ানুসারে কার্য্য এবং কারণ উভয়ই স্বল্পাকার। কার্য্য বিশিষ্টজ্ঞান এবং কারণ জ্ঞান। অতএব এই মতে কার্য্যকারণ ভাবের লাঘব দেখান হইয়াছে।

রঘুনাথের পরবর্ত্তী আরও নবীন নৈয়ায়িকের দল বলেন যে প্রতি-যোগিজ্ঞানকে অভাব প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রতি-যোগিদ্বারা অবিশেষিত অভাবের প্রত্যক্ষের আপত্তি এই নিয়মানুসারে বারণ করা যায় না। তাঁহারা একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্তটী ভ্রমজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। ঘটজ্ঞানের বিরোধী অভাব ঘটের অভাব নয়। এইরূপ নিশ্চয় হইলে আমাদের ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঘটরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকিলেও আমাদের এইস্থলে ঘটাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। এই অভাব ঘটাভাব নয় এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে 'ঘটাভাবের জ্ঞান' উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা ঘটাভাব নয় এই নিশ্চয় 'ইহা ঘটাভাব' এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক। যাহা থাকিলে যাহা উৎপন্ন হয় না তাহাকে তাহার প্রতিবন্ধক বলে। ক থাকিলে যদি খ উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে ক খ এর প্রতিবন্ধক। আমার নিশ্চয় ভ্রমাত্মক হইলেও ইহা প্রতিবন্ধক হয়। এইরূপ স্থলে ঘট বিশেষিত অভাব বুদ্ধি হইতে পারে না। শুধুই 'নাই' এইরূপ জ্ঞান হয় ইহা বলিতে হইবে।

এই সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রতিবাদী বলেন যে ইহা ঘটাভাব নয়। এইরূপ জ্ঞানেও ঘট বিশেষণ হইতেছে। এই প্রতিবন্ধক জ্ঞান ঘটদ্বারা বিশেষিত হওয়ায় এইরূপ প্রতিবন্ধক জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এইরূপ প্রতিবন্ধক জ্ঞান যদি সম্ভবপর না হয় তাহা শুধু অভাবের প্রত্যক্ষ যে উৎপন্ন হয় সেপক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকেরা অপর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন এবং বলেন যে এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাশূন্য অভাবের জ্ঞান হইতে পারে। অভাব প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন। এখানে ঘটাভাবের নাম না করিয়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘট বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট ঘটাভাবই হইয়া থাকে। ঘট বিশিষ্ট হইতে ভিন্ন এই রূপ নিশ্চয় থাকিলে ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব এই স্থলে প্রতিযোগিবিযুক্ত অভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এইরূপ স্থলে প্রতিযোগিজ্ঞানকে যাঁহারা অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি হেতু বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারাও অভাবভেদকে হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। এবং এইজন্যই প্রতিযোগিজ্ঞানকে অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন যুক্তি দেখা যায় না। যদি কোন স্থলে প্রতি-যোগিজ্ঞান ব্যতীত অভাবপ্রত্যক্ষ সম্ভবপর হয় তাহা হইলে প্রতিযোগি-জ্ঞানকে অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কি রাজশাসন থাকিতে পারে ?

অপর নৈয়ায়িক দল বলিয়া থাকেন যে অভাবের প্রতিযোগিবিযুক্ত-ভাবে প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে কোনই দোষ হয় না। 'শূন্য' এই প্রকার জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে। এবং এই জ্ঞান প্রামাণিক। প্রতিযোগি-জ্ঞানকে অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া মানিবার পক্ষে কোনই প্রমাণ নাই।

উপসংহারে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের মত নব্য নৈয়ায়িকগণ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিযোগ্যবিশেষিত অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ অভাবের বাস্তবতা আরও দৃঢ়-ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই অভাব কল্পিত পদার্থ নয়। এই অভাব

অধিকরণ হইতে অভিন্নও নয়। কিন্তু অভাব যখন প্রতিযোগিবিশেষিত হইয়া প্রত্যক্ষ হয় তখন প্রতিযোগীর জ্ঞান কিরূপে হয় তাহা পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ ভাল করিয়া বিচার করেন নাই। অভাব প্রত্যক্ষের পক্ষে প্রতিযোগিজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিলেও সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা যে নাই তাহা সকল নব্য নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত।

নাথযোগদর্শন

(শিবশক্তিতত্ত্ব)

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ।

যোগদর্শন বলিলে সাধারণতঃ মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত দর্শন বুঝায়, এবং তদনুগত সাধনমার্গ ই যোগমার্গ নামে অভিহিত হয়। নাথযোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যোগ দর্শন ও যোগ মার্গ একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাথযোগিসম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট সাধারণতঃ হঠযোগী বলিয়া পরিচিত হইলেও, হঠযোগ এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গের একটি বিশেষ অংশমাত্র। এই অংশ বিশেষ সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের সাধকগণ বিশেষজ্ঞ। মানুষ সুনিয়ত অনুশীলন দ্বারা তাহার দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর কিরূপ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, দেহের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি যন্ত্রের ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন করিতে পারে, স্বীয় প্রাণশক্তি ও মনঃশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া কতদূর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, হঠযোগিগণ এবিষয়ে গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে বহুল গবেষণা করিয়াছেন এবং অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। হঠযোগদ্বারা মানুষ দেহেন্দ্রিয়মনের প্রভু হয়। কিন্তু দেহ, প্রাণ ও মনের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাতেই তাঁহাদের সাধনার শেষ নহে। ইহা দ্বারা যে দিব্যশক্তি ও দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহার সাহায্যে বিশ্বের মূলীভূত চরম তত্ত্বের নিরাকরণ সাক্ষাৎকারই তাঁহাদের সাধনার আদর্শ। চরম তত্ত্বকে নিজের ভিতরে—নিজের আত্মার আত্মারূপে—উপলব্ধি করিয়া এবং সেই চরম তত্ত্বের দৃষ্টিতে বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় রহস্য অবগত হইয়া, সর্ব্ব প্রকার বন্ধন ক্ষুদ্রতা মোহ ও দুঃখ হইতে আত্যন্তিক বিমুক্তিলাভ এবং সমস্ত বিশ্বের উপর সম্যক্ নাথত্ব বা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁহারা মানব জীবনের লক্ষ্যস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করেন। জ্ঞানে পূর্ণতা, প্রেমে পূর্ণতা, শক্তিতে পূর্ণতা ও শান্তিতে পূর্ণতা লাভ করিয়া মানুষ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে, নিত্যসিদ্ধ নিত্যপরিপূর্ণ পরমেশ্বরের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্নতা উপলব্ধি

করিবে, মানবতার এই সুমহান্ দাবী লইয়া নাথযোগিগণ সাধন সমরে প্রবৃত্ত হন। স্বীয় দেহমন প্রাণকে আয়ত্ত করা ও তদুদ্দেশ্যে হঠযোগের অনুশীলন করা এই সাধনার প্রথম সোপান।

নাথযোগিগণ আপনাদের সম্প্রদায়কে "সিদ্ধ-সম্প্রদায়" বলিয়া ঘোষণা করেন। সাধনাদ্বারা যাঁহারা অভীপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ। সুতরাং জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে, শান্তিতে যাঁহারা আদিনাথ যোগীশ্বর শিবের সহিত একীভাবসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ সিদ্ধ ও নাথ নামের যোগ্য। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এরূপ অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষাৎকৃত তত্ত্ব ও অবলম্বিত সাধন পদ্ধতিই এই সম্প্রদায়ের সাধ্যসাধন বিষয়ক মতবাদের ভিত্তি, ঐ সিদ্ধগণের জীবন নিজেদের জীবনের ভিতরে সম্যক্‌সত্য করিয়া তোলাই সাধকগণের জীবনাদর্শ,—এই প্রকার বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যেই সমস্ত সম্প্রদায়কে সিদ্ধ যোগিসম্প্রদায় বলা হইয়া থাকে।

যোগিগুরু গোরক্ষনাথ এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক না হইলেও সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য। বেদান্তি-সম্প্রদায়ে আচার্য্য শঙ্করের যে স্থান, নাথ যোগিসম্প্রদায়ে গোরক্ষনাথেরও সেই স্থান। ভগবান্ বুদ্ধের পরে আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত যোগিগুরু গোরক্ষনাথের ন্যায় আর কোন মহাপুরুষই আধ্যাত্মিক জীবনের উপর স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের এমন বিশাল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এবং ভারত বহির্ভূত অনেক দেশেও নাথ সাম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মঠ মন্দির আশ্রম ও শাখা-সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র গোরক্ষনাথের অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। সম্প্রদায় মধ্যে গোরক্ষনাথ সাক্ষাৎ শিবাবতার বলিয়া পূজিত। তিনি অমর এবং এখনো দিব্য দেহে লোক সমাজের কল্যাণ বিধান করিতেছেন,—সম্প্রদায়িক সাধকগণ ইহা অকপটভাবে বিশ্বাস করেন।

গোরক্ষনাথ ঠিক কোন্ সময়ে ও কোন্ প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,

তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অদ্ভুত মতভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব প্রভৃতি অনেক প্রদেশ তাঁহাকে আত্মজ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল বিভিন্ন কিম্বদন্তী অবলম্বনে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা সময়ে কল্পিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক মতে তিনি সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগেই লোক কল্যাণার্থে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকট বলিয়া থাকেন। যাহা হৌক, ঐতিহাসিক তথ্যালোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নাথ সম্প্রাদায়ে সংস্কৃতে ও প্রাদেশিক ভাষায় সাধ্যসাধন বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ নিজেও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রধানতঃ যোগ সাধনার পদ্ধতি নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে দার্শনিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি' একখানা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থ। প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই গোরক্ষনাথের দার্শনিক মতবাদ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। গ্রন্থখানি পদ্যপদ্যাত্মক।

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির প্রথম শ্লোক এই,—

আদিনাথং নমস্কৃত্য শক্তিযুক্তং জগদ্গুরুম্।
বক্ষ্যে গোরক্ষনাথোঽহং সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিম্॥ ১।১॥

—শক্তিযুক্ত জগদ্গুরু আদিনাথকে নমস্কার করিয়া আমি গোরক্ষনাথ সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি বলিব।

গোরক্ষনাথ গ্রন্থকর্ত্তা। আদিনাথ নাথসম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক এবং গোরক্ষনাথের গুরুর গুরু পরমগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে তিনি শক্তিযুক্ত ও জগদ্গুরু বলিয়া খ্যাপন করিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন। এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আদিনাথ গ্রন্থকর্ত্তার দৃষ্টিতে তত্ত্বতঃ সকল নাথের আদি, সকল যোগীর চিরন্তন আদর্শ, যোগীশ্বর মহাদেব। তিনিই পরমতত্ত্ব। এই পরম অদ্বয় তত্ত্ব শিব 'শক্তিযুক্ত' ও 'জগদ্গুরু'। এই শিবতত্ত্বই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

শিব নিত্যশক্তিমান্। তিনি এক অদ্বিতীয় সর্ব্ববিধপরিচ্ছেদরহিত। তাঁহার শক্তি স্বরূপতঃ তাঁহার সহিত অভিন্ন। সুতরাং শক্তির সত্তায় তাঁহার মধ্যে কোনরূপ দ্বৈতভাব হয় না। "শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরাভ্যন্তরে শিবঃ। অন্তরং নৈব জানীয়াৎ চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব।" ৪।২৬। শিব সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার শক্তি সচ্চিদানন্দময়ী। কিন্তু শক্তির সংকোচ-বিকাশ আছে, ব্যক্তাব্যক্ত ভাব আছে, ক্রিয়ার ভিতরে অভিব্যক্তি এবং ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় স্বস্বরূপে অবস্থিতি আছে। এই প্রকার পরিণাম আছে বলিয়াই তাহা শক্তি নামে অভিহিত হয়। "সর্ব্বশক্তি প্রসরসংকোচাভ্যাং জগৎসৃষ্টিঃ সংহৃতিশ্চ ভবত্যেব ন সন্দেহঃ"—১।২০। কিন্তু পরিণামের আত্মা অপরিণামী। অপরিণামী সৎস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব ব্যতীত পরিণামিনী সত্তার কোন অর্থই হয় না। পরিণাম ও অপরিণাম এক তত্ত্বেরই দুই অঙ্গ। "ন শিবেন বিনা শক্তিঃ ন শক্তিরহিত শিবঃ।" ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের প্রত্যয় অপরিণাম বা স্থিতিশীলতার প্রত্যয়সাপেক্ষ এবং অপরিণাম বা অপরিবর্ত্তনের প্রত্যয়ও পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের প্রত্যয় সাপেক্ষ। শুধু পরিণাম বা শুধু অপরিণাম, শুধু গতি বা শুধু স্থিতির কোন ধারণা সম্ভব নয়।

স্থূল দৃষ্টিতে স্থিতি ও গতির পরস্পরসাপেক্ষত্ব প্রতীয়মান হয়, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াই যে পরস্পরের সত্তা, তাহা অনুভূতিগোচর হয়। একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে আরো দেখা যায় যে, যাহা আপাততঃ স্থির, গতিহীন, পরিণামবিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও একান্তভাবে স্থির নয়, তাহার মধ্যেও গতি চলিতেছে, তাহাও পরিণাম-প্রবাহেরই সমন্বিত অবস্থাবিশেষ; আবার যেখানে কেবল গতি বা পরিণামই দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার মধ্যেও কথঞ্চিৎ স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। অতিক্রত পরিণামশীল পদার্থ প্রায়শঃ স্থির অচঞ্চল অপরিণামী বলিয়াই অনুভূত হয়, আবার নিত্য অচ্যুতস্বভাব পরিণামরহিত বস্তুর মধ্যেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম পরিণাম আবিষ্কৃত হয়। স্থিতি ও গতির ভেদ, নিত্যত্ব ও পরিণামিত্বের পার্থক্য বস্তুতঃ আপেক্ষিক বলিয়াই বোধ হয়।

সূক্ষ্ম আলোচনায় ইহাই নিরূপিত হয় যে, পরম পরাকাষ্ঠার অবস্থায় গতি ও স্থিতি, পরিণাম ও একত্ব, পরস্পরের সহিত অভিন্ন স্বরূপে প্রতি-

স্থিত—শক্তি ও বস্তু তখন এক হইয়া যায়, কাল ও মহাকালের কোন ভেদ থাকে না। (Absolute Motion and Absolute Rest,—Time and Eternity, are found to be identical.) এ বিষয়ে সাধারণ আলোচনার অবকাশ এখানে নাই।

নাথযোগিগণ গতির মূল উপাদানকে বলেন শক্তি, এবং স্থিতির উপাদানকে বলেন শিব, এবং শিব ও শক্তিকে বলেন তত্বতঃ অভিন্ন। শক্তি নিয়ত পরিণামশীলা অবিরাম ক্রিয়াময়ী বহুরূপরূপান্তরপ্রসবিনী বিশ্বজননী ; শিব অপ্রচ্যুতস্বরূপ, সকল পরিণাম ও ক্রিয়ার উদাসীন দ্রষ্টা ও সম্ভোক্তা, অসংখ্যরূপরূপান্তরের নিত্য অভেদভূমি, এক অদ্বিতীয় স্বয়ংজ্যোতি পরমাত্মা। তত্বতঃ উভয়ই এক, অভিন্ন। শক্তি ও তাহার ক্রিয়াপ্রবাহকে তাঁহারা মিথ্যা বলেন না, বিশ্বপ্রপঞ্চকে রজ্জু সর্পবৎ অজ্ঞান-প্রসূত বলেন না। শক্তি ও তাহার পরিণাম দ্বারা শিবের অদ্বৈতত্ব হানি হয় বলিয়াও তাঁহারা মনে করেন না। শক্তির ক্রিয়ার ভিতরে তাঁহারা শিবেরই প্রকাশ দর্শন করেন.

শিবময়ী শক্তির আত্মপরিণামেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি। সৃষ্টি দ্বিবিধ—ব্যষ্টি সৃষ্টি ও সমষ্টিসৃষ্টি। বহু ব্যষ্টির মধ্যে ঐক্যসূত্রের বিকাশেই সমষ্টি সৃষ্টি। নাথযোগিগণ ব্যষ্টিকে বলেন 'পিণ্ড' এবং সমষ্টিকে বলেন 'ব্রহ্মাণ্ড'। পিণ্ডরূপ শক্তিপরিণাম দ্বারা যেমন বহুত্বের বিস্তার সাধিত হইতে থাকে, তাহাদের মধ্যে ঐক্যসূত্রের বিকাশ দ্বারা তেমনি সমষ্টিসৃষ্টি হইতে থাকে, ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইতে থাকে। প্রত্যেক পিণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত, এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পিণ্ডেরই বিরাটরূপের অভিব্যক্তি। অদ্বিতীয়া সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি সৃষ্টিকালে অনন্তপিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডজননী অনন্তপিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী, এবং শিব তাঁহার এই অনন্ত লীলা-পরিণামের 'উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ'। প্রলয়কালে এই অনন্তপিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড সেই শক্তির মধ্যে পরিণামাভিব্যক্তিবিহীন অব্যক্ত শক্তিরূপেই বিলীন থাকে। তখন শক্তির স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা এবং শিবের সহিত সম্যক্ অভিন্নভাবে অবস্থিতি। শক্তির তখন পরিণামের পরাকাষ্ঠা বলিয়াই সে অবস্থায় স্থিতি ও গতির কোন ভেদ নাই, স্বরূপ ও ক্রিয়ার কোন ভেদ নাই। শিবেরও তখন কোন উপাধি নাই। শক্তি তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়াই তখন তাঁহাকে শক্তিমান্ বলারও কোন অর্থ নাই, সকল

জ্ঞান, সকল গুণ, সকল ঐশ্বর্য্য তদভিন্না শক্তির মধ্যে অভেদভাবে বিলীন বলিয়াই তখন জ্ঞান গুণ বা ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে আরোপ করা চলে না।

গোরক্ষনাথ বিশ্বাতীত চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

যদা নাস্তি স্বয়ং কর্ত্তা কারণং চ কুলাকুলম্।
অব্যক্তং চ পরং ব্রহ্ম অনামাবিদ্যতে তদা ॥ ১।৪

—যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্য জগতের সত্তা নাই, সুতরাং কারণ এবং কর্ত্তারও সত্তা নাই, তখন অব্যক্ত অনাম পরব্রহ্মই স্বরূপতঃ বিদ্যমান।

কার্য্যের সম্পর্কেই কারণত্ব ও কর্ত্তৃত্ব। উৎপত্তিস্থিতিধ্বংসশীল কার্য্য-জগতের যখন অভাব, তখন যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে কারণও বলা যায় না, কর্ত্তাও বলা যায় না। তখন যে কিছুই থাকে না, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু কিছু না থাকিলে বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তিই হইতে পারিত না। যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহার কোন গুণ, কোন বিশেষণ, কোন নাম নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়, যেহেতু গুণমাত্রই বস্তুকে বিশেষিত করে, বস্ত্বন্তর হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করে এবং তদ্দ্বারা বস্ত্বন্তরের সত্তা সূচনা করে, এবং সার্থক নামমাত্রই গুণবাচক বিশেষণকল্প। অতএব বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত মূল তত্ত্ব নামরূপাদিবিহীন, কর্ত্তৃত্ব-কারণত্বাদিবিহীন, সর্ব্ববিধপরিচ্ছদবিহীন এক সদ্‌বস্তু। তাহা অব্যক্ত, কিন্তু স্বপ্রকাশ। সেই সদ্‌বস্তুই বেদান্তে ও শ্রুতিতে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়, নাথ-যোগীদের গ্রন্থে শিব শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়।

কর্ত্তৃত্ব-কারণত্বাদি ধর্ম্ম তাহার মধ্যে ব্যক্ত না থাকিলেও, এসব ধর্ম্মের সম্ভাবনা তাহার মধ্যে অবশ্যই আছে, এই কার্য্যজগৎই ইহার প্রমাণ। যখন কার্য্য নাই, তখন কারণ বা কর্ত্তাও নাই; কিন্তু কার্য্য যখন তাহা হইতে সৃষ্ট হয়, তখন কারণত্ব ও কর্ত্তৃত্বের বীজ তাহার মধ্যে অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই বীজ তাহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই বীজই শক্তি নামে অভিহিত। যোগিগুরু বলিতেছেন—

স্বয়মনাদিসিদ্ধম্ একমেব অনাদিনিধনং সিদ্ধসিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধম্। তস্য ইচ্ছামাত্রধর্ম্মা ধর্ম্মিণী নিজা শক্তিঃ প্রসিদ্ধা ॥১।৫॥

—স্বয়ং অনাদিসিদ্ধ অনাদিনিধন একই সিদ্ধগণের (তত্ত্বদর্শিগণের) সিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধ। তাহার 'নিজা শক্তি' (স্বাভিন্না স্বস্বরূপভূতা নিত্যা

শক্তি) প্রসিদ্ধা। ইচ্ছামাত্রই সেই শক্তির ধর্ম্ম, সেই শক্তি ইচ্ছামাত্রধর্ম্মের ধর্ম্মিণী। পরমার্থতঃ এই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিণীর কোন ভেদ নাই, এবং এই নিজা শক্তি ও সেই নিত্য নির্ব্বিকার নামরূপক্রিয়াদিরহিত অদ্বিতীয় তত্ত্বেরও কোন ভেদ নাই। অথচ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় এই শক্তি পরিণামময়ী ও তাহার আত্মস্বরূপ এক নিত্য কূটস্থ, শক্তি বিশ্বজননী ও এক বিশ্বাত্মা বিশ্বপ্রকাশক বিশ্বাধিষ্ঠান। এই একই বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম, নাথযোগী উপাসকগণের শিব।

এই অনাদিসিদ্ধ অনাদিনিধন নামরূপ পরিণামাদিরহিত অদ্বিতীয় শিবের স্বরূপভূতা অনাদিসিদ্ধা অনাদিনিধনা নিত্যপরিণামময়ী ইচ্ছামাত্র ধর্ম্মা 'নিজাশক্তির' ক্রমবিবর্ত্তনে কি পদ্ধতিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের ক্রমাভিব্যক্তি হয়, এবং তদ্দ্বারা কি পদ্ধতিতে শিবের বিচিত্রোপাধিবিশিষ্ট স্বরূপের প্রকাশ হয়, 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি'তে সিদ্ধগুরু গোরক্ষনাথ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতিনির্দ্দেশের অবতরণিকায় তিনি বলিয়াছেন,—

> নাস্তি সত্যবিচারেঽস্মিন্ উৎপত্তিশ্চাণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
> তথাপি লোকবৃত্তার্থং বক্ষ্যে সৎসম্প্রদায়তঃ ॥ ১।২

—এই দর্শনে পারমার্থিক বিচারে অণ্ড ও পিণ্ডের (সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের ও ব্যষ্টিদেহের) উৎপত্তি (অর্থাৎ আদি সৃষ্টি) নাই। (শক্তির পরিণাম ও বিকাশ সঙ্কোচ এবং তদ্ধেতুক পিণ্ডাণ্ডকসৃষ্টিপ্রবাহ বস্তুতঃ অনাদি ও অনন্ত; কোন বিশেষ কালে ইহার আরম্ভও হয় নাই, কোন বিশেষকালে ইহার শেষও হইবে না।) তথাপি লৌকিকভাবে কালিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রদর্শনার্থে সৎসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তানুসারে ইহা বর্ণন করিব।

পরমব্রহ্ম শিবের স্বরূপভূতা 'নিজা শক্তি' চারিটী স্তরে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া বিশ্বসৃষ্টির কারণ হইয়া থাকে। এই চারিটী স্তরের নাম যথাক্রমে 'পরাশক্তি', 'অপরাশক্তি', 'সূক্ষ্মাশক্তি', 'কুণ্ডলিনী শক্তি'। শক্তির এইরূপ ক্রমবিকাশেই শিবের জ্ঞান গুণ বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি বিশেষণের বিকাশ।

নিজাশক্তিতে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই, গুণ ও গুণীর ভেদ

নাই, আশ্রিত ও আশ্রয়ের ভেদ নাই, জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়ার ভেদ নাই, প্রকাশ প্রবৃত্তি ও স্থিতির ভেদ নাই। আত্যন্তিক অভেদভূমি এই নিজা-শক্তির স্বভাবে যোগিগুরু পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"নিত্যতা নিরঞ্জনতা নিস্পন্দতা নিরাভাসতা নিরুত্থানতা ইতি পঞ্চগুণা নিজাশক্তিঃ' ১।১০ (১) নিত্যতা—নিজাশক্তি নিত্যা, তাহার প্রাগভাবও নাই, ধ্বংসাভাবও নাই। (২) নিরঞ্জনতা—তাহার কোন প্রকার মালিন্য নাই, রাগদ্বেষাদি কোন প্রকার দোষ নাই। (৩) নিস্পন্দতা—তাহার মধ্যে কোন প্রকার স্পন্দন নাই, বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য নাই, স্থিতি ও গতির ভেদ তাহার স্বভাবে উৎপন্ন হয় নাই, অবস্থান্তর প্রাপ্তির উন্মুখতাও প্রকাশিত হয় নাই। (৪) নিরাভাসতা—স্বাশ্রয় শিব হইতে ভিন্নরূপে তাহার কোন প্রতীতি নাই, ভেদের অভাবহেতু শিবের আভাস বা প্রতিবিম্বও তাহাতে বিলসিত হয় না, শক্তি-শক্তিমৎ আশ্রিতাশ্রয় প্রকাশ্যপ্রকাশক গুণগুণী প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদের বিকাশ তাহার মধ্যে নাই। (৫) নিরুত্থানতা—উত্থান বা সংসাররূপে পরিণামের কোন লক্ষণ তদবস্থায় প্রকটিত হয় নাই।

কেবলমাত্র নিষেধবাচক পাঁচটী লক্ষণ দ্বারা শিবাভিন্না নিজাশক্তিকে লক্ষিত করা হইয়াছে। এই নিজাশক্তির মধ্যে যখন সৃষ্টির অভিমুখে কিঞ্চিৎ উন্মুখতা অভিব্যক্ত হইল, শিবের সহিত তাহার কথঞ্চিৎ শক্তি-শক্তিমদ্‌ভাব অভ্যুত্থিত হইল, শিব কিঞ্চিৎ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া শক্তির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, তখন এই শক্তি পরাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

"তস্যোন্মুখত্বমাত্রেণ পরাশক্তিরুত্থিতা"। ১।৬

এই পরাশক্তিরও পাঁচটী লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। "অস্তিতা অপ্রমেয়তা অভিন্নতা অনন্ততা অব্যক্ততা ইতি পঞ্চগুণা পরাশক্তিঃ"—১।১১

(১) অস্তিতা—পরাশক্তির স্তরে শিবাশ্রিতা শক্তিরূপে শক্তির কথঞ্চিৎ ভিন্নাভিন্ন অস্তিত্বের আবির্ভাব হইল। নিজাশক্তির স্তরে শিবই শক্তি বা শক্তিই শিব; পরাশক্তির স্তরে শিবের শক্তি, শক্তি শিবের সহিত নিত্যযুক্তা হইয়াও, তৎসত্তায় সত্তাবতী ও তচ্চৈতন্যে প্রকাশময়ী হইয়াও, স্বরূপতঃ শিবের সহিত অভিন্না হইয়াও, সৃষ্ট্যুন্মুখতালক্ষণ দ্বারা কথঞ্চিৎ

ভিন্নরূপে বিরাজমানা। (২) অপ্রমেয়তা—পরাশক্তি অপ্রমেয়া সর্ব্ববিধ পরিচ্ছেদশূন্যা ইয়ত্তারহিতা, সুতরাং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণের অগম্যা। (৩) অভিন্নতা—জীবজগদাদি সৃষ্ট না হওয়ায় তাহার ভিতরে বা বাহিরে কোন প্রকার ভেদ নাই, তাহার সত্তা হইতে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কোন পদার্থের বিদ্যমানতা নাই। (৪) অনন্ততা—তদ্-ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু না থাকায় ও দেশকাল না থাকায় পরাশক্তি অনন্তা, আদ্যন্তমধ্যবিহীনা। (৫) অব্যক্ততা – পরাশক্তিও অব্যক্তা, কোন প্রকার দ্বৈত বা বৈচিত্র্য তখনও অভিব্যক্ত হয় নাই।

সৃষ্টির উন্মুখতাহেতু শক্তির ভিতরে যখন কিঞ্চিৎ স্পন্দন আবির্ভূত হইল, শক্তি যখন সামান্যভাবে কথঞ্চিৎ ক্রিয়াশীলা হইল, তখন সেই পরাশক্তির যে অবস্থা, তাহার নাম 'অপরাশক্তি'।

'তস্য স্পন্দনমাত্রেণ অপরাশক্তিরুত্থিতা।১।৭।

এখানে একটি কথা স্মরণীয় যে, নিজাশক্তি যখন পরাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন তাহার 'নিজাত্ব' নষ্ট হইয়া 'পরাত্ব' লাভ হয় না, এবং পরাশক্তি যখন অপরাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখনও তাহার 'নিজাত্ব' ও 'পরাত্ব' নষ্ট হইয়া 'অপরাত্ব' প্রাপ্তি হয় না। কারণরূপ সর্ব্বদাই কার্য্যরূপের মধ্যে অনুস্যূত থাকে, এবং সেইহেতু কার্য্যরূপ যতই বৈচিত্র্যান্বিত হয়, তাহাতে একত্ব নষ্ট হয় না, বহুত্বের মধ্যেও একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং নব নব সৃষ্টির যোগ্যতাও অফুরন্ত থাকে।

এই স্পন্দনাত্মিকা অপরাশক্তিরও পাঁচটী লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

"স্ফুরতা স্ফুটতা স্ফারতা স্ফোটতা স্ফূর্ত্তিতা—ইতি পঞ্চগুণা অপরাশক্তিঃ" ১।১২। স্ফুরতা ও স্ফারতা (অর্থাৎ সঞ্চলন ও সঞ্চালন), স্ফুটতা ও স্ফোটতা (অর্থাৎ বিকাশত ও বিকাশকতা), স্ফূর্ত্তিতা (অর্থাৎ উৎসাহ বা আনন্দভাব)। অপরাশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ ব্যক্তভাবান্বিতা, ব্যক্তীভূত হওয়ার দিকে কতকটা অগ্রসর। তাহার মধ্যে সৃষ্টির আবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফুটতর, কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্য সূক্ষ্মভাবেও প্রকাশ পায় নাই, কেবলমাত্র একটু চাঞ্চল্যের বিকাশ হইয়াছে। অপরাশক্তির উপাধিযোগে শিব যেন নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে সদ্য উত্থিতপ্রায় হইয়াছেন, কিন্তু

ব্যুত্থিত হন নাই, তাঁহার অহংবোধও জাগ্রত হয় নাই, তাঁহার মধ্যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদে, কর্ত্তৃ-কার্য্যভেদ বিকশিত হয় নাই, নিজেকে শক্তিমান্ এবং শক্তিকে তাঁহার আশ্রিতা বলিয়া কোন সজাগ অনুভূতি সমুত্থিত হয় নাই। ব্যুত্থানের উদ্যোগ হইয়াছে মাত্র।

অপরাশক্তির মধ্যে ক্রমশঃ 'অহংভাব' প্রকাশ পাইল, এবং তাহাতে সৃষ্টির অভিমুখে শক্তি আরো অগ্রসর হইল। অপরাশক্তি তখন সূক্ষ্মাশক্তি রূপে পরিণত হইল।

"ততঃ অহন্তার্থমাত্রেণ সূক্ষ্মা শক্তিরুৎপন্না" ।১।৮।

এই সূক্ষ্মাশক্তিরও পাঁচটী লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

"নিরংশতা নিরন্তরতা নিশ্চলতা নিশ্চয়তা নির্ব্বিকল্পতা—ইতি পঞ্চগুণা সূক্ষ্মাশক্তিঃ।" ১ ১৩। (১) নিরংশতা—অখণ্ডিতা অহমাকারা বৃত্তিরূপেই তখন শক্তির প্রকাশ। অহমাকারা বৃত্তির মধ্যে ইদমাকারা বৃত্তি সমুৎপন্ন না হইলে—'অহম্ অহম্' এই প্রকার অনুভব প্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে অহং ভিন্ন 'ইদম্ ইদম্' এই প্রকার অনুভূতি জাগ্রত না হইলে,—'অহম্' খণ্ডিত হয় না, অহং-বোধের অবয়ববিভাগ হয় না, অংশাংশী-ভেদ সমুদিত হয় না। (২) নিরন্তরতা—দেশকৃত বা কালকৃত কোন প্রকার 'অন্তর' বা ব্যবধান তাহার মধ্যে প্রকটিত হয় নাই। কখন 'আমি-বোধ', কখন এই বোধের অভাব, আবার এই বোধের উৎপত্তি, এইরূপ ব্যবহিতভাবে অহন্তাবোধ প্রবাহিত হয় না; কোন স্থানবিশেষে আমিত্ববোধ (যথা, দেহাত্মবোধ) এবং স্থানান্তরে এই বোধের অভাব (যথা, দেহাতিরিক্ত স্থানে), এইরূপ কোম ব্যবধানও সূক্ষ্মশক্তিগত অহন্তাবোধের মধ্যে নাই। (৩) নিশ্চলতা—এই অহমাকারাবৃত্তির কোন 'চলন' অর্থাৎ চাঞ্চল্য বা স্বরূপবিচ্যুতি ঘটে না, কখন গাঢ়তা, কখন শিথিলতা, কখন জাগ্রদ্ভাব, কখন তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, এই প্রকার অবস্থাভেদ সেই বৃত্তির মধ্যে থাকে না। (৪) নিশ্চয়তা—এই অহন্তা নিশ্চয়াত্মিকা, সংশয়-বিপর্য্যয়শূন্যা। (৫) নির্ব্বিকল্পতা—এই অহংজ্ঞানে কোন বিকল্প নাই, কোন উপাধি বা বিশেষণ নাই,—ইহাতে 'আমি-বোধ' কোন প্রকার বিশেষণবিশিষ্ট নয়, কোন প্রকার উপাধিযুক্ত নয়, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন নয়, এক এক সময় এক একরূপ অবস্থায় অবস্থিতও নয়। 'আমি-জ্ঞান' এই স্তরে সর্ব্বদা একরূপ, এবং এই আমি-বোধই সূক্ষ্মশক্তির স্বরূপ।

তদনন্তর এই অহন্তার সঙ্গে বেদনশীলতা উদ্গত হইল,—জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান ভেদ, কর্ত্তৃ-কার্য্য-কর্ম্মভেদ, সংকল্পাত্মিকা বৃত্তি, সংকল্পনীয় পদার্থ-রাজির ভাবময় রূপ এই অহন্তান্বিতা মহাশক্তির ভিতরে সমুদিত হইল, তখন ইহার নাম হইল কুণ্ডলিনীশক্তি।

"ততো বেদনশীলা কুণ্ডলিনী শক্তিরুদ্‌গতা"। ১।৯।

কুণ্ডলিনী শক্তির পঞ্চ লক্ষণ—

"পূর্ণতা প্রতিবিম্বতা প্রবলতা প্রোচ্চলতা প্রত্যঙ্‌মুখতা—ইতি পঞ্চগুণা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ।" ১।১৪।

(১) পূর্ণতা, ব্যাপকতা, সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা; বিশ্ব সংসারের উপাদান কারণ বলিয়াই কুণ্ডলিনী শক্তি পূর্ণা, সর্ব্বব্যাপিনী। (২) প্রতিবিম্বতা—ইহার ভিতরে শিব স্বরূপতঃ প্রকাশিত না হইয়া বিচিত্ররূপে প্রতিবিম্বিত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি অবলম্বনেই শিবের বৈচিত্র্যসৃষ্টি ও বিচিত্রোপাধি-পরিগ্রহ। (৩) প্রবলতা – অশেষবৈচিত্র্যরচনাসামর্থ্য। (৪) প্রোচ্চলতা ক্রমবর্দ্ধমানতা, স্থূলাদিরূপে পরিণামশীলত্ব; আপনার অভ্যন্তর হইতে নিত্য নব নব সৃষ্টির বিকাশ সাধন করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমশঃই পুষ্টিলাভ করিতেছে। (৫) প্রত্যঙ্মুখতা—বিচিত্ররূপে আপনাকে সংসার সৃষ্টির মধ্যে পরিণত করিয়াও কুণ্ডলিনী শক্তি নিত্য শিবমুখী শিবপ্রাণা শিবাত্মবোধসম্পন্না; এই প্রত্যঙ্মুখতা হেতুই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব বিরাজিত, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য বিদ্যমান, ভেদের মধ্যে অভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত।

শিবাভিন্না শিবময়ী মহাশক্তির এইরূপ পঞ্চবিধ বিকাশ ও প্রতি স্তরে পঞ্চবিধ গুণের প্রকাশে শিবের এই বিশ্বদেহের উৎপত্তি,—অদ্বৈততত্ত্ব বিশুদ্ধ সচ্চিৎস্বরূপ শিবের বিশ্বাত্মা বিশ্বপ্রাণ বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বভাবময়রূপে অভিব্যক্তি। এই বিশ্বদেহই পরপিণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড। "এবং শক্তিতত্ত্বে পঞ্চ-পঞ্চগুণযোগাৎ পরপিণ্ডোৎপত্তিঃ"। ১।১৫।

বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত*

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ।

বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে প্রাচ্য মত বলিতে আমি প্রাচীন আচার্য্যদের মতকে লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও প্রধান প্রধান অনেক বিষয়ে তাঁহাদের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদেরই অন্য নাম বেদান্ত। বেদের অন্তে সন্নিবিষ্ট বলিয়া উপনিষদের নাম বেদান্ত। পাণিনির প্রথম সূত্রের মহাভাষ্যে এবং অন্যান্য স্থলে বেদের সহস্রাধিক শাখার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এক্ষণে অল্প কয়েকটি শাখাই বিদ্যমান আছে। বেদকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া বেদের বিভিন্ন অংশকে শাখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন বৃক্ষের একটি শাখা অবলম্বন করিলেই ঐ বৃক্ষের ফল লাভ করিতে পারা যায় সেইরূপ বেদের একটি শাখা অবলম্বন করিলেই বেদবৃক্ষের ফলস্বরূপ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থই লাভ করা যায়। তন্মধ্যে মোক্ষলাভের কথাই উপনিষদে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। বেদের সহস্রাধিক শাখার প্রান্তে সহস্রাধিক উপনিষদ এক সময়ে বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে ১০৮টি সমধিক প্রসিদ্ধ উপনিষদ এক্ষণে বিদ্যমান। এই ১০৮টি উপনিষদের নাম, এবং কোন্ উপনিষদগুলি ঋগ্বেদের অন্তর্গত, কোন্‌গুলি যজুর্ব্বেদের, কোন্‌গুলি সামবেদের এবং কোন্‌গুলি অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত, এই সকল তথ্য মুক্তিকোপনিষদে পাওয়া যায়।

বেদ দুই অংশে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মহর্ষি আপস্তম্ব যজ্ঞ-পরিভাষা সূত্রে বেদের সংজ্ঞা দিয়াছেন—মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমষ্টির নাম বেদ। প্রাচীন আচার্য্যগণ সকলেই বেদের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকাংশ উপনিষদ ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত, কোনও কোনও উপনিষদ মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। অতএব সকল

*৩১ শে মার্চ্চ বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

উপনিষদই বেদের অন্তর্গত। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও মানবের রচিত নহে। বেদের রচনাকর্ত্তার নাম পাওয়া যায় না, যে সকল ঋষির নিকট বেদের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সকল ঋষির নাম পাওয়া যায়। বেদ যে কোনও মানব রচিত নহে, বেদের শব্দ সকল যে নিত্য এই মতের সমর্থনে সায়ণাচার্য্য বেদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাচাবিরূপনিত্যয়া—ঋগ্বেদ সংহিতা (৮।৭৫।৬) অর্থাৎ বেদের বিবিধ শব্দ সকল নিত্য। ঋষিদের নিকট বেদের শব্দ সকল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও সেই সকল শব্দ ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। শঙ্করাচার্য্য এই মতের সমর্থনে বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্
যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদ—২।৪।১০

অর্থাৎ ঋগ্বেদ প্রভৃতি এই মহা প্রাণীর (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাসের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন,

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥

অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মার নিকট বেদ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা ঈশ্বরের নিকট বেদ লাভ করেন, পরে যে ঋষি যেরূপ তপস্যা করেন তাঁহার নিকট বেদের সেই অংশ প্রকাশিত হয়।

মনুষ্য রচিত গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। বেদ মনুষ্য রচিত নহে, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রচারিত, এজন্য বেদে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। সমগ্র বেদ অভ্রান্ত সত্য। বেদের অর্থ অনেক সময় অতিশয় গভীর—ব্যাস বাল্মীকি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা বেদের গভীর অর্থ উপলব্ধি করেন এবং সাধারণ লোকেও যাহাতে বেদের অর্থ জানিতে পারে এজন্য পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বেদের যে সকল অংশ এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, তাহার সার ভাগও এই সকল গ্রন্থে রক্ষিত

হইয়াছে। এই সকল বেদমূলক ঋষি প্রণীত গ্রন্থের সাধারণ নাম স্মৃতি। বেদের নাম শ্রুতি। শ্রুতি ও স্মৃতির মিলিত নাম শাস্ত্র। মহাভারত বলিয়াছেন, ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থ মুপবৃংহয়েৎ অর্থাৎ ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারতের নাম ইতিহাস) এবং পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। রামায়ণে দেখা যায় যে লব ও কুশের যখন বেদসকল অভ্যাস করা হয় তখন বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য মহর্ষি বাল্মীকি তাহাদিগকে রামায়ণ শিক্ষা দেন। মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হয় কারণ চারি বেদে যে সকল উপদেশ আছে মহাভারতে তাহা সঙ্কলন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপনিষদের সারভাগ সংগ্রহ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

মনুসংহিতা সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন, যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজং (তৈত্তিরীয় আরণ্যক) অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন ঔষধ ব্যবস্থা করেন, মনুও সেইরূপ বিভিন্ন ভবরোগীর বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন ; চিকিৎসক যেমন কাতর রোগীকে তিক্ত ঔষধ দেন, কষ্টকর ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি দুঃখ পাইয়াছে মনু তাহার জন্য আরও দুঃখের ব্যবস্থা করেন : যে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য আমরা সংসারে দুঃখ পাই সে পাপের যাহাতে শীঘ্র ক্ষয় হয় এজন্যই মনু এরূপ ব্যবস্থা করেন। অনাবশ্যক দুঃখ দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইহা প্রতিপাদিত হইবে যে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের সমষ্টি একটি অখণ্ড বস্তু যাহা শাস্ত্র নামে পরিচিত - উপনিষদ তাহার একটি অংশ,— অন্য শাস্ত্রে যে সকল তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল তত্ত্ব উপনিষদ কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কোথাও বা অন্তর্নিহিত আছে ; বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বাহ্য দৃষ্টিতে বীজ এবং ফুলকে বিভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যিনি গভীর দৃষ্টিতে দেখিবেন তিনি বলিবেন উহারা ভিন্ন বস্তু নহে, বীজের মধ্যেই ফুল বিদ্যমান আছে। সেইরূপ বাহ্য

দৃষ্টিতে কেহ বলিতে পারেন যে পুরাণের ধর্ম্ম এবং উপনিষদের ধর্ম্ম বিভিন্ন, কিন্তু যিনি গভীর দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন তিনি বলিবেন যে উহারা এক।

সুতরাং উপনিষদের তত্ত্ব বলিতে সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রেরই তত্ত্ব আসিয়া পড়ে। সংক্ষেপে সে তত্ত্ব এই যে এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্পাদন করেন, ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, প্রলয়ের সময় জগৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিলীন হয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, জীব নিজ পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্য অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে, জীবকে পাপ বা পুণ্য করিবার প্রবৃত্তি ঈশ্বরই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে প্রদান করেন, প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্ব্বে একটি সৃষ্টি ছিল, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভে যে তদনুসারে দেহ লাভ করে এবং তাহার তদনুরূপ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হয়, যে পাপ করে সে নরকে যায়, যে পুণ্য করে সে স্বর্গে যায়, স্বর্গ বা নরক অনন্তকাল স্থায়ী নহে, পাপ পুণ্যের পরিমাণ অনুসারে স্বর্গে বা নরকে অল্পকাল বা দীর্ঘকাল বাস করিতে হয়, তাহার পর আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যে ব্যক্তি প্রবল পাপও করে নাই পুণ্যও করে নাই তাহাকে স্বর্গেও যাইতে হয় না নরকেও যাইতে হয় না, মৃত্যুর পরই সে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি আজীবন ঈশ্বরের উপাসনায় অতিবাহিত করে সে মৃত্যুর পর দেবযান পথে ব্রহ্মলোক গমন করে এবং সেখান হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, জীবের স্থূলদেহ ব্যতীত ইন্দ্রিয়—প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা গঠিত একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, স্থূলদেহের ন্যায় সূক্ষ্মদেহও অচেতন, আত্মাই চৈতন্যময়, মানবের ন্যায় পশুপক্ষী প্রভৃতিরও আত্মা আছে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে মানব পশুপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া মানব ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবদেহও লাভ করিতে পারে, যতক্ষণ পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ দুঃখের সম্ভাবনা নিবৃত্ত হয় না, এজন্য পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করা বা মোক্ষলাভ করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের পুনর্জ্জন্মের কারণ, অজ্ঞান হেতু আমরা দেহ ইন্দ্রিয় বা মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রম করি,

আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বরের মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের এই ভ্রম উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরের কৃপা হইলে তিনি আমাদিগকে মায়ার পরপারে লইয়া যান, আমরা তখন ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করি, বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, ঈশ্বরকে নিরন্তর উপাসনা করিলে, তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইলে তিনি কৃপা করেন, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরকে নিরন্তর উপাসনা করা যায় না, আমাদের পূর্ব্বকৃত মন্দ কর্ম্মের ফলে আমাদের চিত্ত মলিন হইয়াছে, এজন্য কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি হয় কাহারও প্রতি বিদ্বেষ হয় ; আমরা ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে এই আসক্তি ও বিদ্বেষ অন্তরায়রূপে উপস্থিত হয় এবং আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগকে বিষয় চিন্তায় নিবিষ্ট করে ; এই আসক্তি ও বিদ্বেষরূপ চিত্তের মলিনতা দূর করিবার জন্য কর্ম্ম করা প্রয়োজন, নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে চিত্তকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করিয়া রাখা যায়, নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তা করিলে আমরা ঈশ্বরের কৃপালাভ করিতে সক্ষম হই, ঈশ্বরের কৃপালাভ করিলে আমরা মায়া অতিক্রম করিতে পারি, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হই। এইভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান আমাদের চিত্তশুদ্ধ করিয়া একদিকে যেমন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সহায়ক অপরদিকে তাহা আমাদের পার্থিব উন্নতিরও সহায়ক। কারণ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ— ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে মোক্ষলাভ—যতো ইভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ—যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম, ইহলোকের উন্নতির নাম অভ্যুদয়, পরলোকে মোক্ষলাভের নাম নিঃশ্রেয়স।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের অবস্থা কিরূপ হয়, এই সকল কথাই উপনিষদে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কর্মের কথা অল্প পরিমাণে আছে এজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে উপনিষদে কর্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই, জ্ঞানের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কর্ম না করিলে জ্ঞানলাভ করা যায় না, ইহাও উপনিষদের মত। ঈশোপনিষদ্

বলিয়াছেন, কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিবে এইরূপ ইচ্ছা করিবে—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

কেনোপনিষদ্ বলিয়াছেন, তপস্যা, আত্মসংযম এবং কর্মের উপর উপনিষদ্ প্রতিষ্ঠিত,

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম ইতি প্রতিষ্ঠা

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন

সত্যংবদ, ধর্মং চর

অর্থাৎ সত্য বলিবে, ধর্ম আচরণ করিবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ আহার শুদ্ধি রক্ষা করিতে বলিয়াছেন,

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ

অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করা যায়। কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন যে মন্দ কর্ম হইতে নিবৃত্ত না হইলে, মন শান্ত না হইলে ঈশ্বর লাভ হয় না

নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্ত মানসো বা ঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

কঠ ১।২।২৩

কোন্ কর্ম ভাল কোন কর্ম মন্দ, কোন্ আহার শুদ্ধ কোন্ আহার অশুদ্ধ এ বিষয় বিস্তারিত বিবরণ উপনিষদে পাওয়া যায় না, মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়, মনুর ব্যবস্থাসকল বেদমূলক,

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ
স সর্বোভিহিতো বেদে—

সমস্ত উপনিষদের সারভূত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য কোন্ কর্ম অকর্ত্তব্য এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ

মনুসংহিতা সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ এবং মহাভারতের বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

উপনিষদ্ এবং মনুসংহিতার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি—জীবনের কি লক্ষ্য তাহাই উপনিষদে বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করা হইয়াছে, সেই লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য কিরূপ আচার পালন করা উচিত, কোন্ কর্ম করা উচিত, কিরূপ সমাজ ব্যবস্থা সেই লক্ষ্যের অনুকূল এই সকল কথা মনুসংহিতাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন যে কাহার কি কর্ম করা উচিত তাহা তাহার বর্ণ বা জাতির উপর নির্ভর করে, বর্ণ বা জাতি জন্মের উপর নির্ভর করে (মনু ১০।৫)। কারণ জন্ম একটা অহেতুক ঘটনা নহে, পুর্বজন্মের কর্মের উপর বর্ত্তমান জন্ম এবং জাতি নির্ভর করে। এ সকল কথা উপনিষদের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জাতি যে পূর্বজন্মের কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয় যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা কপূরচরণা কপূয়াংযোনিমাপদ্যন্তে শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং।—ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫-১০-৭

অর্থাৎ যাহারা উত্তম আচরণ করে তাহারা উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণযোনি বা ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি। যাহারা মন্দ আচরণ করে তাহারা মন্দ যোনি প্রাপ্ত হয়, যথা শ্বযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।

বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের সহিত উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা রামানুজ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ সূত্র-ভাষ্য হইতে প্রতীত হইবে। রামানুজ বলিয়াছেন,—এবং অহরহরনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রম ধর্মানুগৃহীততদুপাসনরূপতৎসমারাধনপ্রীত উপাসীনান্ অনাদিকাল-প্রবৃত্তানন্তদুস্তরকর্মসঞ্চয়রূপাবিদ্যাং বিনিবর্ত্ত্য স্বযাথাত্ম্যানুভবরূপ অনবধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপয্য পুনর্নাবর্ত্তয়তি।

অর্থাৎ প্রত্যহ বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিলে তাহাতে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া আমরা অনাদিকাল হইতে যে সকল পাপ করিয়াছি তাহা হইতে মুক্ত করেন, তখন আমরা নিজস্বরূপ অনুভব করি এবং অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হই, আর পুনর্জন্ম হয় না।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল সকল প্রাচীন আচার্য্যই এই সকল তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ এই সকল বিষয় লইয়া—ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তিনি সগুণ না নির্গুণ, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি,

ব্রহ্মকে লাভ করিলে জীবের কি অবস্থা হয়। কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে আচার্য্যদের মধ্যে মতভেদ নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন আচার্য্যদের এই সকল মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সর্বত্রই বিরোধ দেখিয়াছেন। বেদের কর্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদের, উপনিষদের সহিত পুরাণের, বেদের সহিত মনুসংহিতার, সর্বত্র বিরোধ ও অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের যে বিরোধের কথা তাঁহারা বলিয়াছেন সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনাণ্ড বলিয়াছেন—উপনিষদগুলি বেদের ব্রাহ্মণভাগের অংশ হইলেও তাহাদের মধ্যে যে নূতন ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কার্য্যতঃ যজ্ঞ ধর্মের বিপরীত * অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম কর্মকাণ্ডের বিপরীত। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিলেন না যে কর্মকাণ্ড উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সোপান। সোপান এবং ছাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে সেই সম্বন্ধ।

ডাঃ ভিন্‌টারনিট্‌স্ বলিয়াছেন, যে সময়ে ব্রাহ্মণরা বৃথা যজ্ঞধর্মের চর্চ্চা করিতেছিলেন সেই সময়ে অন্যেরা সেই সব গভীর প্রশ্নের আলোচনা করিতেন যেগুলি উপনিষদে অতি সুন্দরভাবে মীমাংসিত হইয়াছে † অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞ করিতেন এবং যাঁহারা উপনিষদের জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা ভিন্ন দলের লোক। কিন্তু তিনি ইহা ভুলিয়া গেলেন যে জনক রাজার যজ্ঞসভায় বসিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছিলেন (বৃহদারণ্যক উপনিষদ); চক্রায়ণ উষস্তি ঋষিও রাজার যজ্ঞে গিয়া জ্ঞানের কথা বলেন এব্য পুরোহিতরূপে বৃত হন (ছান্দোগ্য); যমরাজা নচিকেতাকে আগে যজ্ঞ করিতে শিক্ষা দেন পরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন; তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি যত্নপূর্বক অনুষ্ঠান করা উচিত (দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং), বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন ব্রাহ্মণগণ অনাশক্ত ভাবে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিয়া

* History of Sanskrit Literature p, 215
† History of Sanskrit Literature, p. 231

ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করে (তমেব ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভিন্ন দেশের লোক, তাঁহাদের ভাষা ভিন্ন, ধর্ম ভিন্ন, তাঁহাদের এরূপ ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের এই সকল ভিত্তিহীন উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছেন দেখিয়া আমাদের বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা থাকে না। অধ্যাপক হিরিয়ান্না লিখিয়াছেন—উপনিষদের মূল ভাব যজ্ঞধর্ম হইতে ভিন্ন,—এমন কি তাহার বিরোধী এবং তাহাতে বিশ্ব সম্বন্ধে যে মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্নিহিত মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।* অর্থাৎ উপনিষদের শিক্ষা যজ্ঞের বিরোধী। এই উক্তির সমর্থনে তিনি একটি মাত্র উপনিষদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" (মুণ্ডকোপনিষদ)। এই শ্লোকটিতে কেবল ইহাই বলা হইয়াছে যে যজ্ঞের দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডেও ত একথা বলা হয় নাই যে যজ্ঞ দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে ইহাই বলা হইয়াছে যে যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ লাভ হয় (স্বর্গকামো যজেত)। মুণ্ডকের এই বাক্যের সহিত তাহার বিরোধ কোথায়? মুণ্ডকের যে অধ্যায়ে এই বাক্য পাওয়া যায় তাহার গোড়াতেই বলা হইয়াছে, যে যজ্ঞ সকল সত্য, তাহার পর বলা হইয়াছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত (তান্যাচরথ নিয়তং) তাহার পর বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয় (নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা)। সুতরাং বিরোধ কিছু নাই। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী ভারতীয় পণ্ডিত যজ্ঞে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের সেই অবিশ্বাস তাঁহারা উপনিষদের ঋষিদিগের প্রতি আরোপ করিয়াছেন মাত্র। পুনশ্চ স্যার রাধাকৃষ্ণণও উপনিষদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—লোকে ভ্রান্তিবশে যে দেবতাদের পূজা করিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বিশ্বরহস্যের চিন্তা আরম্ভ করিল।† ইহার তাৎপর্য্য এই যে উপনিষদের ঋষিগণ ভাবিতেন যে বেদের সংহিতা অংশের ঋষিগণ অজ্ঞতাহেতু অনেক দেবতার কল্পনা করিতেন। উপনিষদে কি স্যর রাধাকৃষ্ণের এই মতের বিন্দুমাত্র

*:Outtines of Indian Philosophy, p, 48.

† Indian Philosophy, V. I, P. 71.

সমর্থন পাওয়া যায়? প্রত্যেক উপনিষদেই দেবতাদের কথা আছে, ঈশ্বর যেরূপ মনুষ্য পশু পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন সেইরূপ দেবতাও সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনশ্চ স্যর রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন আদিম বহু দেবতা পূজা (Polytheism) হইতে বহুদূর অগ্রসর হইলে তবে সুসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় * অনেক দেবতার কথা আছে বলিয়া যদি কর্ম্মকাণ্ড (Polytheism) হয় তাহা হইলে উপনিষদও Polytheism কারণ উপনিষদেও সর্ব্বত্র বহু দেবতার কথা আছে। এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা উপনিষদে আছে, সত্য। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতাতেও এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা অনেক স্থলে আছে। যথা নাসদীয় সূক্ত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত, পুরুষসূক্ত)। যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় (কর্মকাণ্ডের কথা) এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তি হয় (জ্ঞানকাণ্ডের কথা), এই দুই উক্তি যে পরস্পর বিরোধী ইহা কোন্ তর্কশাস্ত্র অনুসারে প্রতিপাদিত হয়?

আমি অধ্যাপকগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে বিখ্যাত য়ুরোপীয় পণ্ডিতের উক্তি বলিয়াই তাঁহারা যেন তাহা অবিচারে গ্রহণ না করেন, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যরা কি বলিয়াছেন তাহাও যেন শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে আলোচনা করেন, এই আচার্য্যরা দীর্ঘকাল (কেহ কেহ আজীবন) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, শান্তসংযত হৃদয়ে বৈদিক সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহাদের পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ছাত্রদের নিকট আবেদন করিতেছি তাঁহারা যে অমূল্য প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, তাহা যেন যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করেন, শঙ্কর রামানুজ ব্যাস বাল্মীকির সহিত তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে বৈদেশিক সভ্যতার আক্রমণে তাহা যেন ছিন্ন না হয়।

* Op. Cit., P. 72.

দেশ কি আমাসাপেক্ষ?

শ্রীশুকদেব সেন, এম. এ

[দর্শনের প্রথম সংখ্যায় (কার্ত্তিক, ১৩৪৮ সাল) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'দেশবিচার' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তাহারই সমালোচনা করা হইয়াছে।—সম্পাদক]

গত কার্ত্তিক সংখ্যার 'দর্শনে' শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার সুচিন্তিত 'দেশবিচার' নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে দেশ 'আমা সাপেক্ষ' ও 'কেবলনিশ্চয়ের' বিষয়। কালিদাসবাবু অনেক বিচার করিয়া তাহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। শুধু তাহার প্রদর্শিত কয়েকটী যুক্তি সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব।

'দেশ আমাসাপেক্ষ' ইহা সিদ্ধ করিতে কালিদাসবাবু সাতটী প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথম প্রমাণে কালিদাসবাবু বলিয়াছেন "জগতের অন্তর্গত দুই পদার্থের বহিঃসত্তা পারস্পরিক বা উভয়মুখী . জগতের বহিঃসত্তা কিন্তু একমুখী। জগৎ আমার বাহিরে বলিলে আমিও যে জগতের বাহিরে এমন কথার সূচনা নাই।......জগৎ আমার বাহিরে, কিন্তু আমি জগতের বাহিরে নাই, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে যাবতীয় জাগতিক পদার্থ যে অসীম প্রসার দেশে বিদ্যমান আমার সত্তাকে উপেক্ষা করিলে তাহার পদার্থত্বই থাকে না।" (পৃঃ ৫৪)। সুতরাং দেশ আমা সাপেক্ষ। প্রথম প্রমাণের মূল কথা 'জগৎ আমার বাহিরে কিন্তু আমি জগতের বাহিরে নাই' এই বাক্যটীর অর্থ ভাল করিয়া বুঝা দরকার। এই বাক্যটীতে ব্যবহৃত 'আমি' 'জগৎ' ও 'বাহিরে' এই তিনটী শব্দের কি অর্থ হইতে পারে বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ 'আমি' শব্দ দ্বারা একটী বিশেষ দেহ বা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা বুঝা যাইতে পারে। আমি শব্দ দ্বারা "দেহ অভিপ্রেত নয়" এ কথা কালিদাসবাবু স্পষ্টই বলিয়াছেন। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা অভিপ্রেত কিনা তাহা অবশ্য বলেন নাই। ধরিয়া

নিতেছি এখানে 'আমি' শব্দের অর্থের সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং 'আমি' শব্দের অর্থ এখানে হইতে পারে নিরবচ্ছিন্ন আত্মা বা জ্ঞাতা। কোন কোন মতে (যথা ন্যায় মতে) আত্মা সর্ব্বব্যাপী বা বিভু। আত্মা যদি সর্ব্বব্যাপী হয় তবে জগৎ বা কোন কিছুই আত্মার বাহিরে, অর্থাৎ আত্মা যেখানে নাই সেইখানে আছে, এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং এইরূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মা ও 'আমি' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ হইতে পারে না। অতএব ধরিয়া নিতেছি 'আমি' শব্দের অর্থ এখানে শুধু 'জ্ঞাতা', অন্য কিছু নয়। এখন দেখা যাক 'বাহিরে' শব্দের কি অর্থ হইতে পারে। 'ক খ এর বাহিরে'—ইহার এক অর্থ হইতে পারে ক ও খ ভিন্ন স্থানে বা দেশে অবস্থান করে। 'একটী টেবিল একটী চেয়ারের বাহিরে' ইহার অর্থ টেবিলটী ও চেয়ারটী বিভিন্ন স্থান বা দেশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এইরূপ অর্থ 'বাহিরে' শব্দ শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা চলে যেখানে পদার্থ দুইটীর উভয়ই দেশে থাকে বা থাকিতে পারে। কিন্তু পদার্থ দুইটীর অন্ততঃ একটীও যদি এমন হয় যে তাহার সম্বন্ধে দেশে থাকা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না, তাহা হইলে সেখানে উপরোক্ত অর্থে 'বাহিরে' শব্দটী ব্যবহার করা চলে না। যেমন 'ন্যায়পরায়ণতা' দেশে থাকে কি থাকে না, এই প্রশ্ন ওঠে না, সুতরাং 'টেবিলটী ন্যায়পরায়ণতার বাহিরে' কিম্বা 'ন্যায়-পরায়ণতার বাহিরে টেবিল' এইরূপ কোন কথাই বলা চলে না। আমরা 'আমি' শব্দের অর্থ ধরিয়া নিয়াছি শুধু 'জ্ঞাতা'—যে জ্ঞাতা সম্বন্ধে দেহে থাকা না থাকার, সর্ব্বদেশে বা কোনদেশেই থাকা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এইরূপ জ্ঞাতা সম্পর্কেও উপরোক্ত অর্থে, অর্থাৎ ভিন্ন স্থানে অবস্থান অর্থে 'বাহিরে' শব্দটী ব্যবহার করা চলে না। অতএব 'আমার বাহিরে জগৎ' বা 'জগতের বাহিরে আমি' ইত্যাদি বাক্যগুলিকে অর্থপূর্ণ বলিয়া ধরিতে হইলে 'বাহিরে' শব্দটীকে অন্য কোন অর্থে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

'জগৎ' শব্দটীর কি অর্থ হইতে পারে তাহাও এখন দেখা দরকার। জগৎ শব্দের এক অর্থ হইতে পারে 'যাহা কিছু সদ্‌বস্তু আছে তাহার সমষ্টি বা সমগ্র।' এখন প্রশ্ন এই যে এই সমষ্টি বা সমগ্রের ভিতরে

'আমার' ও অন্তর্ভাব হইয়াছে কিনা? যদি ধরা হয় এই সমগ্রের ভিতরে আমার বা জ্ঞাতার অন্তর্ভাব আছে, তবে বলিতে হইবে:এই সমগ্রও আমাকে বাদ দেয় নাই, আমিও সমগ্রকে বাদ দেই নাই। অর্থাৎ সমগ্র বা জগতের বাহিরেও আমি নই, আমার বাহিরেও জগৎ নাই। এখানে বাহিরে শব্দটী কোন দৈশিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে বাহিরে অর্থ ভিন্ন। আর যদি ধরা হয় সমগ্রের ভিতরে আমার অন্তর্ভাব নাই, তবে বলিতে হইবে সমগ্র ও আমি ভিন্ন। অর্থাৎ 'সমগ্র' ও 'আমি' পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন। সুতরাং এই অর্থে সমগ্র বা জগৎ আমার বাহিরে বা আমা হইতে ভিন্ন, এবং আমিও সমগ্র বা জগতের বাহিরে অর্থাৎ জগৎ হইতে ভিন্ন। কিন্তু এই অর্থেও আমার বাহিরে জগৎ কিন্তু জগতের বাহিরে আমি নাই' একথা বলা চলে না। জগৎ শব্দের অন্য এক ব্যাখ্যা হইতে পারে 'জ্ঞেয়' অর্থে। এই অর্থে জগৎ শব্দের ভিতরে সমষ্টি বা সমগ্রের কোন ইঙ্গিত নাই। জগৎ শব্দের অর্থ এখানে 'যাহা জানা যায়', জ্ঞেয় বা দৃশ্য, আর 'আমি' শব্দের অর্থ যে জানে, জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। কোন কোন জ্ঞেয় পদার্থ স্থানে বা দেশে থাকিলেও জ্ঞাতার সম্বন্ধে কোন দেশে থাকা না থাকার প্রশ্ন ওঠে না, ইহা আমরা ধরিয়া নিয়াছি। সুতরাং 'বিভিন্নস্থানে অবস্থান করা' অর্থে বাহিরে শব্দটী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে ব্যবহার করা চলে না। এখানেও আমাদের মনে হয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে 'বাহিরে' শব্দটী ব্যবহার করিতে হইলে 'ভিন্ন' অর্থেই ব্যবহার করা চলে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েব মধ্যে অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বর্ত্তমান। অর্থাৎ জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন, এবং জ্ঞেয় জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলে বলিতে হয় জ্ঞেয় অর্থাৎ জগৎ যেমন জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ আমার বাহিরে, ঠিক তেমনি জ্ঞাতা। অর্থাৎ আমিও জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন অর্থাৎ জগতের বাহিরে। সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যায়ও 'আমার বাহিরে জগৎ কিন্তু জগতের বাহিরে আমি নাই' কালিদাসবাবুর এই কথার উপপত্তি হয় না। তাহার পরে এই কথার উপপত্তির জন্য যদি বা কোন যুক্তিতে ধরিয়া নেওয়া যায় যে জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় ভিন্ন হইলেও জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা ভিন্ন নয় (জগতের বাহিরে আমি নাই), তাহা হইলেও ইহা হইতেই কি করিয়া প্রমাণ হয় যে দেশ নামক জ্ঞেয় পদার্থ আমা সাপেক্ষ তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

কালিদাস বাবু দ্বিতীয় প্রমাণে বলিয়াছেন "আমার বহিঃস্থ কোন বস্তুকে আমরা ঐ বস্তু বলিয়া বুঝি। 'ঐ' শব্দটীর অর্থ হইল কোন পূর্ব্বনির্দিষ্ট বস্তু হইতে বর্ত্তমানে জ্ঞাত বস্তুটীর স্থান নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ পূর্ব্বনির্দিষ্ট বস্তু হইতে? যাহাই উল্লেখ করা যাইবে তাহাও একটী 'ঐ বস্তু'।" কালিকাস বাবুর মতে দেহ ও পূর্ব্বনির্দিষ্ট বস্তু নয়, কারণ দেহের ও "বিশেষণরূপে 'ঐ' শব্দটীর ব্যবহার করিতে হইবে।" "আত্মাই সেই প্রথমতম পদার্থ, আত্মা হইতে নির্দ্দেশেই বহিঃসত্বের বা দেশের বোধ। অতএব দেশ আামা-নির্ম্মাণ।" (পৃঃ ৫৫) প্রথম প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম এখানেও প্রথমে আমাদের সেই প্রশ্ন। "আমার বহিঃস্থ বস্তু" বলিতে কি বুঝিব? সাধারণ অর্থে বুঝা যায় 'আমি যে দেশে নাই সেই দেশে বর্ত্তমান বস্তু।' আমি বা আমার শব্দের অর্থের সঙ্গে দেহের কোন সম্বন্ধ নাই এ কথার ইঙ্গিত কালিদাস বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণেও আছে। আমি শব্দের দ্বারা যদি বিশুদ্ধ জ্ঞাতা হিসাবে আত্মা বুদ্ধি, তবে এই আত্মা সম্বন্ধে কোন দেশে থাকা না থাকার প্রশ্ন উঠে না, ইহাও আমরা ধরিয়া নিয়াছি। আমি শব্দের এইরূপ অর্থ ধরিলে "আমার বহিঃস্থ" বলিতে কি অর্থ প্রকাশ হয়, আমরা বুঝি না। আমাদের ধারণা, যে বস্তু স্বয়ং স্থানে বা দেশে থাকে না, তাহাকে অবধি করিয়া অন্য কোন বস্তুর স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না। আমরা এইরূপ ব্যাপ্তি নিতে পারি যে কোন একটী প্রথম বস্তুকে অবধি করিয়া কোন একটী দ্বিতীয় বস্তুর স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথম বস্তুটীকে স্থানে থাকিতেই হইবে। দৃশ্যমান জগতে ইহার উদাহরণের অভাব নাই, কিন্তু ইহার ব্যভিচার আছে বলিয়া আমরা জানি না। জ্ঞাতা বা আত্মা এখানে সন্দিগ্ধস্থল, সুতরাং উহার উল্লেখ অগ্রাহ্য। আমাদের এই ব্যাপ্তি ঠিক হইলে আত্মা হইতে নির্দ্দেশে কোন বস্তুর স্থান নির্দ্দেশ হয়, এ কথা বলা চলে না।

সাধারণতঃ 'ঐ বস্তু' বলিতে আমরা বুঝি 'যাহা এই বস্তু নয়।' যে বস্তুটী দেহের কাছে তাহাকে 'এই বস্তু' বলিয়া বুঝি, এবং যেটী দেহ হইতে দূরে তাহাকে 'ঐ বস্তু' বলিয়া বুঝি। এইরূপে 'সম্মুখে', 'পিছনে', 'দক্ষিণে', 'বামে' প্রভৃতি বলিতেও আমরা কোন একটী দেহের সম্মুখে,

পিছনে, দক্ষিণে, বামে এইরূপ ভাবেই বুঝি। দেহ সম্পর্কবিহীন দেশ-বিহীন বিশুদ্ধ জ্ঞাতার কাছে বা দূরে, সম্মুখে বা পিছনে বলিতে কি অর্থ বুঝা যায় তাহার স্পষ্ট ধারণা আমাদের হইতেছে না।

দেহ হইতে দূরের বস্তুকেই আমরা 'ঐ বস্তু' বলি, দেহকেও 'ঐ বস্তু' বলিয়া সাধারণতঃ আমাদের বোধ হয় না। দেহ এবং দেহাতারিক্ত সব বস্তুকেই 'ঐ বস্তু' বলিয়া বুঝি—এইরূপ কথার উপপত্তি হয় যদি আমরা 'ঐ'এর ব্যাখ্যা করি আমাভিন্ন' বা 'জ্ঞাতা ভিন্ন' অর্থে। 'ঐ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন' ধরিলে বলা চলে আমি বা জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে সবকিছুকেই আমা বা জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বলিয়া বা 'ঐ' বলিয়া জানে। কিন্তু এখানে 'ঐ' শব্দের অর্থ শুধু 'ভেদ', দৈশিক বহিঃসত্তা নয়। তার-পরে একথাও বলা চলে না যে যাহা কিছু জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন পদার্থ বা জ্ঞেয় হইবে তাহা দৈশিকও হইবে, কারণ সুখদুঃখই বহু পদার্থকে সাধারণতঃ জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করা হয়, কিন্তু সে গুলিকে সব সময় দৈশিক বলা চলে না। অবশ্য যদি প্রথমেই ধরিয়া নেওয়া হয় যে যাহা দেশে থাকে শুধু তাহাকেই 'জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন' বা জ্ঞেয় বা 'ঐ' বলিব তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

তৃতীয় প্রমাণে কালিদাস বাবু যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ-রূপে আমি বুঝিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় তৃতীয় প্রমাণটীর মূলে রহিয়াছে জ্ঞান সম্বন্ধে একটী বিশেষ মতবাদ। মতটী এই যে, কোন একটী বস্তুর জ্ঞানে যে সব গুণ বা ধর্ম্মকে আমরা সাধারণতঃ ঐ বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে উহারা ঐ বস্তুনিষ্ঠ নহে, উহারা জ্ঞাননিষ্ঠ। যেমন রক্তপুষ্পের জ্ঞানে "যে রক্তবর্ণকে সচারাচর বহিঃস্থ পুষ্পেরই আকার বলা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই আকার" (পৃঃ ৪১)। এখন সমস্যা এই যে, রক্তবর্ণ যদি বস্তুতঃ আমার জ্ঞানেরই আকার হয় তবে তাহাকে বহিঃস্থ পুষ্পের আকার বলিয়া বোধ হয় কেন? এই সমস্যার সমাধানে কালিদাস বাবু বলিয়াছেন যে আমা নিরপেক্ষ বস্তু "আমা সাপেক্ষ দেশে প্রকাশমান" হয় বলিয়া বস্তুটী রক্তাকার বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দেশকে আমাসাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং দেশ আমাসাপেক্ষ।

তৃতীয় প্রমাণটী বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দুইটী প্রশ্ন মনে হয় ; যে সব ধর্ম্মকে বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহার সমাধানের জন্য দেশকে আমাসাপেক্ষ স্বীকার করা প্রয়োজন কি না ; দ্বিতীয়, যে সমস্যার সমাধানের জন্য দেশকে আমাসাপেক্ষ স্বীকার করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, ঐ সমস্যাটীই আদৌ কোন বাস্তব সমস্যা কিনা ? এই সমস্যাটীই ঠিক বাস্তব সমস্যা নয় বলিয়া আমরা সন্দেহ করি, কারণ যে সব কথা মানিয়া নিলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয় সেই সব কথা মানিয়া নেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না।

এ কথা সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে সকল জ্ঞান আমাদের হয় বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানের অনুব্যবসায় হয়, সে সকল জ্ঞানই সবিকল্পক। অর্থাৎ যখন কিছু জানি, একটা কিছুকে একটা কিছুভাবেই জানি। যেমন একটী ফুলকে লাল বলিয়া জানি। বা একটী বস্তুকে ফুল বলিয়া জানি, অথবা অন্ততঃপক্ষে একটা কিছুকে 'আছে' অর্থাৎ সত্তাবান বা অস্তিত্ববান বলিয়া জানি। এই সব ক্ষেত্রে যাহাকে জানি তাহাকে বিশেষ্য বা উদ্দেশ্য বলা যায়, আর যেভাবে তাহাকে জানি (যেমন 'লাল' ভাবে বা 'ফুল' ভাবে) তাহাকে বিশেষণ বা বিধেয় বলা যায়। আমাদের ধারণা এই যে কোন বিশেষ্যকে যখন কোন বিশেষণ বিশিষ্ট বলিয়া জানি, বিশেষণটী তখন ঐ বিশেষ্যেরই ধর্ম্ম। যে ক্ষেত্রে বিশেষণটা সত্যই বিশেষ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম নহে, সে ক্ষেত্রকে আমরা অপ্রমা বা ভ্রান্তির স্থল বলিয়া থাকি। কালিদাসবাবু বলিতে চান যে কোন স্থলেই বিশেষণটী প্রকৃতপক্ষে বিশেষ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম নহে ; বিশেষণটী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানেরই আকার। কালিদাসবাবুর মতে রক্তপুষ্পের' জ্ঞানে রক্তবর্ণটি বস্তুনিষ্ঠ নহে, জ্ঞাননিষ্ঠ। একটী পুষ্পকে রক্ত বা নীলভাবে না জানিয়া শুধু পুষ্প হিসাবেও জানিতে পারি। এই ক্ষেত্রে, অর্থাৎ 'পুষ্পত্ববিশিষ্ট পুষ্প' এইরূপ জ্ঞানেও তাহা হইলে বলিতে হয় পুষ্পত্ব নামক জাতি বা ধর্ম্মটীরও প্রকৃত আশ্রয় জ্ঞান, বস্তু নয়। আবার একটী বস্তুকে পুষ্পভাবে না জানিয়া শুধু 'আছে' বা 'সত্তাবান' ভাবেও জানিতে পারি। এ ক্ষেত্রেও তাহা হইলে অনুরূপ যুক্তিতে স্বীকার করিতে হইবে যে 'সত্তা'

বা 'অস্তিত্ব' ও বস্তুর ধর্ম্ম নয়, উহাও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ। এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে, এইরূপ আমানিরপেক্ষ বস্তুটী তাহা হইলে কি রকম পদার্থ? সকল প্রকার গুণবিহীন, ধর্ম্মবিহীন, সত্তা বা অস্তিত্ববিহীন পদার্থের কল্পনায় ও শূণ্যের কল্পনায় কি পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এইরূপ আমানিরপেক্ষ বস্তুর কল্পনা যদি শূণ্যের কল্পনাই হয়, তবে একটী শূণ্য আমাসাপেক্ষ দেশে প্রকাশিত হইয়া আমাপ্রদত্ত ধর্ম্মাদি গ্রহণ করে, ইত্যাদি কথার অর্থ কি হয় আমরা ঠিক বুঝিতেছি না।

আমাদের ধারণা জ্ঞানের আকার বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা বস্তুতঃ বিষয়েরই আকার। রক্তাকার বা নীলাকার জ্ঞানের অর্থ রক্তবিষয়ক বা নীলবিষয়ক জ্ঞান; জ্ঞানটী নিজেই রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ নয়। কালিদাসবাবু বলিতে চান জ্ঞানের আকার ভিন্ন বিষয়ের কোন আকার নাই। কিন্তু অনেকে ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলিতে পারেন যে বিষয়ের আকার ভিন্ন জ্ঞানের কোন আকার নাই। অন্ততঃ একথা ঠিক যে কালিদাসবাবুর মতটী সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ হইতে পারে; সুতরাং এই মতটা যাহারা মানিতে রাজী নহেন তাহারা এই মতটীর উপর নির্ভরশীল বলিয়া, কালিদাসবাবুর তৃতীয় প্রমাণটাও গ্রহণযোগ্য মনে করিবেন না।

চতুর্থ প্রমাণ। আমি যতদূর বুঝিয়াছি (অবশ্য আমি ভুল বুঝিতে পারি) তাহাতে মনে হয় কালিদাসবাবুর চতুর্থ প্রমাণটী অনেকটা তাহার তৃতীয় প্রমাণের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আর কিছু বক্তব্য নাই।

পঞ্চম প্রমাণ। এই প্রমাণে তিনি বলিয়াছেন "আমার দক্ষিণ হস্তখানি একখানি দর্পণের সম্মুখে ধরিলে উহাকেই বামহস্তরূপে দেখি। যেহেতু উহাকেই বামহস্তরূপে দেখি—এইরূপ প্রতীতি হয়, অতএব বলিতে হইবে যে দক্ষিণ ও বামের প্রভেদ, অর্থাৎ দেশগত প্রভেদ বস্তুর স্বরূপ নহে।" (পৃঃ ৫৭)

এই প্রমাণের মূলে কোন গভীর তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু ঐরূপ কিছু থাকিলেও আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। একখানা বড় আয়নার সামনে মুখামুখি না দাঁড়াইয়া যদি আয়নার দিকে পিছন ফিড়িয়া দাঁড়ান যায়, এবং একটু কষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে

দেখা যাইবে, বাম হাতখানা বাম হাতই রহিয়াছে, আয়নার ভিতরে উহাকেই ডান হাত বলিয়া মনে হইতেছে না। আয়নার সামনে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে বিম্বের বামহাত ও প্রতিবিম্বের বামহাত যে বিপরীত দিকে থাকে তাহার গোড়ার রহস্য শুধু এই-ই যে বিম্বের ও প্রতিবিম্বের মুখ তখন বিপরীত দিকে ঘুরান থাকে। বিম্বের ও প্রতিবিম্বের মুখ বিপরীতদিকে ঘুরান থাকিলেও বিম্বের বামহাত যে দিকে থাকিবে, প্রতিবিম্বের বামহাতও কেন সেইদিকেই থাকিবে না। অথবা, আমি ও যদি মুখামুখি দাঁড়াই, তবে আমার বামহাতখানা যেদিকে থাকিবে তোমারও সেইদিকস্থ হাতখানিই কেন বামহাত হইবে না। অথবা, আমি পূব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে উত্তরদিকস্থ হাতখানা যদি আমার বামহাত হয়, তবে আমি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেও আমার বামহাতখানা কেন উত্তর দিকেই থাকিবে না,—এই সবগুলিই মূলতঃ আমার কাছে একই প্রশ্ন বলিয়া মনে হয়। আমরা যেই যখন যেদিকেই ঘুরিয়া দাঁড়াই না কেন, আমাদের সকলের বাম হাত ও ডানহাত সব সময়ই একদিকে থাকিবে এ কথা বলা চলিত, যদি কম্পাসের কাঁটায় আমাদের বামহাত ও ডানহাতগুলি সব সময়ই একটা দিক বিশেষের দিকে সংলগ্ন থাকিত। কিন্তু আমাদের হাতগুলিও কম্পাসের কাঁটার মত ঘোরে না, বা দিকগুলিও আমাদের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়ায় না। আমরা যে দিকেই ঘুরিয়া দাঁড়াই না কেন, পূব দিক পূব দিকই থাকিবে, উত্তর দিক উত্তর দিকই থাকিবে। শুধু আমার হাত, অর্থাৎ আমার দেহের অঙ্গ বিশেষ কোনদিকে থাকিবে, তাহাই আমার ঘোরার উপর নির্ভর করে। সুতরাং বুঝা যায় দিকের অবস্থিতি আমাদের দেহের ঘূর্ণন সাপেক্ষ নয়, আমাদের দেহের অঙ্গবিশেষের অবস্থিতিই আমাদের দেহের ঘূর্ণন সাপেক্ষ। সুতরাং দিক আমাসাপেক্ষ ইহা প্রমাণ হয় না। তাহা ছাড়া, অনেকে মনে করেন দিকের কল্পনা ও দেশের কল্পনা ঠিক এক নয়। তাহারা বলিবেন কোন যুক্তিতে দিক আমাসাপেক্ষ প্রমাণিত হইলেও ঐ যুক্তিতেই দেশও আমাসাপেক্ষ ইহা প্রমাণিত হয় না। আর বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, এই পঞ্চম প্রমাণে কালিদাস বাবু 'আমি' বা 'আমার' প্রভৃতি শব্দ যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই শব্দগুলি দ্বারা

'আত্মা' বা 'বিশুদ্ধ জ্ঞাতা'কে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই পঞ্চম প্রমাণের 'আমি' বা 'আমার' শব্দ কোন দেহবিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং পঞ্চম প্রমাণটীকে মানিয়া নিলেও ইহা দ্বারা দেশ শুধু দেহসাপেক্ষ ইহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা কালিদাসঁবাবুর উদ্দেশ্য নয়।

ষষ্ঠ প্রমাণ। ষষ্ঠ প্রমাণে কালিদাস বাবু বলিয়াছেন, দেশ আমা-সাপেক্ষ কারণ "দেশের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে"। "যাহার অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে তাহাকে আমানিরপেক্ষ বলা যায় না।" (পৃঃ ৫৭) "দেশের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে" এই কথাটীর অর্থ বোঝা দরকার। প্রথমতঃ ইহার অর্থ হইতে পারে, দেশের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু সে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-জন্য এবং ইন্দ্রিয়াজন্য দুই রকম প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানিতে হয়। কিন্তু ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কালিদাসবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তিনি ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান মানিতে প্রস্তুত নহেন। অতএব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নহে তাহা প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। সুতরাং 'দেশের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে' না বলিয়া বলা উচিত দেশের অপরোক্ষ জ্ঞানই হয় না। তাহা হইলে যুক্তিটী দাঁড়ায় এইরূপ : 'দেশ আমাসাপেক্ষ, কারণ, দেশের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। পরমাণু প্রভৃতি এমন কতবস্তুইত আছে যাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের অবিষয় যত বস্তু আছে সকলই আমাসাপেক্ষ। একথা সাধারণতঃ কেহ স্বীকার করিবেন না, এবং মনে হয় কালিদাস বাবুরও ইহা বলা উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ বলা যাইতে পারে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারে। দেশ এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। তাহা হইলে ব্যাপ্তিটী দাঁড়ায় এইরূপ : যাহা যাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় তাহাই আমাসাপেক্ষ। কিন্তু এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদাহরণ কোথায়? যুক্তির খাতিরে মনকে ইন্দ্রিয় না মানিলে সুখদুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষকে এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্থল বলা যায়। কিন্তু দেশকে কি সুখদুঃখাদির সঙ্গে এক: পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে? চক্ষুকর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকেও সুখদুঃখাদির যেমন

মানস প্রত্যক্ষ হয়, সকল বহিরিন্দ্রিয় ব্যতিরেকেও দেশের রূপ মানসএ প্রত্যক্ষ হয় কি ? সুখদুঃখাদির সঙ্গে সম পর্য্যায়ভুক্ত করিলে দেশের আর দেশত্ব বা বহিঃসত্ত থাকে না। এবং এইরূপ দেশ কিরূপ পদার্থ আমরা বুঝিতে পারি না। আর দেশ যদি এইরূপ মানস প্রত্যক্ষের বিষয় না হন, তাহা হইলে আমরা বলিব, বহিরিন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং মানস প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়াও প্রত্যক্ষের বিষয় এইরূপ কোন পদার্থের প্রসিদ্ধি নাই। দেশ: সন্দিগ্ধস্থল, সুতরাং উহার উল্লেখ করা যাইতে পারে না। সুতরাং যাহা যাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় (অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়) তাহাই আমাসাপেক্ষ এই ব্যাপ্তি মানিয়া নিলেও ইহা দ্বারা দেশ আমাসাপেক্ষ ইহা সিদ্ধ হয় না।

পরিশেষে কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন 'আমাসাপেক্ষ' বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে কিনা ? 'আমার অর্থাৎ জ্ঞাত র অস্তিত্বের উপর যাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে, ইহাই যদি 'আমাসাপেক্ষ' কথার অর্থ হয়, তবে অনেকে কোন পদার্থেরই, অন্ততঃ ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয় ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরই, আমাসাপেক্ষত্ব মানিতে প্রস্তুত নাও হইতে পারেন। যাহারা কোন পদার্থেরই আমাসাপেক্ষত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা দেশের আমাসাপেক্ষত্বও স্বীকার করিবেন না। সুতরাং প্রথমে বিচারের দ্বারা আমাসাপেক্ষত্বের সিদ্ধি করা দরকার। কিন্তু এই সব বহু তর্ক সাপেক্ষ বিচারে প্রবেশ করা এখানে সম্ভব নয়।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

অনেক কাল পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, তাই লেখকের নাম স্মরণ হইতেছে না, তবে কথাটা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ইহা বেশ মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতীয়দিগের একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দর্শন শাস্ত্রে। অন্য দেশের লোকদিগকে যেরূপ চেষ্টা করিয়া—পড়াশুনা করিয়া দার্শনিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয় ভারতীয়দের ততটা আবশ্যক হয় না। দার্শনিক জ্ঞান ইহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত। দর্শনশাস্ত্রের সংস্কার লইয়াই ইহারা জন্মগ্রহণ করে" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের কোন রচনা লইয়া আমরা উল্লিখিত মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিব। দর্শনশাস্ত্র বলিতে আমরা বেদান্ত সাংখ্য ন্যায় ইত্যাদিই বুঝিয়া থাকি।

যে বয়সে কবি "ছবি ও গান" রচনা করেন তখন বাংলা ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের পুস্তক সুলভ ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় বেদান্ত পড়িবার মত শক্তি ও সুবিধা তখন তাঁহার ছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব "ছবি ও গানের" কবিতায় যদি কোন বেদান্ততত্ত্ব প্রকাশ পায় তবে কবির এই বেদান্ততত্ত্ব পরিজ্ঞান ভারতীয় জন্মের বৈশিষ্ট্য ইহা অস্বীকার করা যায় না।

কাব্যে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি অন্যবিধ তত্ত্বের প্রবেশ পথ দুইটি। প্রথম পথ—কবিনিবদ্ধ ব্যক্তির পাণ্ডিত্য। কাব্যে বা নাটকাদিতে কবিরা যে সকল পাত্রের উল্লেখ করেন তাহাদিগের পরস্পর আলাপে কিংবা তাহাদিগের কাহারও স্বগত চিন্তায় দার্শনিক এবং অন্যপ্রকার তত্ত্বের প্রবেশ কাব্যে সম্ভব হয়। দার্শনিকতত্ত্বে ইহার উদাহরণ—চতুরঙ্গের জ্যেঠা মহাশয়।

দ্বিতীয় পথ—ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে; তবে উহার স্বরূপ বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া রাখিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করিতে সুবিধা হইবে।

সাধারণতঃ কবি তাঁহার প্রবন্ধোপযোগী বিষয় সমূহই বর্ণনা করিয়া

থাকেন কিন্তু রচনার বৈচিত্র্য বশতঃ ক্বচিৎ উহা হইতে এমন বিষয়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে যাহার সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্পর্ক অতি দূর, হয়তো বা কিছুই নাই। এই নূতন অর্থই ব্যঙ্গ্যার্থ—ব্যঞ্জনার ফল।

অপর কথা এই যে বর্ণনীয় প্রকৃত বিষয়ের সহিত এই ব্যঙ্গ্যার্থের সম্পর্ক কোন অংশবিশেষে থাকিলেই চলে, সকল দিক হইতে উহার সহিত সম্বন্ধ নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন এই ব্যঞ্জনাই কাব্যের জীবন, ব্যঞ্জনাহীন শব্দ ও অর্থ 'কাব্য' সংজ্ঞার অযোগ্য।

কোন ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে লেখকের অভিসন্ধি থাকা এবং না থাকা উভয় প্রকারই সম্ভব; তবে কোথায় কিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ লেখকের উদ্দেশ্য তাহা ধরা পড়ে উহার রচনাভঙ্গীতে। অবশ্য ইহাও মানিতে হয় যে কবির যাহাতে অভিসন্ধি নাই এরূপ বিষয়ও ক্ষেত্রবিশেষে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মেঘদূতের

দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্"

হইতে দিঙ্‌নাগাচার্য্যের প্রতি যে কটাক্ষ প্রকাশ পায় তাহা কালিদাস ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়াছেন কিনা তাহা বলা কঠিন। তথাপি

"নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানগ্রভূমীঃ"

ইত্যাদি শ্লোকের ব্যঙ্গ্যার্থ যে তাঁহার নিতান্তই বিবক্ষিত ইহা বলা যায়।

বাচ্যার্থ সাধারণতঃ একরূপই হইয়া থাকে। লক্ষ্যার্থও প্রায় সেই রূপ। ব্যঙ্গ্যার্থ কিন্তু ঐ দুই প্রকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। দেশ কাল প্রয়োজন ইত্যাদি নানা কারণে এবং পাঠকের নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে এক কথা হইতেই নানাবিধ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশ সচরাচর হইয়া থাকে। এই পথে জাগতিক সমস্ত বিষয় এবং জগতের বাহিরে যদি কিছু থাকে তাহাও কবিদিগের অধিকারে আসে। ফলে, কাব্যশাস্ত্র সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়।

তাই মহামনীষী আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—

ন তচ্ছাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন তচ্ছিল্পং ন সা কলা।
ন যন্নবতি কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ॥

প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশে অনেক বিখ্যাত দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহারা চিন্তার ফল প্রকাশ করিয়াছেন সংস্কৃত-ভাষায়। এজন্য বঙ্গভাষা দার্শনিক শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। উল্লিখিত কারণে যথেষ্ট শব্দ সাহায্য না পাওয়ায় বাংলা কবিতায় দার্শনিক ভাব ব্যক্ত করিতে সাদৃশ্যই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তু ব্যঞ্জনায় একটি অসুবিধা আছে। সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং পরিস্ফুট না হইলে উপমান এবং উপমেয় এই দু'য়ের একটির বর্ণনায় অন্যটি বুঝা সম্ভব হয় না।

দার্শনিকতত্ত্ব অলৌকিক। জাগতিক কোন বস্তুর সহিত তাহার ঐ প্রকার স্পষ্ট সাদৃশ্য আশা করা যায় না। অতএব বাংলা কবিতা হইতে দার্শনিক ভাবের ব্যঞ্জনা পাইতে হইলে শব্দের সাহায্যও আবশ্যক। যেখানে তাহা পাওয়া যাইবে না ঐজন্য সাদৃশ্যের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে সেখানে ভাবের প্রকাশও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ ইহা দেখাইব।

ব্যঞ্জনা প্রবন্ধগত বাক্যগত এমন কি পদ এবং পদের অংশগতও হইতে পারে। আমরা কবির "রাহুর প্রেম" কবিতায় ঐরূপে নানাবিধ ব্যঙ্গ্যার্থ এবং কিছু দার্শনিকতত্ত্বের ও অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

প্রেম সমানে সমানে হইয়া থাকে। উহার উত্তম পুষ্টি দেখিতে পাই 'মধুমতী'তে*। এইরূপ প্রেমের মাধুর্য্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া অসমান স্ত্রী-পুরুষে প্রেম জন্মিতেই পারে না অথবা তাহার উৎকর্ষ কম ইহাও মানা যায় না। রজনী ও শচীন্দ্রের ভালবাসা এই শ্রেণীর। ইহাতে দেখিতে পাই—মালাকরকন্যা অন্ধ রজনী চিকিৎসা প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্ন ডাক্তার শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর এবং কয়েকটি অঙ্গুলির স্পর্শ একবার মাত্র পাইয়া তাহাকে এতই ভালবাসিয়া ফেলিল যে কেবল তাহারই ফলে শচীন্দ্রও রজনীর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না।

একের নীরব প্রেম অপরকে কত গভীর ভাবে আবিষ্ট করিতে পারে রজনী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

* বঙ্গদর্শন ১২৮০ সাল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রবল অনুরাগের ন্যায় তীব্র বিরাগও আকর্ষণের কারণ হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে আকৃষ্টব্যক্তির প্রেমও গভীর হইতে পারে এবং তাহা উল্লিখিত দুই প্রকার হইতে কোনরূপে অপকৃষ্ট নহে।

এই নূতন তত্ত্বের শিক্ষা পাই আমরা রাহুর প্রেমে। উহাই এই কবিতার প্রবন্ধগত ব্যঙ্গ্যার্থ। কেহ দরিদ্র অথবা কদাকার হইলে তাহার মনে যে প্রেম জন্মিতে পারে না কিম্বা সেই প্রেমের পাত্রও ঐরূপ কদাকার এবং দরিদ্র হইবে এমন নিয়ম নাই। অতএব রাহু বলিতে এখানে বুঝা যায় একজন কদাকার পুরুষ। এই রাহুর প্রণয়পাত্র সম্ভবতঃ সাহিত্যের নায়িকা অতএব সর্বথা অনবদ্যা। ইনি রাহুকে কোন মতেই আমল দিতে চাহেন না, তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করেন, তাড়াইয়া দিতে পারিলে বাঁচেন কিন্তু রাহু যথার্থ প্রেমিক, সে কোন প্রকারেই হাল ছাড়িতে প্রস্তুত নয়।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিবেন ইহা রসাভাস,* রস নহে। হউক রসাভাস, তাই বলিয়া এই প্রেমের মাধুর্য্য মর্য্যাদা কম ইহা মানিব না।

এই রাহুর পরিচয় দিতে কবি বলিয়াছেন—

"অনন্তকালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া"

রাহুর এই পরিচয়ের মধ্যেই আমরা দার্শনিক তথ্য দেখিতে পাই। রাহু পৃথিবীর ছায়া ইহা আজ সকলেই জানেন। বড় পৃথিবীর ছায়া যদি রাহু তবে ছোট এই পার্থিব দেহের ছায়াই বা রাহু হইবে না কেন? তাহা হইলে অনায়াসেই বলা যায়—তোমার আমার ছায়াও রাহু।

দার্শনিক দৃষ্টিতে ছায়াতত্ত্বের বিচার করিলে দেখিতে পাই উহা প্রতিবিম্বজাতীয় পদার্থ। উহার মূল বস্তু বিম্ব-প্রকৃতস্থলে পৃথিবী বা পার্থিব দেহ। উহা বাদ দিলে রাহুর এই ছায়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। এদিকে রাহু যেভাবে নিজের ভালবাসা ব্যক্ত করিতেছে তাহা প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এক্ষণে স্বতন্ত্র অস্তিত্বহীন এই রাহুকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকিল বিম্ব ও প্রেম। ফলে দাঁড়াইতেছে—এই রাহুর প্রেম শুদ্ধ আত্মপ্রেম। কারণ, বেদান্ত মতে একমাত্রই আত্মাই সত্য, অন্য সমস্তই

* "রস্তৌ তথাহনুভয়নিষ্ঠায়াং" সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।

প্রতিবিম্বজাতীয় কল্পিত বস্তু। আত্মপ্রেমই যে প্রেমের চরম তাহা বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈব মন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥

অর্থাৎ আমি যে অন্যকে ভালবাসি তাহার মূলে রহিয়াছে আমার নিজের প্রতি ভালবাসা। কিন্তু নিজেকে যে ভালবাসি তাহার কোন কারণ নাই উহা স্বাভাবিক—হেতুনিরপেক্ষ এবং হেতুনিরপেক্ষ বলিয়াই উহা অবিনশ্বর, নিত্য। তাই বলিতেছিলাম আত্মপ্রেম প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তাই আত্মদৃষ্টিতে উপাসনার এত মাহাত্ম্য। নিঃস্বার্থ প্রেম একটি কথার কথা মাত্র।

উপনিষদও বলিয়াছেন—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি,—ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।

রাহু এবং তাহার প্রণয়পাত্র এইভাবে একাত্মা। সংসারে কিন্তু এককের স্থান নাই। ঐভাবে যে কোন ভালবাসা হইতে পারে আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। তাই উহা প্রকাশের জন্য চাই অন্যের -স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব। এখন প্রশ্ন হয়—রাহু এবং তাহার আসল মূর্ত্তি একজাতীয়ই, পুরুষ ও স্ত্রী এই মিথুনভাব তাহাতে সম্ভব নহে, অতএব উল্লিখিত ব্যঙ্গ্যার্থ কল্পনা সম্ভব হয় কিরূপে? ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি—ব্যঙ্গ্যার্থে আসলের সহিত সর্ব্বাংশে সাম্য নিষ্প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি এই পরম প্রেমের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় কবিতার "রাহুর প্রেম" এই সংজ্ঞা হইতে। এখন এই প্রেমের পরমত্ব বা চরম উৎকর্ষ কেন এবং ইহা যে ঔপনিষদ প্রেম তাহা বুঝিবার জন্য কবিতাটির বিভিন্ন অংশ আলোচনা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে একটি অপ্রিয় সত্য সভয়ে বলিতে চাই। তাহা এইরূপ—

বঙ্গভাষার নিজস্ব কোন দার্শনিক তত্ত্ব নাই। ইহাতে আমরা যেটুকু দার্শনিকতা পাই তাহা অন্য ভাষার প্রধানতঃ সংস্কৃতভাষার সম্পত্তি। সুতরাং

সেই ভাব প্রকাশ করিবার সামর্থ্য সংস্কৃতভাষায় যত বেশী বঙ্গভাষায় তাহা আশা করা যায় না। কারণ, ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে বঙ্গভাষার একমাত্র অবলম্বন সাদৃশ্য কিন্তু সংস্কৃতভাষা সাদৃশ্য ব্যতীত স্বীয় শব্দ এবং তাহার লিঙ্গ-বচনাদির সাহায্যেও ঐ পথে অগ্রসর হয়।

দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশে সংস্কৃতভাষার এই অসাধারণ্য থাকায় আমরা প্রথমে এই কবিতাটির সংস্কৃত অনুবাদ উদ্ধার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মূল অংশ হইতেই আমাদের বক্তব্য সমর্থন করিব।

উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছিলে প্রেম কখনও কথার দ্বারা আত্ম-প্রকাশ করে না কিংবা উহার দ্বারা প্রেমপাত্রের মর্য্যাদাহানি হয় না। উহা নীরবে এক ভাবেই বহিতে থাকে, সর্ব্বদাই উহা প্রণয়ীকে প্রণয়াস্পদের চরণে শরণাপন্ন করে। ইহা দেখাইতে বলা হইয়াছে—

আশ্লিষ্য পাদযুগলং স্থিতিমপ্যভিন্দন্
এবং চিরায় গতবাক্ ত্বয়ি সন্নিধাস্যে ॥

কবির ভাষায়—কঠিন বাঁধনে চরণ ঘেরিয়া
চিরকাল তোরে রব আকড়িয়া
কঠিন লৌহ ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী
রুধিয়াছি কারাগারে।
প্রাণের শৃঙ্খল পরায়েছি প্রাণে
দেখি কে খুলিতে পারে॥

কবিতাটি অপরিণত বয়সের রচনা। নতুবা তিনি বলিতেন এই বন্ধন: স্বর্ণ শৃঙ্খলের, লোহার শিকলের নহে।

সংস্কৃত ভাষায় 'জাতরূপ' শব্দের অর্থ স্বর্ণ। উহার দ্বারা 'জন্ম স্বরূপ' এই প্রকার অর্থও পাওয়া যায়। জন্ম দেহগ্রহণ। দেহ ব্যতীত ছায়ার অর্থাৎ রাহুর সহিত উহার এই প্রেমপাত্রের সম্বন্ধ কিছুতেই সম্ভবে না। জীবন থাকিতে কেহ এই রাহুকে তাহার প্রেমপাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না ইহাও ধ্রুব সত্য। ইহাই ত ভালবাসার চরম উৎকর্ষ যে কখনও তাহা নষ্ট বা বিকৃত হয় না। জন্মস্বরূপ এই বন্ধন হইতে এক-মাত্র নির্ব্বাণমোক্ষলাভ ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়া যায় না ইহা সকল

দর্শনশাস্ত্রের অপ্রতিবাদ সিদ্ধান্ত। মুক্তিলাভ কত কঠিন তাহাও দর্শন-শাস্ত্র আলোচকদিগের অবিদিত নহে। প্রীতির-বন্ধনস্থান প্রাণ বা হৃদয়। উহাই শাস্ত্রসম্মত হৃদয়গ্রন্থি। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করা যায় কেবল সেই পরাবর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে। উদ্ধৃত কবিতার শেষের দিকে এই কথা-কয়টি রহিয়াছে। তাই ইহার অনুবাদ হইয়াছে—

বন্দীকৃতাঽসি সুচিরায় তথাঽবিদগ্ধে
ত্বত্তঃ কথঞ্চন যথা ন পৃথক্ ক্রিয়েয়।
ন্যস্তং হি তে হৃদয়মর্ম্মণি জাতরূপ-
সূত্রেণ বন্ধনমিদং ক ইব চ্ছিনত্তু॥

কবি বলিয়াছেন অভাগিনী। তাহা ভালই হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ব্যতীত দুঃখবহুল জন্মলাভ ঘটে না। তাই ঘরে ঘরে এখনও গান শুনা যায় —

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

'অভাগিনী'র পরিবর্ত্তে অনুবাদে আসিয়াছে—অবিদগ্ধে। অবিদগ্ধা অনিপুণা। আত্মজ্ঞান লাভের কৌশল তোমার জানা নাই। অথচ একমাত্র আত্মজ্ঞানলাভ ব্যতীত এই জন্মবন্ধন ছিন্ন করাও সম্ভব নহে। অতএব চিরকাল তুমি আমার—অর্থাৎ রাহুর বন্দী।

যে প্রেম স্বাভাবিক কাল তাহা নষ্ট করিতে পারে না। যে ভাল-বাসা চরমে পৌছিয়াছে কাহারও কোন ক্রিয়া—যথেচ্ছ ভ্রমণাদি আচরণেও তাহা বিকৃত হয় না। কারণ, তাহা নিরুপাধি অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বিশেষ অপেক্ষা করিয়া তাহা সৃষ্ট নহে। ইহা একমাত্র আত্মপ্রেম। তাই কবি বলিয়াছেন—

জগৎ মাঝারে যেথায় বেড়াবি
যেথায় বসিবি যেথায় দাঁড়াবি
কি বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে।

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা] দর্শন [শ্রাবণ, ১৩৪৯ সাল

নিত্য-পরিণামশীল প্রকৃতি

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম্. এ, পি-এচ্. ডি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি শব্দ আমাদের দেশের দর্শনে, সাহিত্যে পুরাণে ও লোকমুখে এত অধিক প্রচলিত যে আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের অর্থসম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠে না। এমন অনেক শব্দ আছে যাহার ব্যবহার আমরা অবলীলাক্রমে করিয়া যাই, কিন্তু ইহাদের ঠিক অর্থ কি, এই প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ভাবিয়া উত্তর খুঁজিয়া পাই না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই প্রকারেরই শব্দ। ইহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে যিনিই ভাবিয়াছেন, তিনিই বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। সাংখ্য-যোগের ভাষায় ত্রিগুণের ব্যাখ্যা করাতে কোনই গোল নাই। কিন্তু যদি অন্য ভাষায় ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করা যায় তাহা হইলেই নানা জটিল প্রশ্ন উঠে। আধুনিক কালেও ত্রিগুণের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাদিক্ হইতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতগুলি একদেশদর্শিতা-প্রসূত। কতকগুলি সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক এবং অর্থনির্ণয়ের পক্ষে বহুপরিমাণে সহায়ক।[১] কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই সর্ব্বাংশে কৌতূহল নিরাস করে না। এই জন্য এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বিষয়টি এত বিভিন্নদিক্ হইতে বিশদভাবে বিচার করা প্রয়োজন যে কোনও ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহা করা সম্ভব পর নয়। সাংখ্য-কারিকা নামক সাংখ্য দর্শনের সুপ্রাচীন গ্রন্থে গুণ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই এখানে ত্রিগুণের

১। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-কৃত 'Studies in Vedantism' নামক গ্রন্থে ত্রিগুণ সম্বন্ধে যে অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এরিষ্টটলের দর্শনের actuality ও potentiality র সহিত সত্ত্ব ও তমের তিনি যে তুলনা করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের উৎপত্তি।

অর্থকল্পনার চেষ্টা করিব। কল্পিত অর্থ অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যবহৃত ত্রিগুণ শব্দের অর্থের অনুযায়ী কিনা তাহার আলোচনা সম্প্রতি করিব না। প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যেই আলোচনা নিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু যদি সাংখ্য-কারিকার ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থের বর্ণিত ত্রিগুণের অর্থ সন্তোষজনক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়, তবে অন্যত্র ইহা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করাও হয়ত সহজ হইবে।

ত্রিগুণের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ সাংখ্যের প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতি ও উহা হইতে উদ্ভূত এই জগৎ নিত্য-পরিণামশীল। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, দুগ্ধ হইতে দধি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, প্রকৃতি হইতেও তেমনি জগতের উৎপত্তি হয়। দধি দুগ্ধেরই পরিণত অবস্থা বা পরিণাম। অঙ্কুর বীজের পরিণাম; জগৎ মূলপ্রকৃতির পরিণাম। সাংখ্যের এই পরিণামবাদ ও বৈশেষিকের আরম্ভবাদের মধ্যে একটা মৌলিক দৃষ্টিগত পার্থক্য আছে ; তাহা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা প্রধানতঃ বস্তুর গঠনপ্রণালী দুই প্রকারের দেখিতে পাই। বহু অবয়ব বা অংশ একত্র সংযুক্ত করিয়া ঘট, পট, গৃহ প্রভৃতি রচিত হয়। মানুষ নানা দ্রব্য হইতে এইভাবে নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করে। এই পদ্ধতিতে বহুর সংযোগে একের গঠন সম্ভব হয়। কিন্তু সজীব দ্রব্যের উৎপত্তির প্রণালী অন্য প্রকারের। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ ইত্যাদির উৎপত্তি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই সব স্থলে এক হইতে বহুর সৃষ্টি হয়। যে বীজ পূর্ব্বে অবিভক্ত ছিল তাহা স্বতঃ বিভক্ত ও বিকশিত হইয়া শাখা, পত্র, মূল, ফুল, ফল প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়। মানুষ যখন কৃত্রিম বৃক্ষ অঙ্কিত করে বা প্রস্তুত করে— তখন এক একটি অংশ প্রস্তুত করিয়া জুড়িয়া জুড়িয়া বৃক্ষ গঠন করে কিন্তু সজীব বীজ হইতে স্বাভাবিক উপায়ে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন এক হইতেই ক্রমে বহু অংশ উদ্গত বা উদ্ভিন্ন হয়। কৃত্রিমের গঠন হয় অংশের সমাবেশে, সম্মেলনে বা সংযোগে। আর নৈসর্গিক সজীব দ্রব্যের উৎপত্তি হয় অবিভক্তের স্বতঃ বিকাশে, বিভাগে ; অনভিব্যক্তের স্ফুরণে, উন্মেষে বা অভিব্যক্তিতে। ফরাসীদেশের বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক বার্গসোঁ এই দুপ্রকার নির্ম্মাণ-পদ্ধতির যথাক্রমে manufacture ও organization নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমরা প্রথমটিকে গড়া বা গঠন বা রচনা বলিতে পারি ; দ্বিতীয়টিকে বলিতে পারি উৎপাদন। যদিও গৌণভাবে উৎপাদন শব্দটি আজকাল কৃত্রিম-গঠনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তথাপি মুখ্য অর্থে ইহা স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈশেষিক প্রথম উপায়ে অর্থাৎ মানুষ যেরূপে কৃত্রিম দ্রব্য গড়ে সেই-

ভাবে জগতের সৃষ্টি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি জগৎকে ঘটের সঙ্গে এবং ঈশ্বরকে কুম্ভকারের সঙ্গে তুলনা করেন এবং জগতের উপাদানের জন্য বহুপ্রকারের পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের কল্পনা করেন। কি প্রকারে পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর সংযোগে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক একটি দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাংখ্য দ্বিতীয় প্রণালীতে অর্থাৎ সজীবের স্বাভাবিক উৎপত্তি বা পরিণতির দৃষ্টান্তে জগতের সৃষ্টি বুঝিতে চেষ্টা করেন। সেইজন্য এক স্বতঃ-পরিণামশীল মূল প্রকৃতির কল্পনা করিয়া উহা হইতে তিনি নানা প্রকার বস্তুর ক্রমিক উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি বুঝিতে চান। সেইজন্য তাঁহার দৃষ্টিতে সৃষ্টির অর্থ—অব্যক্তের অভিব্যক্তি, অবিভক্তের বিভাগ, নিরবয়বের সাবয়বাকারে পরিণতি বা বিকাশ। এই জন্যই সাংখ্যের সৃষ্টির কাহিনী পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে; কি প্রকারে মহাভূত সকলের সংযোগে জগতের নানা দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সাংখ্য যেখানে থামিয়াছে, বৈশেষিক দর্শনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে সেখানে হইতে। ভূত-পরমাণু হইতে কি প্রকারে দ্রব্য গঠিত হয় বৈশেষিকের তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। দৃশ্যমান জগতের অসংখ্য দ্রব্যের গঠনের অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈশেষিক পঞ্চমহাভূতের কল্পনা করিলেন। বহুকে অল্পের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টার মূলে রহিয়াছে চিন্তার লাঘবের চেষ্টা, যাহাকে তাঁহারা লাঘব-ন্যায় বলেন। সাংখ্য এই লাঘব-ন্যায়ই আরও একটু দূরে প্রসারিত করিয়া মহাভূতগুলির এক সাধারণ কারণ আছে বলিয়া স্থির করিলেন। একই অহঙ্কার তত্ত্বের নানামুখী অভিব্যক্তিতে একদিকে জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধন ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি, অপরদিকে জ্ঞানের বিষয় বা ক্রিয়ার উপাদানের সৃষ্টি। কল্পনা-লাঘবের দৃষ্টিতে সাংখ্য বৈশেষিক হইতে শ্রেয়ঃ। এই লঘুতর কল্পনা নৈসর্গিক জগতে এক অবিভক্ত কারণ হইতে বহুকার্য্যের অভিব্যক্তির দৃষ্টান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই কল্পনা নিরাধারও নহে।

সাংখ্যের পরিণামবাদ বুঝিতে এত কথার অবতারণা করিতে হইল। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও কতকগুলি বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন। পরিণামের ধারা যেমন এক হইতে বহুর দিকে, তেমনি সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের দিকে। সাংখ্য সৎকার্য্যবাদী ইহা সুবিদিত। তাঁহার মতে কার্য্য কারণে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। যেখানে যাহার কোন-প্রকারই অস্তিত্ব নাই সেখান হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। বটের বীজ হইতেই বটবৃক্ষের সৃষ্টি হয়, আম্রবীজ হইতে হয় না।

সুতরাং কার্য্য কারণেরই অভিব্যক্ত অবস্থা, আর কারণ কার্য্যেরই অব্যক্ত অবস্থা।

'পরিণাম' এই বিশেষ্য শব্দ ব্যবহার করায়, পরিণাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে বাধা জন্মে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরিণাম একটা স্থায়ী দ্রব্য নহে, উহা মূলতঃ ক্রিয়াত্মক। পরিণাম এক প্রকারের পরিবর্ত্তন। সাংখ্যের মতে মূল-প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান দৃশ্যমান জগৎ পর্য্যন্ত কোথাও এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে অবিরত পরিবর্ত্তন না চলিতেছে। বিষয় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। ঘট, পট, গৃহ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, তারকা প্রভৃতি বাহ্য বিষয় এবং রাগ, দ্বেষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি আভ্যন্তর বিষয়—যাহা কিছু চৈতন্য দ্বারা উদ্ভাসিত বা জ্ঞাত হয় সকলই পরিবর্ত্তনশীল। স্থূল দৃষ্টিতে কোন কোন বিষয়কে আমরা স্থায়ী বলিয়া মনে করি। হিমালয় পর্ব্বত বা চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দ্রব্যকে নিত্য বলিয়া ভাবি। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সব দ্রব্যেরও উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহাদিগকে যখন স্থায়ী বলিয়া মনে হয় তখনও ইহাদের ভিতরে আমাদের অলক্ষিতে অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং বিষয়মাত্রই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। চৈতন্য-ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু আমাদের নিকট দ্রব্য বলিয়া পরিচিত তাহার প্রত্যেকটি এক একটী পরিণাম বা পরিবর্ত্তন, বা উহাদেরই সমষ্টি মাত্র। যখন কোন মুহূর্ত্তে আমরা হিমালয় পর্ব্বত প্রত্যক্ষ করি, তখন বস্তুতঃ বিশেষ একটা পরিণামই প্রত্যক্ষ হয়। হিমালয় বলিতে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের যে স্থির দ্রব্যের কথা মনে আসে তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা পর পর উৎপন্ন বহু অবস্থার সমষ্টিমাত্র। সাংখ্যের ভাষায় বলিতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে স্থির বলিয়া প্রতীয়মান প্রত্যেক বিষয় বহু ক্রমিক ও অবিচ্ছিন্ন পরিণামের দ্বারা উৎপন্ন একটা প্রবাহ মাত্র। যেমন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নদীর জলের পরিবর্ত্তন হইতেছে, একের পর অন্য জলরাশি আসিয়া নদীর বক্ষঃ পূর্ণ করিতেছে, অথচ অবিচ্ছিন্নভাবে নূতন জলরাশি আসাতে নদীর প্রবাহ বা ধারাকে একই বলিয়া মনে হয়, তেমনি জগতের প্রত্যেকটি বিষয় বহু পরিণামের অবিচ্ছিন্ন ধারায় গঠিত এক একটি প্রবাহমাত্র। প্রবাহের ছেদ নাই বলিয়া উহা স্থির মনে হয়। সমগ্রজগৎও এইভাবে একটা অবিচ্ছিন্ন পরিণামের প্রবাহ, তাই উহাও এক এবং নিত্য বলিয়া মনে হয়।

সাংখ্যদর্শনের এই প্রকৃততত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের প্রচলিত দৈনন্দিন দৃষ্টির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নূতন দৃষ্টিতে সমগ্র ব্যক্ত জগৎ সক্রিয়, গতিশীল নিয়তপরিণামশীল একটা প্রবাহ মাত্র। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বহুকালব্যাপী বা অল্পকালব্যাপী যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি

বা ভাবিতে পারি, সবই ক্ষুদ্র, বৃহৎ, দীর্ঘ বা হ্রস্ব পরিণাম-প্রবাহ। এইরূপ প্রবাহকেই স্থির কল্পনা করিয়া আমরা ইহাকে একটা দ্রব্য বলিয়া ভাবি; প্রবাহের এক অংশকে সমগ্র প্রবাহের গুণ বা ধর্ম্মরূপে কল্পনা করি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যাহাকে আমরা দ্রব্যের গুণ বলিয়া ভাবিয়া থাকি তাহার প্রত্যেকটি এক একটি পরিণাম বা ক্ষুদ্র প্রবাহ, দ্রব্যটি এই সবের সমষ্টিরূপ একটা অপেক্ষাকৃত বড় প্রবাহ। এই জন্য গুণ ও দ্রব্য, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীতে সাংখ্যের মতে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই।

পরিণাম শুধু ব্যক্ত জগতেই নিবদ্ধ নয়। প্রকৃতির যখন সাম্যাবস্থা তখনও তাহার অভ্যন্তরে নিয়ত পরিণাম চলিতে থাকে; যদিও তাহা সদৃশ পরিণাম এবং তাহা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের সৃষ্টি হয় না।

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্যের মতে বিষয়ের জ্ঞান হয় আমাদের চিত্তের বিষয়াকারে পরিণাম দ্বারা। যে পর্য্যন্ত চিত্ত বিষয়াকারে পরিণত না হয় সেই পর্য্যন্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার জ্ঞানই হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বাহ্যবিষয় বা পরিণাম আমাদের আভ্যন্তরিক পরিণাম ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই। নিজে পরিবর্ত্তিত না হইয়া বাহ্য পরিবর্ত্তনকে বুঝিতে পারা যায় না। বাহ্য বিষয়ের গুণ বা ধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত আমাদের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত বাহ্যকে বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য সাংখ্যের বাহ্য বস্তুর বর্ণনায় এমন অনেক বিশেষণ দেখিতে পাই যাহা সাধারণতঃ আমরা আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধেই প্রয়োগ করি।

বাস্তবিক পক্ষে সাংখ্যের দৃষ্টিতে বাহ্য ও আভ্যন্তর পরিণামে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই। কারণ উভয়ই চৈতন্যের বিষয়, সুতরাং অচেতন। শুধু তাহাই নহে, সাংখ্যের সৃষ্টির ক্রম লক্ষ্য করিলে দেখা যায় আভ্যন্তর হইতেই বাহ্যের অভিব্যক্তি হয়। বাহ্য বিষয় আন্তর বিষয়েরই স্থূল অভিব্যক্তি। যাহা নিরবয়ব ও অবিভক্ত তাহা হইতেই বিভক্ত ও সাবয়বের উৎপত্তি। এই উৎপত্তির ধারা বৌদ্ধ, বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক-দের মধ্যে ব্র্যাড্‌লে, বার্গসোঁ এবং হোয়াইট্‌হেড্‌ প্রভৃতির দর্শনেও বিভিন্ন-ভাবে সৃষ্টির এই ধারাই স্বীকৃত হইয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সাংখ্যের মতে বাহ্য বিষয়ের উৎপত্তিও হয় আভ্যন্তর পরিণাম হইতে এবং উহার জ্ঞানও হয় আভ্যন্তর পরিণাম দ্বারা। বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়-বুদ্ধি-সাপেক্ষ। বুদ্ধি ছাড়া বিষয় নাই, বিষয় ছাড়া বুদ্ধি নাই—ইহাই সাংখ্যের দ্বিবিধ-সর্গের (অর্থাৎ যুগপৎ

প্রবর্ত্তমান প্রত্যয় বা বুদ্ধির সৃষ্টি এবং বিষয়ের সৃষ্টির) তাৎপর্য্য। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানবাদ নয়। কারণ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সাংখ্য অস্বীকার করেন। তাহা ছাড়া সাংখ্য ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও সমষ্টিগত বুদ্ধির পার্থক্য স্বীকার করেন। ব্যক্ত বিষয়সমূহের উপাদান বা আলম্বন সমষ্টিবুদ্ধি—সেজন্য ব্যক্তজগৎকে সামান্য (বহু দ্রষ্টার দ্বারা দৃশ্য সাধারণ বিষয়) বলিয়া বর্ণনা করেন। অবশ্য, বুদ্ধি নিজেই প্রকৃতির পরিণাম: সুতরাং তাহার নিজস্ব কোন চেতনাশক্তি নাই। চেতন পুরুষের সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়াই বুদ্ধি চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির সব পরিণামই চেতনপুরুষের বিষয়। পুরুষের চৈতন্যের সম্পর্কেই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে এবং চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত বুদ্ধির দ্বারাই পরিণামগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানও সম্ভব হয়।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাংখ্যের মতে বিষয়রূপ প্রকৃতির যত পরিবর্ত্তন বা পরিণাম তাহা জ্ঞাতা পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ। শুধু তাহাই নয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তন বা পরিণাম বাসনাযুক্ত বদ্ধপুরুষের ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন। যেমন অপূর্ণবাসনা-ভোগের জন্য স্বপ্নে পুরুষের চিত্ত হইতে নানাপ্রকার ভোগ্য বিষয়ের উৎপত্তি হয় তেমনি জাগ্রদবস্থাতেও বাসনার তাড়নায় প্রকৃতি হইতে (বুদ্ধি প্রভৃতি পরিণাম দ্বারা) বদ্ধপুরুষের ভোগের জন্য নানা ভোগ্য বিষয়ের ও ভোগের সাধন-স্বরূপ ইন্দ্রিয় সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যেকটি বিষয় প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রত্যেকটি পরিণাম চেতন পুরুষের সম্পর্কে এবং তাহারই উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়। কোন পরিণামই উদ্দেশ্যবিহীন নহে। ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রত্যেক বিষয়ই প্রকৃতির এক একটি সার্থক (অর্থাৎ প্রয়োজন-সাধক) পরিবর্ত্তন। সমগ্র বিশ্ব এই সার্থক পরিবর্ত্তনের সমষ্টি। এমন কোন জ্ঞেয় বা বিষয় নাই যাহার সম্পর্কে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। কিন্তু পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের অর্থ প্রকৃতির এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি। সুতরাং কোন পরিণাম বিশ্লেষণ করিলে ইহার ভিতরে তিনটি পরস্পরাশ্রয় অবিচ্ছেদ্য অবস্থা লক্ষিত হয়। (ক) বীজাবস্থা বা অনভিব্যক্তাবস্থা, (খ) উদ্দিষ্ট আকারের দিকে অভিব্যক্তির জন্য প্রবৃত্তি বা যত্ন এবং (গ অভিব্যক্ত অবস্থা। পরিণাম যতই ক্ষুদ্র হউক ইহার এই তিনটি দিক না থাকিলে উহাকে পরিণাম বলিয়াই ভাবিতে পারা যায় না। এই তিনটি অবস্থার হেতুত্রয়কে যথাক্রমে তমঃ, রজঃ এবং সত্ত্ব বলা যায়। প্রকৃতির প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরিণামেই এই তিনটি উপাদান বর্ত্তমান। সুতরাং সৎকার্য্যবাদ অনুসারে প্রকৃতিতে এই তিনটি উপাদানের কল্পনা করা যায়।

গুণত্রয়ের এই ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে অনেকের নিকটই বিস্ময়জনক মনে হইবে। সেইজন্য ত্রিগুণ সম্বন্ধে কারিকায় যে বর্ণনা আছে তাহাতে এই অর্থ খাটে কিনা এবং গুণের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হইতে নূতন অর্থ কোন অংশে ভাল কিনা তাহা বিচার করা প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যেমন তিনটি বিভিন্ন বর্ণের সূতার সংযোগে একটি দড়ি প্রস্তুত করা যায় তেমনি তিনটি গুণের সংযোগে প্রকৃতি গঠিত। গুণগুলি যেন এক একটা পরমাণুর মত, এবং প্রকৃতি যেন ইহাদের সমষ্টি। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের ব্যাখ্যায় গুণগুলিকে কতকটা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুণগুলি প্র তির উপাদানরূপ তিন প্রকারের মূলদ্রব্য; প্রত্যেক প্রকারের গুণদ্রব্যই সংখ্যায় অনন্ত (প্রবচন ভাষ্য, ১।১২৮ সূঃ)। ইহাদের সংযোগ ও বিভাগ রূপ ধর্ম্ম আছে (ঐ, ১।৬১ সূঃ)। প্রকৃতি তিন প্রকারের অসংখ্য গুণ ব্যক্তির সংযোগলব্ধ সমূহ। পরমাণুর ন্যায় গু।গুলিরও সংখ্যা কল্পনা করিয়া ভিক্ষু ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ও বৈষম্যাবস্থা সংখ্যাগত বলিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিয়ছেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনটি গুণই অসংখ্যভাবে প্রকৃতিতে থাকায় সাম্য সম্ভব হয় এবং সৃষ্টিকালে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তিন প্রকারের গুণব্যক্তির সংযোগ হয়। সে দ্রব্যে সত্ত্ব গুণের সংখ্যা বেশী তাহাকে সাত্ত্বিক, যাহাতে রজোগুণের সংখ্যা বেশী তাহাকে রাজসিক এবং যাহাতে তমোগুণের সংখ্যা বেশী তাহাকে তামসিক বলা হয়। সত্ত্বাদির হ্রাসবৃদ্ধি তাহাদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির জন্যই হয় (প্রবচন ভাষ্য, ১।১২৮)। এই ব্যাখ্যানুসারে সাংখ্য যে বৈশেষিকের মতই প্রায় হইয়া দাঁড়ায় ভিক্ষু তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই আশঙ্কার নিরাস করার চেষ্টাও করিয়াছেন। "যদি মূল কারণ সত্ত্বাদিকে পরিচ্ছিন্ন (finite) ও অসংখ্য ব্যক্তিস্বরূপ স্বীকার করা যায়, তবে বৈশেষিকের সঙ্গে সাংখ্যের পার্থক্য কি রহিল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সত্ত্ব প্রভৃতির (ভূতাদির মত) শব্দস্পর্শাদি গুণ নাই।" অনেক পরিচ্ছিন্ন গুণব্যক্তি স্বীকার করিলে সুবিধা এই যে তাহাদের সংযোগে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের সৃষ্টি কল্পনা করা যাইতে পারে; এবং তাহাদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিতে অনুপাতের তারতম্য স্বীকার করা যায়। কিন্তু যদি প্রত্যেকটি গুণের সংখ্যা বহু না হয় তাহা হইলে হ্রাসবৃদ্ধির অর্থ হয় না; সব দ্রব্যেই তিনগুণের অনুপাত একই হইবে; বেশী কম হইতে পারে না। ইহাই বিজ্ঞানভিক্ষুর বক্তব্য।

পূর্ব্বে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সাংখ্যের পরিণামবাদ ও বৈশেষিকের আরম্ভবাদের মৌলিক একটা পার্থক্য আছে। একটি অবিভক্ত অব্যক্ত কারণের বহুধা বিভক্ত পরিণাম বা অভিব্যক্তির দৃষ্টান্তের উপর স্থাপিত, অপরটি বহু অবয়বের সংযোগে এক দ্রব্য গড়ার দৃষ্টান্তের

উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিক্ষু এই পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া সাংখ্যের সৃষ্টিক্রম বৈশেষিকের ধারাতেই বুঝার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য গুণত্রয়ের সংযোগে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় একটা বড় আপত্তি এই যে, যে সকল দ্রব্যের পৃথক্ অস্তিত্ব সিদ্ধ আছে তাহাদের মধ্যেই সংযোগ-সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। সাংখ্যের মতে গুণত্রয় পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে; কখনও পৃথক থাকে না। সুতরাং ইহাদের সংযোগ বা বিয়োগ কল্পনা করা যায় না। বাচস্পতি-মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে সাংখ্যের এই গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন —"অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ।......নাপি সত্ত্ব-রজ-স্তমসাং পরস্পরং সংযোগঃ, অপ্রাপ্তেরভাবাৎ।" (১০ম কারিকা)। সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেষিকের পার্থক্যও তিনি বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন, সাংখ্যের মতে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি হয়, আর কণাদ ও গৌতমের মতে ব্যক্ত হইতেই ব্যক্তের উৎপত্তি হয়, (ঐ ১৫শ কারিকা)।

সাংখ্যকারিকায় ব্যক্ত ও অব্যক্তের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে গিয়া বলা হইয়াছে ব্যক্ত সাবয়ব, অব্যক্ত তাহার বিপরীত। যদি অব্যক্ত প্রকৃতি তিনটি গুণের সংযোগে গঠিত বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও সাবয়ব বলিতে হইবে; নিরবয়ব বলার কোনই কারণ নাই। ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে গুণত্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংযোগ নয়; অন্য কোন প্রকারের হইবে। ভিক্ষুর ন্যায় যাঁহারা সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব কারণ সংযোগে কার্য্যসৃষ্টির ধারায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা প্রকৃতির নিরবয়বত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গোলে পড়িয়াছেন, এবং নানাপ্রকার কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন।

অবয়ব-সংযোগ ব্যতিরেকে কিরূপে প্রকৃতিতে তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব সম্ভব তাহা আমাদের কল্পিত ব্যাখ্যায় স্পষ্ট বুঝা যায়। অনভিব্যক্তি (বা আবরণ), অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি, এবং অভিব্যক্তি এই তিনটি অবস্থার মূলীভূত তিনপ্রকারের কারণ বা শক্তির নাম যদি যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব হয়, তাহা হইলে এই তিনটি গুণের সম্বন্ধ সংযোগ বলিয়া কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। সাংখ্যকারিকাতে ত্রিগুণের ধর্ম্ম, প্রয়োজন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে আমাদের কল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা বুঝিবার পক্ষে কেমন সুবিধা হয় তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে।

উক্ত গ্রন্থে তমঃ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ইহা বিষাদাত্মক, ইহার কাজ নিয়ম, ইহা গুরু এবং বরণক। রজঃ দুঃখাত্মক, ইহার কাজ প্রবৃত্তি, ইহার ধর্ম্ম উপষ্টম্ভকত্ব ও চলত্ব। সত্ত্ব সুখাত্মক, ইহার কাজ প্রকাশ, ধর্ম্ম প্রকাশত্ব

ও লঘুত্ব। গুণত্রয়ের যে ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে তাহাদ্বারা এই বর্ণনার অর্থ যেমন স্পষ্ট হইবে গুণগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বুঝারও তেমনই সুবিধা হইবে।

প্রত্যেক পরিণামের মূলে আমরা তিনরূপ কারণ দেখিয়াছি; অনভিব্যক্তি, অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি। এই তিন অবস্থায় কারণগুলিকে আমরা তিন প্রকারের শক্তি বলিয়াছি। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যের মতে শক্তি অর্থে কার্য্যের অব্যক্ত অবস্থা বা কারণ ভিন্ন কিছু নহে তত্ত্বকৌমুদী ১৫শ, কা দ্রষ্টব্য)। পরিণামের অন্তর্গত অনভিব্যক্তির মূলীভূত কারণকে বা শক্তিকে আমরা বলিয়াছি তমঃ। ইহার কার্য্য 'নিয়ম' বলার তাৎপর্য্য এই যে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব উভয়কে নিয়ত রাখে অভিব্যক্তিমুখী প্রবৃত্তি (বা ক্রিয়া) এবং অভিব্যক্তিকে ব্যাহত রাখাই অনভিব্যক্তি। কার্য্যের প্রকাশে বা অভিব্যক্তিতে বাধা জন্মাইবার জন্য তমঃ বরণক বা আবরণকারী, ইহাও বলা সঙ্গত। যে শক্তি বা কারণের প্রভাবে বীজে বৃক্ষ অনভিব্যক্ত বা আবৃত অবস্থায় থাকে তাহারই নাম তমঃ। যেমন অভিব্যক্তির কারণরূপ সত্ত্বকে ঢাকিয়া রাখার জন্য তমঃকে আবরণকারী বলা যায়, তেমনি অভিব্যক্তিমুখী প্রবৃত্তিতে বাধা জন্মাইবার জন্য তমঃকে গুরু বলা যায়। ক্রিয়ার বিঘ্নকারক ধর্ম্মের নামই গৌরব বা গুরুত্ব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে পরিণাম বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয় প্রকারই হইতে পারে এবং সাংখ্যমতে বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নাই। তমঃ ও অন্যান্য গুণের ক্রিয়া বাহ্য এবং অভ্যন্তর পরিণামে একই রূপ। বাহ্য দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমরা তমোগুণের আবরণকত্ব ও গুরুত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আভ্যন্তর দৃষ্টান্তেও ইহা খাটিবে। যখন আমরা চিন্তা করিতে চেষ্টা করি তখন যাহা অস্পষ্ট থাকে তাহাকে স্পষ্ট করার চেষ্টাই হয় এবং চিন্তা সফল হইলে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই অস্পষ্ট অবস্থার মূলে তমঃ, ইহাই স্পষ্টতাকে আবৃত করিয়া রাখে এবং স্পষ্টীকরণের জন্য চিন্তার যে চেষ্টা বা প্রবৃত্তি তাহাতেও বাধা জন্মায়, তাই ইহাকে অতিক্রম করার জন্য মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে বাহ্য জগতে যেমন অভিব্যক্তি ও প্রবৃত্তির বাধা আমরা দেখি তেমনি অভ্যন্তর জগতেও উহা অনুভব করি। আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থাকে তমোগুণের কার্য্য বলিয়া বলা হয়। এই সব অবস্থা যেমন বাহ্য কর্ম্মশক্তির পক্ষে বাধক, তেমনি মানসিক চিন্তার পক্ষে বিঘ্নজনক। সেজন্য তমঃকে অজ্ঞানের কারণও বলা যাইতে পারে।

তমোগুণকে বিষাদাত্মক বলার কারণ কি এবং এই গুণের অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে বিষাদের কি সম্পর্ক তাহা এইবার বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। বাংলায় বিষাদের অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দুঃখ। কিন্তু ইহার মৌলিক

অর্থ অবসাদ, অবসন্নতা, মোহ ইত্যাদি ; এবং এইখানে এই অর্থই খাটে। কারণ দুঃখ সাংখ্যের মতে রজোগুণেরই কার্য্য। যে তমোগুণের জন্য ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি ব্যাহত হয় মোহের অবস্থা উহারই কার্য্য বলিয়া ভাবা খুবই সঙ্গত। কারণ মোহের বা অবসাদের অবস্থায় ক্রিয়া ও জ্ঞান দুইই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

রজোগুণের সম্বন্ধে কারিকাতে বলা হইয়াছে, ইহা অপ্রীতি বা দুঃখাত্মক, ইহার ধর্ম্ম উপষ্টম্ভকত্ব ও চলত্ব, ইহা প্রবৃত্তির কারণ। রজঃ প্রবৃত্তি জন্মাইয়া পরিণাম ঘটায় আমরা এই অর্থই পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি। স্থূল জগতে আমরা দুই প্রকার কর্ম্ম হইতে দেখি, কোনও কোনও বস্তু নিজ হইতেই কাজ করে, কোনও বস্তু অপর দ্বারা চালিত হইয়া কাজ করে। নিজে কাজ করা বা অন্য দ্বারা কাজ করান এই দুইই প্রবৃত্তিসাপেক্ষ ; সুতরাং রজোগুণেরই কার্য্য। উপষ্টম্ভ অর্থ কার্য্যে উৎসাহিত বা উদ্যত করা, অর্থাৎ অন্যকে কাজে প্রবৃত্ত করা ; চলত্ব অর্থে নিজে চলা। সুতরাং রজোগুণের এই উভয় ধর্ম্ম কেন উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু প্রবৃত্তি, চলত্ব, উপষ্টম্ভকত্ব ইত্যাদির সঙ্গে দুঃখের সম্পর্ক কি তাহা তত স্পষ্ট নয়। প্রত্যেক পরিণামের একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখিয়াছি। কখনও জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে সেই উদ্দেশ্যের দিকে প্রবৃত্তি হয় এবং যতক্ষণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় চেষ্টা ততক্ষণ পর্য্যন্তই চলে। এই অসিদ্ধ প্রযত্নের অবস্থাই দুঃখ। জ্ঞানপূর্ব্বক আমরা যে চেষ্টা করি তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি দুঃখময় অবস্থা ভোগ করি ইহা অনুভবসিদ্ধ। যতক্ষণ মানুষ তমোগুণে অভিভূত হইয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, অবসন্ন বা মোহগ্রস্ত হইয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করে এবং শারীরিক বা মানসিক কোন চেষ্টাই করে না ততক্ষণ দুঃখও থাকে না। কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা তমঃকে জয় করিবার চেষ্টা যখন আরম্ভ হয় তখনই দুঃখেরও আরম্ভ হয় এবং উহাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া অভিভূত না করা পর্য্যন্ত এই দুঃখ থাকে। অজ্ঞানকৃত প্রবৃত্তিতেও তমের বাধা জয় না করা পর্য্যন্ত দুঃখানুভব হয়। যেমন শ্বাসক্রিয়াতে যদি কোন বাধা উপস্থিত হয় তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা অভিভূত বা দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। তেমনি পরিপাকক্রিয়া যতক্ষণ সফলভাবে চলে স্বস্তি-ভাব থাকে, কিন্তু কোন বাধা উপস্থিত হইলে উহা দূর করার জন্য আন্ত্রিক ক্রিয়া যে পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত না হয়, ততক্ষণ কষ্টই বোধ হয়।

কিন্তু এই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কোন কোন কাজ আছে যাহা করাতেই আনন্দ, কার্য্যসমাপ্তিতে বা ফলপ্রাপ্তিতে নয়। ইংরাজীতে এই প্রকার আনন্দকে pleasure of pursuit অর্থাৎ প্রযত্নজ

আনন্দ বলা হয় এবং pleasure of attainment অর্থাৎ সিদ্ধিজ আনন্দ হইতে ইহার পার্থক্য দেখান হয়।[১] ঘোড়া দৌড়াইয়া যে আনন্দ তাহা শুধু গন্তব্যস্থলে পঁহুছানর জন্য নয়, দৌড়াইবার কালেই এই আনন্দ অনুভূত হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্ত আমাদের কল্পিত সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয় বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু সাংখ্যের পক্ষ হইতে (বিশেষতঃ আমরা এই মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার দিক্ হইতে) বলা যায়, ঘোড়া দৌড়াইবার আনন্দ অনভ্যস্ত লোকে লাভ করিতে পারে না, তাহার পক্ষে উহা উদ্বেগেরই কারণ। পরিপক্ক অশ্বারোহীর পক্ষেই এই আনন্দ সম্ভব। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রতি মুহূর্ত্তে অশ্বারোহী অশ্ব-চালনার জন্য অনবরত যে চেষ্টা করিয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটি চেষ্টার সফলতার জন্যই আনন্দ হয়। যেমন এক ঘণ্টাব্যাপী অশ্বচালনার একটা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে কোন গন্তব্যস্থলে পৌঁছান তেমনি প্রতি মুহূর্ত্তের খণ্ড খণ্ড চেষ্টারও এক একটা উদ্দেশ্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে থাকে—যেমন আসন স্থির রাখা, অশ্বকে ঠিক পথে রাখা, শরীরকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত করা ইত্যাদি। এই বৃহৎ বা খণ্ড চেষ্টার কোন অংশে উদ্দেশ্য সফল না হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সকল হইতে প্রবৃত্তির মূলীভূত রজোগুণকে কেন দুঃখের কারণ বলা হয় তাহা বুঝা যায়। জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক প্রবৃত্তির অবস্থা মাত্রই যে চরিতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখজনক তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।[২] কিন্তু সব দুঃখই অচরিতার্থপ্রবৃত্তি নিমিত্ত কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ একেবারে নিরাস করা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি কেন দুঃখ উৎপাদন করে বলা কঠিন। এই সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণও পরস্পরবিরোধী নানা কারণ কল্পনা করিয়াছেন। কোন মতই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। অনেকের মতে যাহা জীবের জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষার চেষ্টার প্রতিকূল তাহা দুঃখজনক এবং যাহা অনুকূল তাহা সুখজনক। এই মতের সহিত উক্ত সাংখ্যমতের কতকটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু এই মতের প্রতিকূল কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, কোন কোন বিষ বেশ সুস্বাদ, আবার কোন কোন স্বাস্থ্যপ্রদ দ্রব্যও বিস্বাদ লাগে। সকল প্রকার সুখদুঃখের ব্যাখ্যা আধুনিক মতে

১। চলতি বাংলায় এই দুইটিকে চলার (বা করার) আনন্দ ও পাওয়ার আনন্দ বলা যাইতে পারে।

২। বার্গসোঁ বলেন "Every pain, then, must consist in an effort,—an effort which is doomed to be unavailing".—Matter and Memory, ৫৬ পৃঃ।

বা সাংখ্যের অন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যাকার মতে করা দুঃসাধ্য। কিন্তু তথাপি প্রবৃত্তি ও দুঃখের মধ্যে বহুস্থলে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই সব দৃষ্টান্ত হইতেই হয়ত সাংখ্য অন্যান্য স্থলেও অনুরূপ কারণের কল্পনা করিয়া প্রবৃত্তির কারণ রজোগুণকে দুঃখাত্মক বলিয়াছেন।

তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সকল প্রকার দুঃখস্থলেই জীবের শান্তি বা বিশ্রামের অভাব এবং ক্রিয়াশীলতার আধিক্য দেখা যায়। বেদনায় লোক ছট্‌ফট্ করে, এবং তাহা পরিহারের চেষ্টা করে। দুঃখের অবস্থা উদ্বেজক ও চাঞ্চল্যকারক। সুতরাং দুঃখকে প্রবৃত্তিমূলক না বলিয়া প্রবৃত্তিকেই দুঃখমূলক বলিলে বোধ হয় অনেকের সম্মত হইবে। কিন্তু এই মতের বিষয়েও প্রশ্ন হইবে, বৃক্ষ প্রভৃতিতে দুঃখ অনুভূতি আছে কিনা এবং ইহা হইতেই উহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে কি? সবদিক বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, দুঃখ প্রবত্তির কারণ বা প্রবৃত্তি দুঃখের কারণ না বলিয়া উভয়ই এক সাধারণ কারণের কার্য্য বলিলে সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে। এই কারণকেই আমরা রজঃ বলিতে পারি। ফলে আমাদের বলিতে হইবে যাহার দ্বারা প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইতে দুঃখও জন্মে; সেজন্য দুঃখ ও প্রবৃত্তিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যেমন বিদ্যুতের প্রভা ও মেঘের গর্জ্জন-শব্দ উভয়ই একই কারণে ঘটে, তথাপি কোন কোন স্থলে একটি স্পষ্ট অনুভূত হইলেও অপরটি লক্ষিত হয় না, তেমনি প্রবৃত্তি ও দুঃখ একই রজোগুণ হইতে উদ্ভূত, তথাপি সব স্থানে উভয়কেই সমান ভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

এখন সত্ত্বগুণের কথা বিবেচনা করা যাউক। কারিকার মতে সত্ত্ব সুখাত্মক, ইহা প্রকাশক ও লঘু, ইহার কাজ প্রকাশ করা। আমরা পরিণামের অভিব্যক্ত অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণশক্তিকে সত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রকাশ ও অভিব্যক্তির একই অর্থ। কিন্তু বাহ্য ও আভ্যন্তর পরিণামভেদে প্রকাশ বা অভিব্যক্তির কিছু প্রকারভেদ হয়, তাহা আলোচনা করা উচিত। আমরা বলি বীজ হইতে অঙ্কুর প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হয়, আবার বলি জ্ঞানে জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ পায়। সাংখ্যের মতে উভয় প্রকারের প্রকাশই মূলতঃ এক। উভয় স্থলেই সত্ত্বমূলক অভিব্যক্তি বিদ্যমান। কোনও বিষয়ের অজ্ঞান দূর করিবার প্রযত্ন সফল হইলেই তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। সুতরাং এখানেও বলা যাইতে পারে অনভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তির অভিমুখে যে প্রযত্ন তাহাদ্বারাই বিষয়ের জ্ঞান হয়। সুতরাং বীজ হইতে অঙ্কুরের পরিণতি ও অজ্ঞান অবস্থা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি উভয়ই অনভিব্যক্তের অভিব্যক্তি।

প্রবৃত্তির পথে যাহা বাধা জন্মায় তমোগুণের সেই ধর্ম্মকে সাংখ্য গুরুত্ব বলেন। ইহার বিপরীত লঘুত্ব; ইহা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। লঘুত্ব সফল প্রবৃত্তির অনুকূল। যখন আমরা কোন বস্তুকে উপরে উঠাইতে চাই তখন যদি উঠাইবার কাজ সহজ হয় তবে ঐ বস্তুতে লঘুত্ব ধর্ম্ম আরোপ করি, যদি ঐ কাজ কঠিন হয়, তবে উহাতে গুরুত্ব ধর্ম্ম আরোপ করি। ইহা হইতে বুঝা যায় লঘুত্ব ও গুরুত্ব প্রবৃত্তি হইতে অনুমিত ধর্ম্ম। আমরা বাহ্য বস্তুকেই সাধারণতঃ গুরু বা লঘু বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রবৃত্তির অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা বাহ্যের ন্যায় আভ্যন্তর বিষয়েও অনুভূত হয়—যেমন কোনও কল্পনা করা সহজ, আবার কোনও কল্পনা করা কঠিন। সুতরাং আভ্যন্তর স্থলেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে দুই প্রকার ধর্ম্ম আরোপ করা যায়; এই জন্য কল্পনার বা চিন্তার বেলাতেই লাঘব এবং গৌরব শব্দ ব্যবহার করা চলে। বাহ্য ও আভ্যন্তরে যে এই বিষয়ে সাদৃশ্য আমরা অনুভব করি তাহার অপর প্রমাণ এই যে, উভয় স্থলেই আমরা একপ্রকার ভাষা ব্যবহার করি। ইংরেজীতেও আমরা light এবং heavy বিশেষণদ্বয় বাহ্য ও মানসিক অবস্থা উভয়ের বেলাতেই প্রযুক্ত হইতে দেখি। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে এই সম্বন্ধে অবশ্যই কোন সামান্য কারণ আছে। এই সাম্যের মূল কোথায় তাহা সাংখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

অভিব্যক্তি প্রবৃত্তির সফল অবস্থা। কোনও চেষ্টা সফল হইলে সুখ জন্মে; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও কর্ম্মবেগের শান্তি হয়। সুতরাং এই পরিসমাপ্তির অবস্থা যে সুখের অবস্থা তাহাও অনুভবসিদ্ধ। সত্ত্বকে সেইজন্য সুখজনক বলা চলে। জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টা সফল হইলে সুখ অনুভূত হয়। কিন্তু যেখানেই সুখ সেখানেই তাহার পিছনে কোন সফল প্রবৃত্তি আছে কিনা বলা কঠিন। পূর্ব্বেই অমরা দেখিয়াছি এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহতে সুখদুঃখের পশ্চাতে কি সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি বা চেষ্টা আছ স্থূল দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে না। দৃষ্টস্থল হইতে এই সব অদৃষ্টস্থলে প্রবৃত্তির অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। তাহা ছাড়া ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যেখানে সুখ সেখানে প্রচেষ্টারও বিরাম হয়; সুখের অবস্থা যতক্ষণ অক্ষুন্ন থাকে ততক্ষণ নূতন উদ্যম আসে না। সুতরাং প্রকাশ, লাঘব, সুখ প্রভৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সুখের অবস্থায় উদ্যম শান্ত হয় বলিয়াই সত্ত্বকে শান্তির কারণ ও বলা হয়।

গুণগুলির প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, আমাদের কল্পিত ব্যাখ্যা অনুসারে তাহা বুঝিবার কতদূর সুবিধা হয় ইহাই এপর্য্যন্ত দেখা গেল। এখন দেখিতে হইবে, এই ব্যাখ্যা দ্বারা গুণগুলির মধ্যে পরস্পরের যে সম্বন্ধের বর্ণনা আছে তাহা বুঝার সুবিধা হয় কিনা। আমরা পূর্ব্বেই

দেখিয়াছি গুণগুলির মধ্যে (পরমাণুসকলের ন্যায়) সংযোগ সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। কারিকাতে বলা হইয়াছে, গুণগুলি পরস্পরকে অভিভূত করিয়া থাকে, পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পরস্পরকে জন্মায় এবং কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না। প্রথম সম্বন্ধটি বিরোধ-সূচক। তমঃ সত্ত্ব এবং রজঃকে অভিভূত করিয়াই থাকিতে পারে—তেমনি রজঃ তমঃ এবং সত্ত্বকে, ও সত্ত্ব তমঃ ও রজঃকে অভিভূত করিয়া থাকে। আমাদের কল্পিত অর্থ অনুসারে ইহার তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। অনভিব্যক্ত অবস্থা অভিব্যক্তিমুখী প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি এই উভয়কে অভিভূত না করিয়া কিরূপে সম্ভব হইবে? তেমনি প্রবৃত্তি যেমন একদিকে অনভি-ব্যক্তিকে দূর করার চেষ্টা স্বরূপ, অন্যদিকে ইহা অভিব্যক্তির সহিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন; কারণ অভিব্যক্তি হইলে প্রবৃত্তি ক্ষান্ত হয়। অভিব্যক্তি ও যেমন অনভিব্যক্তিকে দূর করে, তেমনি প্রবৃত্তিরও সমাপ্তি ঘটায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যেক পরিণামের তিনটি অবস্থার পিছনে যে তিনটি শক্তি আছে তাহা পরস্পরকে অভিভূত করিয়াই নিজ নিজ কার্য্য করে। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি শক্তি এই ভাবে পরস্পরের বিরোধী। ইহাদের কোনও একটি অন্য দুইটিকে অভিভূত না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, অভিভব অর্থ নাশ নয়। যখন সত্ত্বের বিকাশ হয়, তখন রজঃ ও তমঃ এই দুইটি শক্তি একেবারে নষ্ট হয় না, অভিভূত বা পরাজিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, অভিভবের মাত্রাভেদ বা তারতম্য হইতে পারে। সেজন্য সাত্ত্বিক (বা রাজসিক বা তামসিক) পরিণাম সবই এক প্রকারের নয়। কোনটিতে সত্ত্ব বেশী উদ্রিক্ত, কোনটিতে কম; পক্ষান্তরে অন্য দুইটি গুণ কোনটিতে বেশী অভিভূত, কোনটিতে কিছু কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান-ভিক্ষু গুণগুলির সংখ্যার পার্থক্যদ্বারা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ইত্যাদি পরিণামে গুণের হ্রাসবৃদ্ধির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বীকার না করিয়াও অভিভবের মাত্রার পার্থক্য দ্বারা এই হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করা যাইতে পারে। যদি গুণগুলিকে পরমাণুর ন্যায় সংযোগ-শীল মনে না করিয়া শক্তি বলিয়া মানা যায় তাহা হইলে সংখ্যার পরিবর্ত্তে অভিভবের মাত্রাদ্বারাই উক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

অভিভবের জন্য অভিভবকারী এবং অভিভাব্য উভয়েরই আবশ্যক। সুতরাং গুণগুলি পরস্পরকে আশ্রয় না করিয়াও থাকিতে পারে না। পরিণামের অব্যক্ত অবস্থায় তমঃ সত্ত্বকে ও রজঃকে অভিভূত করে, সুতরাং তমঃ সত্ত্ব ও রজঃ ছাড়া কাজ করিতে পারে না।

তেমনি প্রবৃত্তির অবস্থায় রজঃ তমঃ ও সত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, উহাদিগকে অভিভূত করিয়া কার্য্য করে এবং অভিব্যক্তির অবস্থায় সত্ত্ব অপর দুই গুণকে আশ্রয় ও অভিভূত করিয়া কার্য্য করে।

এই স্থলে একটি শঙ্কা হইতে পারে। পরিণামের অবস্থা তিনটির মূলীভূত শক্তি তিনটিকে, আমরা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব নাম দিয়াছি। অবস্থাগুলি কি ক্রমিক নহে? অনভিব্যক্তি, প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি এই গুলি কি পর পর আসে না? তাহা হইলে গুণত্রয়ের যুগপৎ একত্র অবস্থান কি করিয়া সম্ভব এবং যুগপৎ না থাকিলে ইহারা পরস্পরকে আশ্রয়ই বা কিরূপে করিতে পারে? এই শঙ্কার সমাধানের জন্য উল্লেখ করা আবশ্যক যে আমরা প্রকৃতির পরিণামের উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া পূর্ব্বে দেখিয়াছি সাধারণতঃ যে সব দ্রব্যকে আমরা এক বলিয়া ভাবি তাহা বস্তুতঃ বহু ক্ষুদ্র ক্ষণিক পরিণামের সমষ্টি এবং প্রবাহ। এই ক্ষুদ্রতম পরিণামের বিশ্লেষণ করিয়াই তিনটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ পরিণাম ক্ষণিক বলিয়া তাহার ভিতরে আবার ক্ষণভেদ বা পূর্ব্ব-পশ্চাৎ ভেদ করা যায় না। সুতরাং পরিণামের যে তিনটি অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ক্রমিক সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না; সবগুলিই সেই ক্ষুদ্রতম ক্ষণ-স্থায়ী সুতরাং যুগপৎ সেই পরিণামটিতে বর্ত্তমান। পরিণামের তিনটি অবস্থা বলাতে হয়ত কালের ধারণা আসিয়া পড়ে। পরিণামের তিনটি অবস্থা না বলিয়া তিনটি দিক্ বলিলে বোধ হয় সেই ধারণা হইবে না; তবে মনে রাখিতে হইবে এই তিনটি দিকের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দেশগত পার্থক্যও নয়। পরিণামের ধারণা হয় প্রথমতঃ অনুভূতিতে। আমরা যখন একটি ক্ষুদ্রতম ক্ষণ-স্থায়ী বর্ণ, গন্ধ, রস বা এই প্রকার প্রকৃতির কোন পরিণাম অনুভব করি, সেই ক্ষণিক অনুভবের অভ্যন্তরে কোন কালগত বা দেশগত ভেদ অনুভব করি না। তখন বিষয়টি যুগপৎ অনুভূত হয়। কিন্তু যখন পরে সেই অনুভূত বিষয়ের উপাদানের সন্ধান করি তখন বুঝিবার সুবিধার জন্য (বহুক্ষণ দেশব্যাপী ঘটপটাদি সাধারণ দ্রব্যের দৃষ্টান্তে) এই অখণ্ড অনুভূতিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া সাজাইতে চাই। এই কল্পনার সাহায্যেই আমরা ক্ষুদ্রতম পরিণামকেও অবস্থাত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছি; যদিও বস্তুতঃ ইহা এক ও অখণ্ড পরিণামরূপেই অনুভূত হয়। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সাংখ্যদর্শনের একটা বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাংখ্যের সৃষ্টিপ্রক্রমে কারিকাতে দিক্ ও কালের কোনই উল্লেখ নাই। সাংখ্য-সূত্রে বলা হইয়াছে ইহাদের উৎপত্তি আকাশ হইতে। যদি তাহাই হয় তবে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, উহা হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি পরপর যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে কালিকক্রমে সংঘটিত মনে হইলেও

বস্তুতঃ সেইরূপ হইতে পারে না। অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের সৃষ্টিতে দেশ কালের স্থান নাই। মহাভুতের সৃষ্টির পর তাহাদের সংযোগ-বিভাগে যে ভৌতিক জগৎ গঠিত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহাতেই দেশ ও কালের স্থান। সাংখ্যের এই মত সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনার অবকাশ যথেষ্ট আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার অবসর নাই।

কারিকামতে গুণত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত অপর একটি সম্বন্ধ এই যে উহারা পরস্পরকে জন্মায়। এখানে জন্মান অর্থ কি? তিন প্রকার পৃথক ও বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে তাহাদের কারণস্বরূপ তিনটি ভিন্ন গুণের অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং গুণগুলি বিভিন্ন জাতীয় শক্তি এবং একটি হইতে অন্যটীর জন্ম স্বীকার করা যায় না। সেজন্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 'জনন' অর্থ এখানে অন্যগুণকে নিজ নিজ রূপে অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্যে পরিণত হওয়ার সাহায্য করা। তাহা হইলে বলিতে হইবে সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে নিজ নিজ কার্য্যোৎপাদনে প্রযুক্ত করে এবং রজোগুণও সত্ত্ব ও তমঃকে কার্য্যে প্রযোজিত করে, তেমনি তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃকে প্রযোজিত করে। ইহার অর্থ এই যে গুণগুলির কার্য্য পৃথক প্রকারের হইলেও ইহাদের কোন একটীর অস্তিত্ব ও কার্য্য অপর দুইটী ভিন্ন কল্পনা করা যায় না।

ইহাই আরও স্পষ্ট করার জন্য উক্ত কারিকাতে বলা হইয়াছে, গুণগুলি একত্র মিথুনভাবে অর্থাৎ অবিনাভাবী সহচররূপে অবস্থান করে। অনভিব্যক্তি ব্যতীত প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি কল্পনা করা যায় না, তেমনি প্রবৃত্তি ব্যতীত অনভিব্যক্তি এবং অভিব্যক্তি বুঝা যায় না, এবং অভিব্যক্তি ভিন্ন অনভিব্যক্তি ও প্রবৃত্তির অর্থ হয় না। ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ এবং অবিচ্ছেদ্য।

গুণত্রয়কে প্রকৃতির অবয়ব স্বীকার না করিয়া এবং ইহাদের মধ্যে সংযোগ-বিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধ কল্পনা না করিয়া কিরূপে ইহাদের সম্পর্ক কল্পনা করা যায় তাহা কারিকানুসারে দেখাইবার চেষ্টা করা হইল। দেশ ও কাল যাহার পরিণাম তাহা স্বয়ং দেশ ও কালের সাহায্য ছাড়াও বিদ্যমান। অবয়ব, সংযোগ ও ক্রমিক পরিবর্ত্তন ইত্যাদি দেশকাল ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং ইহাদের সাহায্য ব্যতীতই এখানে গুণত্রয়ের সম্পর্ক কল্পনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্যই ইহাদিগকে তিনটী শক্তিরূপে কল্পনা করার প্রয়োজন হইয়াছে।

গুণগুলি সুখ, দুঃখ, মোহের কারণ ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। কারিকানুসারে সত্ত্ব সুখাত্মক বা সুখস্বরূপ, শুধু সুখের কারণই নয়। তেমনি রজঃ দুঃখস্বরূপ এবং তমঃ মোহস্বরূপ। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যমতে কার্য্য কারণে অব্যক্ত-ভাবে থাকে। সুখ যাহার কার্য্য তাহাতেও সুখ আছে। দুঃখ ও মোহের বেলাতেও সেইরূপ। সুতরাং সুখের কারণকে সুখাত্মক বলাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে, সত্ত্বাদির প্রকাশ প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যও ত আছে, তবে উহাদিগকে প্রকাশাত্মক ইত্যাদি না বলিয়া সুখাত্মক ইত্যাদি বলার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাংখ্য জগৎকে প্রধানতঃ ভোগের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; বিষয় সমূহ সাংখ্যের মতে পুরুষের ভোগ্যবস্তুরূপেই সৃষ্ট। ভোগ্যরূপে বিষয়ের বিচার করিলে বিষয়ের সুখ-দুঃখ-মোহ জন্মাইবার কথাই প্রথমে উঠে। সেই জন্যই ইহাদের উপর সাংখ্য বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন হইতে পারে—চেতন জ্ঞাতা বা ভোক্তার অন্তঃকরণেই, এবং বিষয়ের সংস্পর্শেই, সুখ, দুঃখ, মোহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ বিষয়ে সুখাদির অস্তিত্ব কল্পনা করা কিরূপে সঙ্গত হয়? পুষ্প কোন জ্ঞাতৃ-বিশেষের অন্তঃকরণেই সুখাকার বৃত্তি উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু পুষ্পকে সুখস্বরূপ বলা যায় কিরূপে? এই শঙ্কা দূর করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সাংখ্যের মতে প্রকৃতির সকল পরিণামই পুরুষের সম্পর্কে ঘটে এবং পুরুষের সংস্পৃষ্ট অন্তঃকরণের পরিণামের ভিতর দিয়াই উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানও হয়। সুতরাং কোন বিষয় বা পরিণামই সাংখ্যমতে জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ নয়। আমরা যখন যে রঙ্ দেখি তাহা সূর্য্যের আলোকের সম্পর্কেই সম্ভব হয়, কিন্তু এই সম্পর্ক সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া ইহা আমরা উল্লেখ করি না। আমরা বলি চূণ লাগাইলেই দেওয়াল সাদা হয়, আলোক থাকিলেই সাদা হয় ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি; এবং সাধারণ কারণকে ত্যাগ করিয়া অসাধারণ কারণ চূণেরই উল্লেখ করি। সেইরূপ জ্ঞাতার সম্পর্কেই পুষ্প সুখ দেয় ইহা জানিলেও সাংখ্য সাধারণ কারণরূপ জ্ঞাতৃ-সম্পর্ক উল্লেখ না করিয়া অসাধারণ কারণ পুষ্পকেই সুখের কারণরূপে উল্লেখ করেন; এবং সৎকার্য্যবাদ অবলম্বন করিয়া সুখহেতুকে ও সুখাত্মক বলিয়া বিবেচনা করেন। সুতরাং এই যুক্তিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে যথাক্রমে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলা কিছুই অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ প্রচলিত ভাষাতেও আমরা 'চাকুরী দুঃখেরই কারণ, সুখের কারণ নহে' ইহা বলিতে গিয়া কখনও কখনও 'চাকুরীতে দুঃখই, সুখ নাই', এইরূপ বলিয়া থাকি।

ত্রিগুণের যে ব্যাখ্যা আমরা এখানে করার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে দুই তিনটি আপত্তি সংক্ষেপে বিবেচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা উপরে বলিয়াছি সাংখ্যমতে বিষয়ের পরিণাম জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ নহে, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম সাংখ্যমত বিজ্ঞানবাদ হইতে স্বতন্ত্র। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উক্তি বিরুদ্ধ মনে হইতে পারে। সেজন্য কি হিসাবে বিষয় জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্র এবং কি হিসাবে উহা জ্ঞাতৃসাপেক্ষ তাহা পরিস্কার করিয়া বলা উচিত। বিজ্ঞানবাদ-মতে বিজ্ঞানই বিষয়ের উপাদান, কিন্তু সাংখ্য মতে বিষয়ের উপাদান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। প্রকৃতির অস্তিত্ব জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ; কিন্তু প্রকৃতির বিষয়াকারে অভিব্যক্তি বা পরিণাম জ্ঞাতৃসাপেক্ষ। বদ্ধ পুরুষের ভোগবাসনার প্রেরণাতেই প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পরিণত হয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্যমতে পুরুষ বহু এবং তাহাদের বাসনাও বিভিন্ন, তাহা হইলে প্রকৃতি কিরূপে এক সামান্য জগৎ রূপে পরিণত হইতে পারে? ব্যক্ত জগৎ যে বহু দ্রষ্টার দ্বারা দৃশ্য, সুতরাং সামান্য তাহা কারিকাতে স্বীকৃত হইয়াছে। আবার কোনও পুরুষ মুক্ত হইলে প্রকৃতি তাহার লীলা সংহার করে, এ কথাও বলা আছে। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃত অভিপ্রায় কি বুঝা বড়ই কঠিন। সাংখ্য কতটুকু বিষয়-স্বাতন্ত্র্যবাদী (realistic) তাহা নির্ণয় করা বিশেষ গবেষণা-সাপেক্ষ। আমরা সংক্ষেপে এখানে এই সমস্যার আংশিক বিচার করিয়া একটা স্থূল সমাধানের চেষ্টা করিব। সবদিক্ হইতে বিচার করিয়া উহা কতটুকু গ্রহণীয় হইবে বলিতে পারি না।

প্রত্যেক পুরুষের জন্য সৃষ্ট জগৎ যদি সম্পূর্ণ পৃথক হইত তবে ভাষা-দ্বারা ভাবের আদান প্রদান করা এবং কোনও সম্মিলিত চেষ্টা করা সম্ভব-পর হইত না। আবার প্রত্যেক পুরুষই ঠিক একই জগৎ প্রত্যক্ষ করে ইহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধে এত দৃষ্টিভেদ ও অনুভূতিভেদ হইত না। সুতরাং জগৎ কিয়দংশে এক এবং কিয়দংশে পৃথক্ মানিতেই হইবে। আবার যদি পুরুষের বাসনাতেই প্রকৃতির সৃষ্টিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তবে ইহাও মানিতে হইবে যে বহুপুরুষের বাসনার মধ্যেও অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, যাহার দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রকৃতি কিয়দংশে এক সাধারণরূপে পরিণত হয়। ইহাই সামান্য জগৎ। আবার সে যে অংশে বাসনার পার্থক্য, বাসনার সেই সেই অংশের প্রেরণায় এই সামান্য জগৎ প্রত্যেক পুরুষের জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই কল্পনা অনেকটা স্পষ্ট হইতে পারে। বহুলোকের সদৃশ প্রবৃত্তি বা বাসনার বলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হয় এবং সদৃশ প্রবৃত্তি ও সদৃশ অধ্যয়নাদি রূপ পূর্ব্বকর্ম্মের ফলে নানা দেশ হইতে

বিভিন্ন ছাত্র ইহাতে অধ্যয়নের জন্য সমবেত হয়। কিন্তু সবের পক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কিয়দংশে এক, তেমনি কিয়দংশে স্বতন্ত্রও। পূর্ব্ব কর্ম্ম ও গুণানুসারে কাহারও নিকট ইহা জ্ঞান, সুখ, সম্মান, সমৃদ্ধির আকর বলিয়া প্রতিভাত হয়, কাহারও নিকট ইহা জটিলতা, বিভীষিকা, দুঃখ, দুশ্চিন্তারই কারণ। এই পার্থক্যর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র এক এক প্রকারের হয়। যে অংশে বহুলোকের প্রবৃত্তি সদৃশ, সেই অংশের ফলে এক সমানাকার বুদ্ধি তাহাদের মনে উদিত হয়; তাহা হইতে এক সামান্য চেষ্টা আসে ও সামান্য কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই সামান্যবুদ্ধিই সমষ্টিবুদ্ধি। ইহাই সামান্য জগৎ সৃষ্টির কারণ। যে অংশে প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রকৃতি বিভিন্ন বুদ্ধিতে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে পৃথক্ পৃথক্ বিষয় সমূহের সৃষ্টি হয়।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তানুসারে এক জীব মুক্ত হইয়া গেলেও অন্য জীবদের সদৃশ বাসনাদ্বারা সৃষ্ট সদৃশ জগৎ তাহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইবে। একজন ছাত্রের অধ্যয়নপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেও অন্যদের অপূর্ণ বাসনা পরিপূর্ণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু যদি সকলের বাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আর থাকিতে পারে না; সেইরূপ সকল জীবের বাসনার উচ্ছেদ হইলে দৃশ্যমান জগৎও প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়।

এই আলোচনা হইতে মনে হইবে যে সাংখ্যমতে প্রত্যেক জীবের কর্ম্মবশে প্রকৃতি বিভিন্ন জগৎরূপে পরিণত হইলেও কর্ম্মের সাদৃশ্যবশতঃ এই সব জগৎ সদৃশ কিন্তু সম্পূর্ণ এক নয়। পিপীলিকার নিকট প্রতীয়-মান জগৎ মনুষ্যের নিকট প্রতীয়মান জগৎ হইতে অনেক স্বতন্ত্র; সেইরূপ শিশুর জগৎ হইতে বৃদ্ধের জগৎ স্বতন্ত্র এবং বৈরাগীর জগৎ হইতে কামুকের জগৎও স্বতন্ত্র।

এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্ববর্ণিত সাংখ্যের বিষয় প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ারই অনুযায়ী। কারণ পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়সাহায্যে জীবের অন্তঃকরণ যে রূপে পরিণত হয়, বিষয় সেইরূপেই তাহার নিকট প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের পার্থক্যবশতঃ প্রত্যক্ষ বিষয়ের রূপেরও পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং যাহা আমার নিকট সুখরূপে প্রতিভাত অন্যের নিকট তাহা দুঃখরূপে প্রত্যক্ষ হওয়া বিচিত্র নহে।

আমাদের কল্পিত গুণত্রয়ের ব্যাখ্যানুসারে প্রলয় ও সৃষ্টির অর্থ কি, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে। প্রলয়কালে জগৎ অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যানুসারে তখন শুধু তমঃ গুণেরই অস্তিত্ব থাকা উচিত। তখন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা কিরূপে স্বীকার করা যায়? আবার সৃষ্টির অবস্থা অভিব্যক্তিরই অবস্থা, তাহাতে শুধু সত্ত্বেরই

অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত, তাহাতে ত্রিগুণের কল্পনা কিরূপে হইতে পারে ? এই প্রকার সন্দেহের উত্তরে বলা দরকার যে, কোন একটি অবস্থাকেই নিরপেক্ষভাবে অভিব্যক্ত বা অনভিব্যক্ত বলা যাইতে পারে না। বীজ অতীত বৃক্ষের অভিব্যক্তাবস্থা, কিন্তু ভাবী বৃক্ষের অনভিব্যক্তাবস্থা। সুতরাং এক দিক হইতে যেমন ইহা সত্ত্বেরই কার্য্য, অন্য দিক হইতে তমের কার্য্য। আবার বীজের মধ্যে যে ভাবীবৃক্ষ সৃষ্টির দিকে উন্মুখতা আছে সেইজন্য উহাতে রজোগুণের অস্তিত্বও স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রলয়ের বা সৃষ্টির অবস্থাকেও এইরূপে বিভিন্ন দিক দিয়া বিচার করিলে তিনটি গুণের অর্থাৎ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন মনে হইবে। সৃষ্টিকালের কোন তামসিক পরিণাম হইতে প্রলয়কালের অবস্থার পার্থক্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে সৃষ্টি কালে অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই রহিয়াছে এবং অল্পাধিক মাত্রায় উহা সফলও হইতেছে। যদি অসফলতার মাত্রাই অধিক হয় তবে সেই পরিণামটি তামসিকরূপে (অজ্ঞানরূপে, গুরুরূপে বা মোহরূপে) অনুভূত হয়। কিন্তু প্রলয়কালে অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি শুধু ব্যাহত নহে, ব্যাবৃত্ত বা অন্তঃসংহৃত। সেজন্য গুণগুলির পরস্পরকে অভিভূত করার প্রশ্নই নাই, এবং কোনও একটি গুণের আধিক্যের সম্ভাবনাও নাই। তাই ইহার নাম সাম্যাবস্থা।

সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব অতি গভীর, অথচ উহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। সেইজন্য এই শাস্ত্রের পঠন-পাঠন আবৃত্তি দ্বারা সম্পন্ন করার রীতিই সমধিক প্রচলিত। যাঁহারা তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পদে পদে নিজ নিজ কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। এইজন্য বাচস্পতি মিশ্রের একরকম ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা তাহার বিপরীত। সাধারণ বহির্ম্মুখ পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তার ধারায় যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহাদের নিকট সাংখ্য প্রথমতঃ বড়ই অদ্ভুত ও যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকের মধ্যেও প্রাচীনকালে এবং বর্ত্তমান যুগে এমন কয়েকজন সূক্ষ্মদর্শী মনীষী ছিলেন ও আছেন যাঁহাদের চিন্তার ধারা বিভিন্ন বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার সাহায্য করে। আভ্যন্তর, অবিভক্ত প্রবৃত্তির উন্মেষে বাহ্য, বিভক্ত জগতের সৃষ্টি বুঝিবার পক্ষে ও সাংখ্যের অন্য কয়েকটি তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে বার্গসোঁর দর্শন হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। জীববিদ্যাবিশারদ বার্গসোঁর মতে কর্ম্মার্থক চিন্তার প্রবৃত্তি হইতেই মস্তিষ্কের উৎপত্তি, মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার উৎপত্তি নয়। এই মত অহঙ্কাররূপে পরিণত বুদ্ধি হইতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উৎপত্তির কথাই প্রকারান্তরে সমর্থন করে। আবার সাংখ্যের গুণত্রয়ের সঙ্গে বার্গসোঁর torpor, instinct, intelligence এই ত্রিধা বিভাগের

অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আধুনিক প্রবীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হুয়াইট্‌হেডের দর্শনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁহারা দেখিতে পাইবেন সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার মতের কত সাদৃশ্য! জগৎকে পরিণামের সমষ্টি এবং প্রবাহরূপে কল্পনা, প্রত্যেকটি পরিণামের জ্ঞাতৃ-সাপেক্ষতা ও প্রয়োজনসাধকতা, অবিভক্ত হইতে বিভক্তের সৃষ্টি ইত্যাদি বহু বিষয়ে উভয় দর্শনের আশ্চর্য্য মিল। অধিকন্তু দেশ-কালাতীত সৃষ্টি-শক্তি হইতে দেশকালময় জগতের উৎপত্তি উভয় দর্শনেরই অভিমত। কাল ছাড়া সৃষ্টির ক্রম কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে—সাংখ্য এই এই সম্বন্ধে প্রায় নীরব। হুয়াইট্‌হেড্ এই বিষয়ে তাঁহার Process And Reality গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেকটি পরিণামের অনুভূতি প্রথমতঃ দেশকাল সম্পর্কবর্জ্জিত এক ও অখণ্ডরূপেই জন্মে। তাহাকে খণ্ডিত করিয়া আমরা বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করি এবং পাশাপাশি বা পরপর সাজাই। অনুভূতির দিক দিয়া যাহা কালহীন তাহাকেই বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে কালগ্রস্ত মনে হয়। যাহা এক তাহাই খণ্ডিত হইয়া ক্রমিক ভাবে দেখা দেয়। কালের উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে ষোড়শগণের সৃষ্টি আমরা যদি এইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে কেমন দাঁড়ায় বিবেচনীয়। আমাদের তবে ভাবিতে হইবে যে যদিও বাহ্য দিক্ হইতে বর্ণনা করিতে গেলে আমাদিগকে এই সৃষ্টি পরপর বা ক্রমে হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয়, তথাপি বস্তুতঃ প্রকৃতি হইতে ষোড়শগণ পর্য্যন্ত সৃষ্টি একই অনুভূতক্ষণে হইয়া যায়। এক দিক হইতে যাহা অখণ্ডক্ষণ, অন্যদিক হইতে তাহাই বহু ক্রমিক ক্ষণাংশে গঠিত কালের ধারা। আমাদের দেশে এই তত্ত্ব নূতন নয়। পৌরাণিক কাহিনীতে ইহা সুপ্রচলিত—যদিও ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। পৌরাণিকরা বলিয়াছেন, ব্রহ্মার নিমেষই মানুষের দৃষ্টিতে বহুসহস্রবর্ষ-ব্যাপী এক সর্গ-কাল। আমাদের দৃষ্টিতে যাহা ক্রমিক, ব্রহ্মার দৃষ্টিতে তাহা যুগপৎ বর্ত্তমান। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনে ঈশ্বরের গুণের মধ্যে স্মৃতি বা সংস্কারের উল্লেখ নাই। ইহার তাৎপর্য্যও একই। আমাদের নিকট যাহা ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমানরূপে প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরের নিকট তাহা এক অখণ্ড প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়। একদিক হইতে যাহা ক্ষণমাত্র, অন্যদিক হইতে তাহারই গর্ভে এক যুগ নিহিত।[১] আমাদের দৈনন্দিন অনুভূতির মধ্যেও এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। অন্নদাতাকে মৃত্যুশয্যায় দেখিবা-

১। হুয়াইট্‌হেডের Epochal Theory Of Time অনুসারেও এক একটী বর্ত্তমান ক্ষণ এক একটি যুগ বা epoch.

মাত্র বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। একক্ষণে যাহা ঘটিল বা অনুভূত হইল, তাহা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলে তিনি কি ছিলেন, এখন কি অবস্থায় আছেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ ফল কি, এই তিনকালের চিন্তা আসিয়া পড়ে।

সাংখ্যদর্শনের নিগূঢ় সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে বার্গসেঁা, হুয়াট্‌হেড্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তার ধারা কোন কোন বিষয়ে সহায় হইতে পারে ইহাই সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু এই সকল দর্শন বা আমাদের বৌদ্ধ দর্শন হইতে সাংখ্যের একটা বড় প্রভেদ স্মরণ রাখাও প্রয়োজন। সাংখ্য বিষয়-জগতে নিত্য পরিণামশীলতা মানিলেও সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী আত্মা বা পুরুষের পরিণামাতীত অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সকল পরিবর্ত্তন বা পরিণাম যঁাহার উদ্দেশ্যে ঘটে, তিনি পরিণামের দ্রষ্টা বা ভোক্তা, সুতরাং পরিণাম হইতে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসিদ্ধ। ইহা স্বীকার না করিলে সাংখ্যের মত সর্ব্বাংশে ক্ষণিকবাদেই পরিণত হইত। বার্গসেঁা ও হুয়াইট্‌হেড্ অপরিণামী জ্ঞাতার অস্তিত্ব মানেন না।

প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে সাংখ্যের গুণত্রয়ের ও সৃষ্টিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করা হইল, তাহা সাংখ্যকারিকার ভিত্তিতেই কল্পিত। অন্যান্য অনেক দিক্ হইতে ইহার দোষগুণ বিচার করা আবশ্যক। সুতরাং বর্ত্তমান কল্পনাকে সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করিতে বলিতে পারি না। যঁাহাদের এই সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, তাঁহাদিগকে এই ব্যাখ্যা কতটুকু যুক্তি-সঙ্গত এবং ইহাতে কি বিষয়ে আপত্তি বা অনুপপত্তি সম্ভব বিচার করিয়া দেখিতে বলি। ভবিষ্যতে 'দর্শনে' ইহার আরও আলোচনা বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় সংস্কারও চিন্তার ধারার উপর 'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ' এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে উহার অর্থনির্ণয়ের চেষ্টা বর্ত্তমান ভারতীয় দার্শনিকদের পক্ষে একটা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

শঙ্কর-বেদান্তে ব্রহ্ম ও জগৎ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, এম, এ।

এই বিশ্বের উৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া, নাম-রূপাদির অভিব্যক্তির বিবরণ দিতে গিয়া, ভাষ্যকার যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা 'সামান্য' ও 'বিশেষ'—এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই সামান্যগুলি অনেক প্রকার এবং ইহারা ক্রমোর্দ্ধভাবে এক প্রজ্ঞান-ঘন 'মহাসামান্যের' অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যেটী যাহার অন্তর্ভুক্ত, সেটী উহার ব্যাপক বলিয়া, উহা হইতে অধিক—উহা হইতে অন্য; কেন না নিজেই নিজকে ব্যাপিয়া রাখা যায় না। পাঠক-পাঠিকার বুঝিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া আমরা এ স্থলে ভাষ্যকারের সমগ্র মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সামান্য-বিশেষবানর্থো নাম-ব্যাকরণবাক্যে বিবক্ষিতঃ। অনেকে হি বিলক্ষণাশ্চেতনাচেতনরূপাঃ সামান্য-বিশেষাঃ —তেষাং পারম্পর্য্যগত্যা একস্মিন্ মহাসামান্যে অন্তর্ভাবঃ প্রজ্ঞান-ঘনে।" (বৃঃ ভাঃ, ২-৪-৯)। "যৎ যস্য অন্তর্ভবতি, তদ্ব্যাপকত্বাৎ ততোঽন্যঃ", "ন হি তেনৈব তদ্ব্যাপ্যতে।"

আমরা এই যে 'সামান্য' ও 'বিশেষ' - এই শব্দ দুইটী পাইতেছি, এই দুইটীই বেদান্তের পারিভাষিক শব্দ। কারণদ্রব্যকে সামান্য বলা হয়, এবং সেই কারণ হইতে যে বিকার বা কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিশেষ বলা হয়।

"'সামান্যং' 'স্বরূপ' শব্দেন পরিভাষিতম্। স্বরূপপরিভাষা চ স্থিরতামাত্রেণ।"

শঙ্কর বলিয়াছেন—

"স্থিরস্বভাবানাং...কারণভাবদর্শনাৎ।"

দ্রব্যমাত্রেরই একটী স্বরূপ বা স্বভাব (nature, character) আছে, এবং এই স্বরূপটী স্থির, নিত্য। কারণ বস্তু মাত্রেরই একটী স্থির স্বভাব আছে এবং ইহাই আপনি স্থির থাকিয়া, উহা হইতে উৎপন্ন বিকার-গুলির মধ্যে—কার্য্যবর্গের মধ্যে—অনুগত হইয়া থাকে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহে।

"বিশেষা হি আগমাপায়িতয়া ন দ্রব্যস্য স্বরূপাণি।"

"বিশেষস্তু বিক্রিয়া।"

'বিশেষ'শব্দটী বেদান্তে কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যবর্গকে বুঝায়। সামান্য হইতেই বিশেষ উৎপন্ন হয় এবং সামান্যই আপন স্বরূপ দ্বারা বিশেষগুলিকে ধরিয়া রাখে।

"সামান্যাৎ হি বিশেষা উৎপদ্যন্তে। সামান্যমাত্মস্বরূপপ্রদানেন বিশেষান্ বিভর্ত্তি।"

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য 'কার্য্য' কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-রহিত যে 'সামান্য' বা কারণ-দ্রব্য, উহা যখন কোন বিশেষ অবস্থান্তর গ্রহণ করে, তাহাকেই উহার 'কার্য্য' বলা যায়।

"অপাস্তবিশেষং সামান্যং বিশেষবদবস্থান্তরমাপদ্যমানং কার্য্যসংজ্ঞাং লভতে।"

সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ গুণ, ধর্ম্ম, নাম-রূপাদি বর্জ্জিত বলিয়া, এখনও উহাতে নাম-রূপাদি, বিশিষ্ট গুণ, ধর্ম্ম প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয় নাই বলিয়া, উহাকে 'নির্ব্বিশেষ সামান্য' বলা হয়। বট-বীজের মধ্যে যেমন, পরে উৎপন্ন পত্র-শাখাদি, বীজরূপে, শক্তিরূপে নিদ্রিত থাকে ('বট-কণিকায়ামিব বটবীজশক্তিঃ'), ঠিক সেইরূপ কারণবস্তুটীর মধ্যে গুণ-ধর্ম্ম-ক্রিয়া প্রভৃতি নিদ্রিত থাকে, বিলীন থাকে বলিয়াই, উহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। এই নির্ব্বিশেষ কারণ দ্রব্যই পরে বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়া কার্য্যরূপে দেখা দেয়। পরম-কারণ ব্রহ্মকেও এইজন্য নির্ব্বিশেষ মহাসামান্য বলা হইয়াছে।

"সামান্যং হি ব্রহ্ম। অপোঢ়সর্ব্ববিশেষত্বাৎ সর্ব্বসামান্যাচ্চ ব্রহ্মণঃ।"

কারণ দ্রব্যটীকে কেন 'নির্ব্বিশেষ' বলা হয়, তাহা আমরা বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহা নির্ব্বিশেষ হইলেও, নিঃস্বরূপ নহে। কারণ বস্তু মাত্রেরই একটী করিয়া স্বরূপ বা স্বভাব আছে। এ কথা ভাষ্যকার আমাদিগকে নানাস্থানে, নানা ভাবে বলিয়া দিয়াছেন।

"যে পদার্থের যে স্বরূপ বা স্বভাব প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, সেই পদার্থের সেই স্বভাব, দেশ-কাল বা অবস্থার পরিবর্ত্তনেও, তাহা ত্যাগ করে না।"[১]

১। যদ্ধর্ম্মকোঃ যঃ পদার্থঃ প্রমাণেন অবগতো ভবতি, স দেশকালাবস্থান্তরেষ্বপি তদ্ধর্ম্মক এব ভবতি (বৃঃ ভাঃ, ২।১।২০)।

"দ্রব্যের যেটী স্বভাব, তাহা স্বাভাবিক...সেই স্বভাব কখনই দেশ বা কালাদির পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না।"[২]

"কোন পদার্থই দেশান্তরে বা কালান্তরে নিজ নিজ স্বভাবকে পরিত্যাগ করে না।"[৩]

"যাহার যেটী স্বভাব, তাহার অন্যথাভাব হয় না।"[৪]

"পদার্থদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নাই, একথা কখনই বলা যায় না; এবং এই স্বভাবটী নিত্য।'[৫] ভাষ্যকার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে,—

"সাংখ্যেরাই কারণ-দ্রব্যের অন্যথাভাব বা অবস্থান্তর স্বীকার করিয়া বলেন যে, কারণ দ্রব্যটাই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্যাকার ধারণ করে। আমরা একথা স্বীকার করি না। আমরা বলি যে, কার্য্যাকার ধারণ করিলেও, কারণ দ্রব্যটী আপনার নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে ত্যাগ করে না; উহা আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়াই, কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট যায়।"[৬]

এই প্রকারে, ভাষ্যকার পরমকারণ ব্রহ্মেরও নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বা স্বভাব স্বীকার করিয়াছেন।

"ব্রহ্মণঃ সত্তালক্ষণঃ 'স্বভাবঃ' আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমানো দৃষ্টঃ।"

কারণ দ্রব্যের স্বভাব বা স্বরূপ আছে,—ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, উহা সৎ, উহা ভাবাত্মক (positive); স্বভাবটী অসৎ বা অভাবাত্মক (negative) হইতে পারে না। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেদান্তের নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মকে characterless nothing—without consciousness, without activity—void—বলিয়া জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। তজ্জন্যই এস্থলে ভাষ্যকারের মত বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

কারণবস্তুর যে স্বরূপ বা স্বভাবের কথা বলা হইল, উহা যে অসৎ বা অভাবাত্মক— Nothing নহে, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার তিন প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। তাহা এইরূপ :—

২। স্বাভাবিকী দ্রব্যস্বভাবত এব সিদ্ধা ..সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে বা (মাঃ কাঃ ভাঃ ৪।৯)।

৩। ন পুনঃ পদার্থাঃ দেশান্তরে কালান্তরে বা স্বং স্বভাবং জহতি (কেঃ, ভঃ, ৩।১২)।

৪। যা প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ তস্যা অন্যথাভাবো নাস্তি (মাঃ কাঃ ভাঃ)।

৫। ন চ স্বাভাবিকো ধর্মঃ নাস্তি পদার্থানামিতি শক্যং বক্তুং, ন চ স্বভাবাৎ অন্যং নিত্যং কল্পয়িতুং শক্যম্ (বৃঃ ভাঃ, ৪।৪।৬)।

৬। ...সাংখ্যাদিভি র্বাদিভিঃ তস্য (স্বভাবস্য) অন্যথাভাবঃ কল্প্যতে—কারণমেব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে ইতি (মাঃ কাঃ ভাঃ ৪।১০।১১)।

(১) একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, যাহা নির্ব্বিশেষ, যাহার কোন প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম, গুণাদি নাই, তাহাকে কিরূপে গ্রহণ করিব ? কোন্ চিহ্ন দ্বারা তাহার পরিচয় পাইব ? সুতরাং এরূপ কিছুর অস্তিত্ব—সত্তা-সিদ্ধ হইবে কিরূপে ? এ আশঙ্কার উত্তর এই যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-চৈতন্যকে যখন (শ্রুতিতে) এই জগতের 'কারণ' বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, সেই কারণের একটা স্বরূপ বা স্বভাব আছে। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি। এই জগৎরূপ 'কার্য্যই' তাঁহার পরিচায়ক চিহ্ন। এই কার্য্যদ্বারাই তাঁহাকে ধরিতে, ছুইতে, বুঝিতে পারা যায়। অতএব সেই কারণটার সত্তা আছে ; উহা অসৎ, অভাবাত্মক হইতে পারে না। কেননা, আমরা এই জগতে দেখিতে পাই যে, "যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, জন্মগ্রহণ করে, তাহার অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম এই আকাশাদির কারণ ; সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব নাই, ইহা হইতে পারে না। অসৎ হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, ইহা আমরা জগতে দেখিতে পাইনা।"

"যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তৎ অস্তীতি দৃষ্টং লোকে। আকাশাদি কারণত্বাৎ ব্রহ্মণঃ, ন নাস্তি ব্রহ্ম।" (তৈঃ ভাঃ, ২-৬-১) এবং "ন চ অসতো জাতং কিঞ্চিৎ গৃহ্যতে লোকে কার্য্যম্।"

(২) কার্য্যের উৎপত্তি দ্বারা যেমন উহার কারণের সত্তা বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ কার্য্যের বিনাশের দ্বারাও কারণের সত্তা বুঝা যায়। কার্য্য বা বিকার গুলিকে নষ্ট করিতে করিতে সর্ব্বশেষে আমরা কারণের সত্তায় গিয়াই উপস্থিত হই। সেই সত্তার আর বিনাশ সম্ভব হয় না। কেন না, কার্য্যের সেই সত্তাকে ও যদি লোপ কর, তাহা হইলে উহা যে একটা কোন বস্তু ছিল, তাহা বুঝা যাইবে না। সুতরাং বস্তুর সত্তার বিনাশ অসম্ভব।—

"সর্ব্ববিশেষরহিতোপি জগতো মূলমস্ত্যেব, কার্য্যপ্রবিলাপনস্য অস্তিত্বনিষ্ঠত্বাৎ।" (কঠঃ ভাঃ)।

আবার—"পরিশিষ্যমাণে কস্মিংশ্চিৎ ভাবে অকল্ল্যতে, শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ ....অন্যথা নিরাস্পদত্বাৎ নোপলভ্যতে" (বেঃ ভাঃ, ৩-২-২৫)।

মনে করা যাউক্, বর্ণ, গন্ধ, আকার, পত্র, নাম, রূপ—এই সকল বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম লইয়া একটী ফুল আমার সম্মুখে। আমি একটীর পর একটী করিয়া এই বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম গুলিকে সরাইয়া লইতে লাগিলাম। যখন সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মগুলি চলিয়া গেল, তখন কি অবশিষ্ট রহিল ? সর্ব্বপ্রকার-বিশেষ-রহিত একটা সত্তামাত্র রহিল। এই নির্বিশেষ সত্তাই বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মগুলিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখন এই সত্তাটাই রহিল। ইহাকেও যদি সরাইয়া লও, তাহা হইলে এখানে কি ছিল, তাহারও উপলব্ধি হইবে না। অতএব

সেই সত্তার বিনাশ সম্ভব নহে। এইরূপ, যখন প্রলয়ে বিশেষ বিশেষ নাম-রূপ-গুণ-ধর্ম্মাদির বিলয় হইয়া একটা নির্ব্বিশেষ অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই পুনরায় জগৎ উৎপন্ন হয়। উহাকেই জগতের মূল বলা হয়। সে মূল বিনষ্ট হয় না।

(৩) অসৎ বা অভাবকে কার্য্যের কারণ বলা কখনই সম্ভব হয় না। শঙ্কর বলেন—

"নির্ব্বিশেষস্যতু অভাবস্য কারণত্বাভ্যুপগমে, শশবিষাণাদিভ্যোপি অঙ্কুরাদয়ো জায়েরন্"। বেঃ ভাঃ ২-২-২৬)।

শশ-বিষাণ, আকাশ-কুসুম প্রভৃতি কল্পনা মাত্র; ইহারা কোন বস্তু নহে; ইহাদের অন্তরালে কোন স্বরূপ বা স্বভাব নাই। ইহারা কেবল শব্দদ্বারা পরিচিত, কোন বস্তু নহে। ইহারা নির্বিশেষ হইয়াও, স্বরূপ-রহিত। একান্ত অসৎ, অলীক। আমরা পূর্ব্বে যে 'সামান্যের' বা কারণবস্তুর কথা বলিয়াছি, উহাও নির্বিশেষ; কিন্তু উহা স্বরূপরহিত নহে। এইজন্য উহা অসৎ নহে, উহা সৎ; উহার স্বভাব বা স্বরূপ আছে। সেই স্বরূপ হইতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শশ-বিষাণাদির কোন স্বরূপ নাই; উহারা একান্ত অসৎ। কাজেই উহারা কোই কার্য্য জন্মাইতে পারে না। শঙ্কর আরো বলিয়াছেন যে, শশবিষাণাদির ন্যায় অসৎ বা অভাব ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, কেন না উহাদের ত কোন বিশেষ স্বরূপ নাই। তবেই যদি উহাদের ন্যায় অসৎকেই কারণ বলা যায়, তাহা হইলে সকল বস্তু হইতেই ত সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে। তবে কেন আমরা দেখি যে, বীজ হইতেই অঙ্কুর জন্মে, মৃত্তিকা হইতে অঙ্কুর হয় না; মৃত্তিকা হইতে ঘটই জন্মে, অঙ্কুর জন্মে না? তবেই নির্ব্বিশেষ অভাব বা অসৎকে কারণ বলা যায় না। নির্ব্বিশেষ ভাবাত্মক বস্তুকেই কারণবস্তু বলা যায়।

"অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎপত্তেঃ, সর্ব্বস্য সর্ব্বত্র অসত্ত্বে, কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধি উৎপদ্যতে, ন মৃত্তিকায়াঃ"? (বেঃ ভাঃ, ২-১-১৮)।

এই প্রকার যুক্তি দ্বারা ভাষ্যকার নির্ব্বিশেষ কারণ-দ্রব্যের স্বরূপ বা স্বভাবের সত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেই স্বরূপটী যে ভাবাত্মক (positive), উহা যে অসৎ (nothing) নহে, তাহা ও বলিয়া দিয়াছেন।

"পদার্থানং......স্বেন স্বেন রূপেণ... ভাবাত্মনৈব উপলভ্যমানত্বাৎ।" পদার্থমাত্রেই নিজের নিজের স্বরূপ আছে আছে এবং উহা অসৎ নহে, উহা ভাবাত্মক (positive); সুতরাং বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উহারা কারণ।

ভাষ্যকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, কারণ দ্রব্যের এই স্বরূপটী যত

প্রকার অবস্থান্তর গ্রহণ করুক, যে কোন কার্য্যাকার ধারণ করুক ঐ নির্ব্বিশেষ স্বরূপটী এই সকল অবস্থান্তরের মধ্যে নিজকে হারাইয়া ফেলে না; উহার স্বরূপটীর কোন পরিবর্ত্তন হয় না; উহা আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়াই কার্য্যাকার ধারণ করে।

"কার্য্যরূপে উদ্রিক্ত হইয়া উঠিলেও, করণটী উহার নিজের যে পূর্ণ স্বরূপ তাহাকে ত্যাগ করে না।" (বৃঃ ভাঃ)[১]

"উপাধিযোগে * বিশিষ্টরূপ ধারণ করিলেও, কারণের যেটী নির্ব্বিশেষ স্বরূপ তাহার কোন হানি হয় না।"[২]

"একটা বিশেষ আকার ধারণ করিল বলিয়াই যে বস্তুটী অন্য একটা কিছু হইয়া উঠে, তাহা নহে।"[৩]

"উপাধিযোগ হইল বলিয়াই যে একটা বস্তু অপর একটা বস্তু হইয়া উঠিল, তাহা নহে।"[৪]

"ভিন্ন ভিন্ন উপাধির মধ্যে ব্রহ্মবস্তু অভিন্ন থাকিয়া যান।"[৫]

এতক্ষণ আমরা কারণ দ্রব্য সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মতের আলোচনা করিয়া আসিলাম। এখন 'কার্য্য' বা নাম-রূপাদি বিকার সম্বন্ধে ভাষ্যকার কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যাহাকে আমরা 'কার্য্য' বলি, তাহা 'কারণেরই' একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র। তাহা হইলেই, যখন যখন নাম-রূপাদি কার্য্য বা বিকার দেখা দেয়, তখন উহা আপন কারণকে পরিত্যাগ করিয়া দেখা দেয় না; উহার অন্তরালে কারণ দ্রব্যটী উপস্থিত থাকে। এ বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"যস্য চ যস্মাদাত্মলাভঃ, স তেন অপ্রবিভক্তো দৃষ্টঃ।"

"ন হি মৃদমনাশ্রিত্য ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্থিতির্বা সম্ভবতি।"

অর্থাৎ, যাহা হইতে কোন একটা বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুটা তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া—স্বতন্ত্র হইয়া- থাকিতে পারে না। মৃত্তিকার আশ্রয় ব্যতীত, মৃত্তিকাকে ছাড়িয়া, ঘটাদির উৎপত্তি বা স্থিতি অসম্ভব।

(১) যদ্যপি কার্য্যাত্মনা উদ্রিচ্যতে, তথাপি যৎপূর্ণস্বরূপং তৎ জহাতি। (বৃঃ ভাঃ)।

* কারণের যখন কোন বিকার উপস্থিত হয়, সেই বিকার গুলিই কারণের 'উপাধি'।

(২) উপাধিযোগাৎ সবিশেষ ইব প্রতিভাসন্তে, তথাপি আত্মনঃ নির্ব্বিশেষতাং ন জহাতি।

(৩) ন হি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি. স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।

(৪) উপাধিবশাৎ অন্যাদৃশস্য বস্তুনঃ ন অন্যাদৃশঃ স্বভাবঃ সম্ভবতি।

(৫) প্রত্যুপাধিভেদমভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রম্।

"যখন নাম-রূপের অভিব্যক্তি হয়, তখন উহারা কোন অবস্থাতেই আত্মস্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে দেশ-কালে বিভক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হয় না।"

"চৈতন্য হইতে ব্যতিরিক্ত হইয়া, স্বতন্ত্র হইয়া, খণ্ড খণ্ড কোন বস্তুই উৎপন্ন হয় না, স্থিতি লাভ করে না, বা বিলীন হইয়া যায় না।"

"ভূত, ভবৎ, বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই কোন বস্তু, আত্মা হইতে প্রবিভক্ত হইয়া থাকে না।"

এই প্রকারে ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন যে, কার্য্যমাত্রই উহার কারণ দ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকে না। কারণ হইতে স্বতন্ত্র হইতে গেলেই কার্য্যগুলি অলীক, মিথ্যা হইয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্য এইরূপেই নাম-রূপকে মিথ্যা, অসত্য শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া যদি কার্য্যগুলিকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেই উহারা মিথ্যা হইল, অসৎ হইল। কার্য্যের মূলে, উহার কারণের সত্তা থাকা আবশ্যক। কারণ-সত্তাকে ভুলিয়া, আমরা যদি কেবল কার্য্যগুলিকেই স্বতন্ত্র, স্বতঃ-সিদ্ধ বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি, ইহাকেই বেদান্তে মিথ্যা-দৃষ্টি বলে। আমরা জগতের নাম-রূপাদি বস্তুগুলিকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লই; উহারা যে ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই রূপান্তর, আকার বিশেষ,—সে কথা আমাদের আর মনে আইসে না।

"সতোঽন্যত্বে অনৃতত্বং, সদাত্মনা তু সত্যত্বং সর্ব্ববিকারাণাম্।" অর্থাৎ, কারণের সত্তা হইতে ভিন্ন করিয়া লইলে, সকল বিকারই মিথ্যা হইয়া পড়ে; কিন্তু কারণ সত্তার সহিত বিকার গুলিকে গ্রহণ করিতে পারিলে, উহারা মিথ্যা হয় না, তখন সবই সত্য হইয়া পড়ে।

"ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন বস্তুই আমরা দেখিতে পাই, উহারা যদি আত্মা হইতে, কারণ-সত্তা হইতে, বিচ্ছিন্ন হয়, বিনির্ম্মুক্ত হয়, তাহা হইলেই উহারা অলীক, মিথ্যা হইল।"—

"অণু মহদ্বা যদস্তি কিঞ্চিৎ, তদাত্মনা বিনির্ম্মুক্ত'মসৎ' সম্পদ্যতে।" ভাষ্যকার আরো বলিতেছেন—

"সমস্ত কার্য্যই কারণদ্বারা অন্বিত হইয়া থাকে। কারণান্বয়রহিত হইলেই উহারা সক্তু-মুষ্টির ন্যায়—চূর্ণ 'ছাতুর' মত—বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে, উহাদিগকে ধরিয়া রাখিবার কেহ থাকিবে না"

"কারণান্বয়হীনং কার্য্যং অবিভ্রস্যমাণম্ স্থাতুং ন উৎসহতে,…… …সক্তু মুষ্টিবৎ ব্যশীর্য্যেত।"

এই জন্যই শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "নিঃস্বরূপ কোন বস্তুই ব্যবহারে আসিতে পারে না" ("ন হি নিরাত্মকং কিঞ্চিৎ ব্যবহারায় অব-কল্পতে")।

কারণ-স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে কার্য্যগুলি কি প্রকার অলীক, অসৎ, মিথ্যা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাষ্যকার—শশ-বিষাণ, বন্ধ্যা-পুত্র, আকাশ-কুসুম—প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আকাশ-কুসুম প্রভৃতিকে 'বস্তু' বলা যায় না। আকাশ-কুসুম, বন্ধ্যা-পুত্র এপ্রকার কোন বস্তু পৃথিবীতে নাই। কেবল কতকগুলি শব্দপ্রয়োগ করিয়া ইহাদের পরিচয় দেওয়া হয়। পতঞ্জলি তাঁহাব যোগসূত্রে এই প্রকার কতকগুলিকে কল্পনার খেলা বলিয়াছেন। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন হি বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি।" —শুধু বিকারকে 'বস্তু' বলা যায় না। ঘট মৃত্তিকার বিকার। সুতরাং ঘটকে বস্তু বলাটা ভুল; ঘটের কারণ মৃত্তিকাই প্রকৃত বস্তু। এই প্রকারে আকাশ-কুসুমাদিও বস্তু নহে। উৎপত্তির পূর্ব্বে উহারা কোন কারণ দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই। "অসতঃ শশ-বিষাণাদেঃ সমুৎপত্ত্য-দর্শনাৎ" (মাঃ ভাঃ)। উৎপত্তির পর স্থিতিকালেও উহারা কোন কারণ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে না; ধ্বংসের পরও উহারা কোন কারণ সত্তায় বিলীন হইয়া যায় না—"নহি বন্ধ্যা-পুত্রো রাজা ভবতি (স্থিতি-কালে), ভবিষ্যতি বা (ধ্বংসের পর)।" কারণ-সত্তার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহাদিগকে 'বস্তু' বলা যায় না।

আমরা এই উপলক্ষে পাঠক-পাঠিকাকে একটা বিশেষ কথা বলিতে চাহিতেছি। শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত 'পরিণাম-বাদ' বা scientific causality গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে তিনি 'বিবর্ত্তবাদ' গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরিণামবাদে কতকগুলি কার্য্যের মধ্যেই কার্য্য-কারণ-ভাব কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। মৃচ্চূর্ণ হইতে মৃৎ-পিণ্ড, মৃৎ-পিণ্ড হইতে কপালদ্বয়, কপালদ্বয় হইতে ঘট নির্ম্মিত হইল। এস্থলে চূর্ণ, পিণ্ড, কপাল ও ঘট—সবগুলিই কার্য্য বা বিকার। কিন্তু তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী বিকারকে পরবর্ত্তী বিকারের 'কারণ' বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোনটাই প্রকৃত কারণ নহে; সব গুলিই কার্য্য। যেটী প্রকৃত কারণ, সেটি হইতেছে মৃত্তিকার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। এই স্বরূপটীই চূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘট পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য বা বিকারগুলির মধ্যে অনুগত হইয়া রহিয়াছে। এই স্বরূপটী আপন সত্তাকে না হারাইয়াই প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সেই স্বরূপটীই প্রকৃত কারণ। পরিণামবাদে কিন্তু সে স্বরূপের কোন কথা নাই। মৃচ্চূর্ণকেই মৃৎ-পিণ্ডের কারণ বলা হয়; আবার মৃৎ-পিণ্ডকে কপালদ্বয়ের কারণ ধরা হয়; আবার কপালকে ঘটের কারণ বলা হয়। এস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণটী একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়া পরবর্ত্তী অবস্থাকে গ্রহণ করে। শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন যে —

"আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকে পরবর্ত্তী অবস্থার কারণ বলি না। একটা বিকারকে অপর বিকারের কারণ বলি না। যেটী প্রকৃত কারণ, সেটী নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। উহা আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়া, প্রত্যেক বিকারের বা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া অনুগত রহিয়াছে।" তাঁহার নিজের উক্তি এই—

"নাসাবুপমৃদ্যমানা পূর্ব্বাবস্থা উত্তরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যুপগম্যতে। অনুপমৃদ্যমানানামেব স্থিরস্বভাবানাং অনুযায়িনাং বীজাদ্যবয়বানামঙ্কুরাদিকারণভাবাভ্যুপগমাৎ।" (বেঃ ভাঃ, ২-২-২৬)।

আমরা পরমকারণ ব্রহ্মবস্তুকে ভুলিয়া, নাম-রূপাদি বিকারগুলির মধ্যেই একটাকে আর একটার কারণ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। শঙ্কর এই পরিণামবাদকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিবর্ত্তবাদকে গ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে যেটী অনুগত থাকে, উহার ধ্বংস নাই। ঐটীই নির্ব্বিশেষ কারণদ্রব্য। অবস্থান্তরের মধ্যে উহা নিজকে হারায় না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাষ্যকার, রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত, মরু-মরীচিকা—প্রভৃতির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে যখন একগাছা রজ্জু সর্পাকার ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে প্রতীয়মান হইল, তখনও উহার অন্তরালে রজ্জু আপন স্বরূপে ঠিকই থাকে। আবার যখন সর্পাকার চলিয়া যায়, তখনও সেই রজ্জু ঠিকই রহিয়া যায়। এই রজ্জু-সর্প প্রভৃতি বস্তুকে পূর্ব্বোক্ত আকাশ-কুসুমাদির ন্যায়, অসৎ, অলীক, মিথ্যা, অবস্তু বলা যায় না। কেন না, ইহারা আকাশ-কুসুমাদির মত নিঃস্বরূপ নহে। সর্প-বিভ্রম উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, সর্পাকার প্রতীতি জন্মিবার পূর্ব্বে, উহা রজ্জু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।—"সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ জন্ম যুজ্যতে।" (মুঃ কাঃ, ৩-২৭)। আবার সর্পাকার প্রতীতি উৎপন্ন হইবার পর, উহার স্থিতি কালেও উহা রজ্জুর আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে; রজ্জুই উহার স্বরূপ বা আস্পদ। "নহি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োপি 'নিরাস্পদাঃ' ভবন্তি।" আবার সর্পবিভ্রম নিবৃত্ত হইয়া গেলে, উহা রজ্জুর মধ্যে লীন হইয়া যায় এবং রজ্জুমাত্রই অবশিষ্ট থাকে।—"সর্পবিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি'।" (মাঃ, ২-১৮)। অতএব রজ্জু-সর্পাদি কখনই নিঃস্বরূপ, অবস্ত্বাস্পদ্ হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদিগকে শশ-বিষাণ, আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় অলীক, অসৎ, অবস্তু বলা যায় না।

আমরা এ বিষয়ে আর এক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমার বাল্য, যৌবন, জরা—এই ত্রিবিধ অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। এই অবস্থাগুলি পরস্পর ভিন্ন, একটার পর অপরটা আইসে। যখন একটা আইসে, তখন পূর্ব্বাবস্থাটা থাকে না। কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে

আমার 'আমিত্ব' স্থির রহিয়া যায়। যে আমি বাল্যাবস্থা অনুভব করিয়াছি, সেই আমিই যৌবনাবস্থায় ছিলাম, আবার সেই আমিই আজ বৃদ্ধাবস্থা অনুভব করিতেছি। একটীর পর একটী করিয়া অবস্থাগুলি আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমিত্ব সকল অবস্থার মধ্যেই ঠিক্ আছে। আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা সম্বন্ধেও একথা খাটে। শঙ্কর তাঁহার অনন্যসাধারণ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি,
ব্যাবৃত্তাস্বনুবৃত্তমানমহমিত্যন্তঃস্ফুরন্তং সদা।"

রজ্জু-সর্পাদি দৃষ্টান্তের বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল নাম-রূপাদি বিকারগুলির মধ্যে এক নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্ম চৈতন্য অনুগত, অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনিই এই সকল নাম-রূপাদির মূল, তিনিই ইহাদের আশ্রয়। তিনিই অন্তর্যামিরূপে ইহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহারা তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এক মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিয়ত ধাবিত হইতেছে।